চতুষ্পাঠী

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীহীরালাল চক্রবর্তী
এবং
শ্রীজাহ্নবীজীবন চক্রবর্তী
পিতা ও পিতৃপ্রতিম
গুরুজনকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরোজিনী নাইডু কলেজের সংস্কৃতের
অধ্যাপিকা ডা. অলোকা চক্রবর্তী
আমাকে কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রহ্মচারী
দণ্ডধারী
দণ্ড দিয়ে
কুত্তা মারি।

বাবলুদাই প্রথমে বলেছিল। তারপর বিজু, শিখা, অন্যান্য কাচ্চাবাচ্চাগুলি, এমন কি অসীমও। বিপ্লবের দিদি স্বপ্নাও মজা পেয়ে হাততালি দিল।

বিপ্লবের গেরুয়া বসন, মাথা ন্যাড়া, ন্যাড়া মাথা ঘোমটায় ঢাকা। ঘোমটাকে ভাল কথায় অবগুণ্ঠন বলে। আছে না...প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর—দিক দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা...। ভেরি ইমপরটেন্ট। বিপ্লবের এখন অব্রাহ্মণের মুখদর্শন নিষেধ। তাই এই অবগুণ্ঠন।

বিপ্লবের পৈতে হল আজ। আচার্য ছিলেন তার দাদু শ্রীঅনঙ্গমোহন ভট্টাচার্য কাব্যব্যাকরণতীর্থ। তিনি উপবীত প্রদান করলেন। আর পুরোহিত হলেন—শ্রীকামাখ্যাচরণ চক্রবর্তী। এইমাত্র অনঙ্গমোহন 'প্রজাপতি ঋষি পঙক্তিশ্ছন্দো দণ্ডাগ্নি দেবতে উপনয়নে মানবক দণ্ডার্পণে বিনিয়োগ' এই বাক্য বলে বিপ্লবের হাতে একটা বেলকাঠের লাঠি তুলে দিলেন। কামাখ্যাচরণ বললেন এই হইল তোমার ভিক্ষাদণ্ড।

কুত্তা করে ঘেউ ঘেউ
ব্রহ্মচারী ছুঁস না কেউ।

এই, ...এই ছ্যামড়াগুলাইন, কুম্মাণ্ড সকল,—এইখানে চিক্কোইর চ্যাঁচামিচি কইরো না। এই ঘরে ক্যান?—এইটা ব্রহ্মচারীর ঘর। যাও—ভাগো—। ওরা চলে গেল। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বিপ্লব একবার ওদের দেখল। শিখাকে দেখল। শিখার মাথায় প্রজাপতি ক্লিপ, ফ্রকটায় ঝিকিমিকি। ডেক্রনের কাপড়। কি পাতলা। টেরিলিনও পাতলা। মেজমামা কখন আসবে? মেজমামা টেরিলিনের পিস দেবে বলেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝলা, তুমি এখন ভিক্ষাব্রতী হইলা। ভিক্ষালব্ধ সবকিছু তোমার আচার্যকে প্রদান করবা। কামাখ্যাচরণ বললেন, নাও, এইবার ভিক্ষা। পুরুষের নিকট ভিক্ষা গ্রহণকালে কইবা, ওঁ ভবন ভিক্ষাং দেহি আর স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা গ্রহণকালে কইবা, ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি। অনঙ্গমোহন বিপ্লবের কানে কানে ফিসফিস করে বলে দিলেন—ভবৎ শব্দ পুংলিঙ্গের এক বচনে ভবান, সম্বোধনে ভবন...।

কামাখ্যাচরণ বললেন, প্রথমে মাতৃভিক্ষা। মায়ের কাছে ভিক্ষা চাও। মায়ের হাতের ভিক্ষা নিয়া ব্রহ্মচারী গুরুকুলে যাইত। এই ছিল প্রথা।

অনঙ্গমোহন 'বৌমা' বলে হাঁক দিলেন। অঞ্জলির কাপড়ে হলুদের দাগ। ব্যস্ত হয়ে এল।—ডাকছেন বাবা?

সত্য ভিক্ষা দিয়ে যাও বৌমা।

ও। হয়ে গেছে? অঞ্জলি উচ্ছল হয়। ছুটে যায়।

একটা ছোট্ট বাক্স নিয়ে আসে। একটা আংটি বার করে অঞ্জলি।

দেখি বিলু, তোর আঙুলটা দে তো—

ভবতি ভিক্ষাং দেহি।

অঞ্জলি বিলুর আঙুলে পরিয়ে দিল একটা আংটি।

খোদাই করে লেখা—বিপ্লব।

কামাখ্যা পুরোহিত বললেন, ভিক্ষা গ্রহণপূর্বক বল, ওঁ স্বস্তি।

বিলু বলে, ওঁ স্বস্তি মা...

অঞ্জলি তখন হুট করে কেঁদে ফেলে। আঁচল চাপা দেয় মুখে, ঘর থেকে বার হয়ে যায়। বিলু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। কামাখ্যা পুরোহিতও আশ্চর্য হয়ে কিছুক্ষণ স্থির। তারপর বলেন, এবার অন্যদের কাছে ভিক্ষা চাও।

অনঙ্গমোহন তখন, তাঁর বান্ধব তারানাথ স্মৃতিতীর্থকে আহ্বান করেন। 'আস, তারানাথ, অধিক দিন আর এইসব বজায় থাকব না।' অঞ্জলি তখনই ছুটে আসে।

না, আগে ওর বাবার কাছে যাবে।

কামাখ্যাচরণ বলেন—ওর বাবা? বাবার কাছে যাবে। কী কথা কও বৌমা?

—ওর বাবার আশীর্বাদ নেবে সবার আগে।

—মন্ত্রবাক্যে আশীর্বাদের কথা তো নাই, ভিক্ষা, ভিক্ষার কথা আছে মা, কামাখ্যাচরণ বলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঞ্জলি বিলুর হাত ধরে। দেওয়ালের কাছটাতে নিয়ে যায়। ওখানে ওর বাবার ছবি। অল্প অল্প দাড়ি, রোগা রোগা কিন্তু চোখটা কী রকম ভাসা ভাসা। ওর সত্যিকারের বাবাকে এরকম কক্ষনো দেখেনি বিলু, এরকম ভাসা ভাসা চোখ কখনো দেখেনি, এরকম স্মিত হাসিও কখনো দেখেনি।

এ ছবি বিয়ের আগের ছবি, চাকরির দরখাস্ত করার সময়ে তুলেছিল বাবা। বাবার কোনো ছবি পাওয়া যাচ্ছিল না তখন। একটা খাম থেকে যে ছবিটা বার করেছিল মা, তাতে বাবা চেয়ারে বসে, কোঁচাটা লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে, একপাশে একটা গোলমত টেবিল, টেবিলে ফুলদানি। অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে মা, জামার হাতা ঘটির মতো ফুলে আছে কনুই-এর ওপরে। মায়ের মাথায় কিছুটা ঘোমটা। ঘোমটাকে ভাল কথায় অবগুণ্ঠন বলে। মায়ের মুখে কিছুটা হাসি। মায়ের শাড়ির আঁচলে বুটি বুটি, সেই আঁচল কিছুটা এলানো। তার মায়ের কপালে সিঁদুরটিপ। মায়ের একটা হাত হাতলের ওপর বাবার হাত কিছুটা ছুঁয়েছে। বাবার হাত চেয়ারের হাতলে বিছিয়ে রয়েছে। বাবার হাতের আঙুলে আংটি। ঐ জোড়া ছবি থেকে বাবাকে আলাদা করা যায় না। তাছাড়া লুটোনো আঁচলের ঐ ছবি কি শ্রাদ্ধবাসরে মানায়? শেষকালে অনেক খুঁজে খুঁজে একটা হলুদখামের ভেতরে একটা ক্ষয়া ছবি পেয়েছিল মা। ঐ ছবিটাই বড় করে বাঁধিয়ে এনেছিল বিপ্লব শ্রাদ্ধের আগে আগে।

দেয়ালে বাবার ছবি। মরে যাওয়া বাবা। বাবার চোখটা কী রকম ভাসা ভাসা। মুখে অল্প অল্প দাড়ি। তলায় লেখা স্টুডিও শতদল। বিপ্লব হাতজোড় করে। ভবন ভিক্ষাং দেহি এই মন্ত্রবাক্য এখানে চলবে না। মরে যাওয়া বাবা কী ভিক্ষা দেবে?

আশীর্বাদ ভিক্ষা চাও বিলু, বাবার কাছে আশীর্বাদ চাও। অঞ্জলি বিপ্লবের মাথায় হাত রাখে। সদ্য মুণ্ডন করা মাথাটা কী রকম শিরশির করে ওঠে।

আজ কী আশীর্বাদ চাইবে বিলু। পরীক্ষার আগে বাবার ছবিকে নমস্কার করার সময় বিলু মনে মনে বলে বাবা, যেন ভাল নম্বর পাই। অসীম যেন আমাকে বিট্ দিতে না পারে। পাঁচ দুই হাইটের নক-আউট ফুটবলের ফাইনালের দিন বাবার ছবিকে নমস্কার করে বলেছে, বাবা, দেখো যেন গোল বাঁচাতে পারি, কেউ যেন না বলতে পারে গোলকিপারের দোষে নেতাজি সঙ্ঘ হেরে গেল। আজ, এখন কী আশীর্বাদ চাইবে বিলু? বিলু কি বলবে আমার পৈতে হয়েছে, এখন এক বছর ডিম খেতে দেবে না। পেঁয়াজ খেতে দেবে না, আশীর্বাদ কর বাবা, আমার যেন লোভ না হয়, নাকি বলবে সন্ধে-আহ্নিকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্ত্রগুলো বড় কঠিন বাবা, আশীর্বাদ কর যেন মনে রাখতে পারি।

তারানাথ স্মৃতিতীর্থ তখন বললেন, ব্রহ্মচারী, মনে মনে বল হে পরলোকগত পিতঃ আশীর্বাদ কর যেন ঈশ্বরের চরণে মতি রাইখ্যা সদা সদবিপ্র থাকতে নি পারি।

বিলু ওসব কিছুই বলে না।

সদবিপ্র থাকার মহা ঝামেলা। ওর মাকে তো দেখছে, দাদুকে সদবিপ্র রাখতে গিয়ে কত ঝামেলা।

কও, হে পিতঃ, আজ আমি দ্বিজ হইলাম, তুমি তো দেখলা না, যেন স্বধর্মে আসীন থাকি। আজ আমি দ্বিজ হলাম দ্বিজ। পরীক্ষায় এসেছিল—ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ। দ্বিজ। দুইবার জন্মে যে। বহুব্রীহি, বহুব্রীহি।

ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী, কও আশীর্বাদ কর পিতা, এই উপনয়নের মর্যাদা যেন রাখতে পারি। পিতাই পরম গুরু। পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।

তারানাথ স্মৃতিতীর্থ এই কথা বলতেই জোরে জোরে মাথা নাড়লেন বোবাঠাকুর। মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বের হতে থাকে। বোবাঠাকুরের কি একটা নাম আছে। হরিদাস সম্ভবত। ইনি বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর টিকির কারণে। টিকিকে ভাল কথায় বলে শিখা। নোয়াখালীর দাঙ্গায় ওঁর শিখাটি কাটা গিয়েছিল। বোবাঠাকুর ঐ কর্তিত শিখাটি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন একটা কৌটোর মধ্যে। পরে গান্ধীজি নোয়াখালী সফরে এলে অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ এই শিখাগ্রভাগটি দেখিয়েছিলেন। তখনও তাতে গ্রন্থি এবং শুষ্ক ফুল ছিল। ওটার ছবি উঠেছিল হিতবাদী পত্রিকায়। বোবাঠাকুর আর্থিক অনুদান পেয়েছিলেন। পরে হরিপদ ভারতী তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর ঐ কৌটো নিয়ে হরেন মুখার্জির সঙ্গেও দেখা করেছিলেন বোবাঠাকুর। স্কুলের পণ্ডিতের চাকরি পেতে পারতেন যদি উনি বোবা না হতেন। অনঙ্গমোহনের শ্যালক হন বোবাঠাকুর। অনঙ্গমোহন বয়স্যসুলভ পরিহাসে বলেছিলেন—তোমার শিখাটা না নিয়া যদি আমারটা নিত, তবে স্কুলের চাকরি আমারই হইত। ইশ্‌রে, এখন স্কুলের পণ্ডিতেও দেড়শো টাকা পায়।

বোবাঠাকুর তখন মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করেছিলেন। তাঁর গালের কষ বেয়ে লালা গড়াচ্ছিল।

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম—বিলু হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে। বাবা, বাবা গো—ক্ষমা করে দিও গো বাবা...।

 www.amarboi.com ~

বিলু মাঝে মাঝেই ভাবত, এখনও ভাবে, এইমাত্র যেমন ভাবল ওর বাবার মৃত্যুর জন্য ও নিজেই দায়ী। বাবাকে খাইয়েছে ও বিষ সন্দেশ।

যে বাড়িতে বিলুরা থাকে, সেই বাড়িটা অন্তত দেড়শো বছরের পুরনো। খোপে খোপে গোলা পায়রারা থাকে, গলা ফুলিয়ে বকম বকম করে। রাস্তা থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। আঠাশটা সিঁড়ি। প্রথম দশটা সিঁড়ির পর একটা বাঁক, তারপর সিঁড়ি, আবার দশটা। সিঁড়ির বাঁকগুলোতে সিঁড়িটা কিছুটা চওড়া হয়, ওখানে কয়লার ড্রাম রাখা নিয়ে শিখার মায়ের সঙ্গে বিলুর মায়ের কী ঝগড়া। বেশ করেছি রাখব। আমরা বিনা ভাড়ায় থাকি নাকি, আমরা সবাই ভাড়া দি। জানা আছে জানা আছে তিন মাসের ভাড়া কার বাকি...এই রকম কথাবার্তা হয় ঝগড়া হলে। এখন সিঁড়ির দুটো বাঁকে দুটো কয়লার ড্রাম। বিলুদের আর শিখাদের। শিখাদের সঙ্গে কথা বন্ধ ছিল অনেকদিন। শিখার বাবা গান জানেন। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতে পারেন। শাড়ি পরা মেয়েরা এসে গান শিখে যায়। ওরা খবর কাগজ রাখে। যখন ঝগড়া ছিল না তখন বিলু ওদের ঘরে গিয়ে মাঝে মাঝে খবর কাগজ পড়ে আসত: নেহরুর পর কে? পাকিস্তান হইতে পুনরায় উদ্বাস্তু আগমন। নেতাজি জীবিত আছেন। ফুল আপনার ভাগ্য বলিয়া দিবে। শিখার বাবা খুব নেতাজি ভক্ত ছিলেন। বলতেন শৌলমারীর সাধুই নেতাজি। নেতাজি যখন আত্মপ্রকাশ করবেন তখন জওহরলাল গদি ছেড়ে পালাবে। শিখার বাবা নেতাজির জন্মদিনে বারান্দায় নেতাজির ছবি একটা চেয়ারে বসিয়ে মালা দিতেন, ধূপ জ্বালাতেন আর বেলা বারোটা নাগাদ শাঁখ বাজাতেন। গাঁদা ফুলের ঝিরিঝিরি পাপড়ি দিয়ে লিখতেন জয়তু নেতাজি। তেইশে জানুয়ারির দুপুরে শাঁখ বাজানো হলে শিখার বাবা ছাত্রীদের নিয়ে গাইতেন—কতকাল আর কতকাল বল মা...ভারতের বীর ছেলে/নেতাজীকে বিদায় দিলে/মা গো বল কবে শীতল হবে...। মরুতীর্থ হিংলাজের 'পথের ক্লান্তি ভুলে' গানটির সুরে গাইতেন শিখার বাবা। শিখা আর বিজুও গাইত। ঐ গানটারই এক জায়গায় ছিল—চীনের এই আক্রমণে/দেশমাতার ব্যথা মনে/তুমি এসে ভারতের কালিমা ঘুচাও।

শিখার বাবা খুব সুখী লোক ছিলেন। অফিসে যাবার সময় শিখার মা দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে একটা পান গুঁজে দিতেন হাতে। তখন শিখার বাবা পানটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে দেবার আগে এমন করে হাসতেন যেন টাইম কলে জল এল। একদিন সিঁড়ির বাঁকটায়, যেখানে কয়লার ড্রাম ঐখানে চুমু খেতে দেখেছিল বিলু, বিলুর হাতে তখন ঘুড়ি। মুখপোড়া ঘুড়ি। বিলু দ্রুত উঠে গিয়েছিল উপরে। শিখার মায়ের চাপা গলায় বিলু 'মুখপোড়া' কথাটা শুনেছিল। ওটা ঘুড়িকে বলেছিল না বিলুকেই, এখনো জানে না বিলু। একদিন মনে হচ্ছে, সেই অফিসে যাবার সময়, শিখার বাবা বলেছিল, 'যাই', শিখার মা বলল—যাই বলতে নেই, 'আসি'। শিখার বাবা তখন কি সুন্দর গেয়ে উঠল, সখী যাই যাই বলো না। বিলু তখন কলঘরে একা।

শিখারা খুব সুখী। ওদের বাবাও খুব সুখী। এখানে ওরা দুটো ঘর নিয়ে থাকে। ওখানে ওদের একটা দেশ আছে। দেশ থেকে পেয়ারা আসে, আমসত্ত্ব, জয়নগরের মোয়া। ছুটিতে ওরা দেশে যায়। জয়নগর মজিলপুর। বিলুদের কোনো দেশের বাড়ি নেই। বিলুর ঠাকুরদা দেশ ছেড়ে চলে এসেছিল। শিখাদের দেশ আছে। দেশের বাড়ি। শিখার বাবার গলায় গান ছিল। শিখার বাবা গান গাইত, শিখা বিজুরাও ওদের বাবার কাছে গান শিখত। 'ওরে আর দেরি নয় ধরগো তোরা', 'আগুনের পরশমণি', তারপর, 'এই মণিহার আমার নাহি সাজে'—এইসব। বিলুর দিদি স্বপ্নাও কয়েকটা গান শিখে নিয়েছিল। স্বপ্না যদি গাইত, শিখা বলত, লজ্জা করে না আমাদের গান গাইছিস...স্বপ্নাও ওর দাদুকে নালিশ করলে অনঙ্গমোহন বলতেন রবিবাবুর গান গাও ক্যান? ডি এল রায় গাইবা, হেমচন্দ্র-নবীন সেন গাইবা। আর বিলুর মা বলত—রবীন্দ্রনাথ কারোর বাপের নাকি? রবীন্দ্রনাথ সবার।

বিলুর বাবার এমন কোনো জুতো ছিল না, যা পরে হাঁটলে মসমস শব্দ হয়। শিখার বাবার ছিল পাম্পসু জুতো, মোকাসিন জুতো। বিলুর বাবার ছিল নিরীহ চটি।

একবার বিলুর বাবা একজোড়া চটি নিয়ে এসে বললেন দেখ, দেখ, কেমন অদ্ভুত এক চটি। সর্বদা কেমন গদির উপর দিয়া হাঁটতাছি। বিলু পরে নাম জেনেছিল হাওয়াই চটি। আর যে প্যাকেটে চটিটা এনেছিল বিলুর বাবা, সেই প্যাকেটটাও ছিল অদ্ভুত। পাতলা ফিনফিনে, কাগজও নয়, আবার কাপড়ও নয়। ভিতরে জিনিস রাখলে কি সুন্দর দেখা যায়, আবার জলও ঢোকে না। বিলু নিতে চেয়েছিল ওটা, ওর বাবা দেয়নি। ওর বাবা টিফিনের বাক্স ওটা দিয়ে মুড়ে নিয়ে যাবে।

বিলুর বাবা জগদীশ সকাল আটটার সময় বেরিয়ে যেত বাড়ি থেকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধ্যের সময় ফিরত। আবার বেরিয়ে রাত ন'টার আগে ফিরত না। এটা ছিল টিউশনি আর আগেরটা চাকরি। মাঝখানে এসে কিছু খেয়ে যেত বিলুর বাবা। চিঁড়ে খেত। চিঁড়ে ভেজা, চিনি বা আখের গুড় দিয়ে। দৈবাৎ নারকোল। অর্ধেক নারকোলের দাম চার আনা। চার আনায় দুটো বড় বড় সন্দেশ হয়। বিলুর বাবা কোনো রকমে চিঁড়ে-গুড় খেয়েই টিউশনিতে চলে যেত।

শিখার বাবা অফিস থেকে ফিরে সন্দেশ খেতেন দুটো। রুটি কিংবা পরোটা আলুভাজা। ফটিকের দোকান থেকে কাঁসার বাটি করে সাদা ফকফকে ডালডা ঘি কিনে নিত শিখা। আর বিরামের সন্দেশ। শিখাদের দেশ ছিল। দেশের জমির ধান ছিল। ঝুলবারান্দার দড়িতে ঝুলত শিখা আর বিজুর বাহারি জামা, জাহাজ ছাপ জামা, পাখি ছাপ জামা, ট্রিংকলের ডেক্রনের। বিলুর দিদি স্বপ্নার রঙ ওঠা জামার পাশে হিল হিল করত শিখার জামা—এবার পুজোয় আমায় একটা ভাল জামা দেবে তো, ট্রিংকলের জামা? স্বপ্না এরকম কথা বললে ওর বাবা স্বপ্নার মাথায় হাত দিয়ে বলত, হ্যাঁ দেবো দেবো। এই হ্যাঁ দেবো দেবো-র উচ্চারণ ভঙ্গি ও স্বরক্ষেপণের মধ্যে বিলু ওর বাবার অসহায় ভাবটা বুঝতে পারত। মিথ্যে বলার মধ্যে যে একটা অপরাধবোধ থাকে, সেটা বেশ স্পষ্ট ছিল। রেডিওর ব্যাপারেও এটা বুঝেছে বিলু।

শিখার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হলেও বৃহস্পতিবার নাগাদ আবার কথাবার্তা শুরু দিতে চেষ্টা করত বিলুর মা। কারণটা শুক্রবারের রেডিওর নাটক। সবার গলা চিনতে পারে বিলুর মা। প্রমোদ গাঙ্গুলি, প্রেমাংশু বসু, মঞ্জু দে, মেনকা দেবী, পাহাড়ী সান্যাল—সব্বাইয়ের। সমস্ত কাজপত্র গুছিয়ে রাত আটটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে শিখাদের ঘরে গুটি গুটি হাজির হয়ে যেত বিলুর মা। যদি সে রকম অবস্থা সৃষ্টি করতে অক্ষম হত বিলুর মা, বারান্দায় শিখাদের ঘরের পাশটাতে গিয়ে বসত। শিখার মা একদিন রেডিওর ভল্যুম কমিয়ে দিয়েছিল। সে দিন রাত্রে বিলুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বিলুর মা ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, বলছিল—পারবে না, পারবে না একটা রেডিও কিনে দিতে! শাড়ি নয়, গয়না নয়, একটা রেডিও। দীর্ঘশ্বাস সমেত হ্যাঁ, দেবো দেবো, শুনেছিল বিলু বাবার মুখে। খবর কাগজে পুজোর আগে আগে পৃষ্ঠাজুড়ে বাটার জুতোর ছবি বের হয় আর রেডিওর ছবি। ছবির পাশে দাম। টেলিরাড সোনেটা ২৭০ টাকা, মারফি প্রিমিয়াম ২৮০ টাকা। নেতাজি এলেই দেশের সব কিছু ভাল হয়ে যাবে। নেতাজি এলে রেডিওর দামও কমে যাবে? ইশ্।...যেন নেতাজি আসেন, তাড়াতাড়ি এসে যান। বিলু সিরিয়াসলি ভাবত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বিলুর। বিলুর মা বলছিল—দরকার নাই। ওগো দরকার নাই, রেডিওর দরকার নাই আমার। তুমি তোমার শরীলটা আগে দেখ। বিলু চোখ খুলে তাকিয়েছিল তখন। হলদেটে ম্যাদামারা একটা কম পাওয়ারের বাল্‌বের আলোয় দেখেছিল মায়ের আঁচল ঝুলে পড়েছে। একটা পাখা দিয়ে বাতাস করছে বাবার মাথায়। মেঝেতে পড়ে আছে বমি। বিলু হুড়মুড় করে উঠে পড়ে। বিলুর বাবা আবার উদ্গার তোলে। শব্দ করে বমি করে আবার। স্বপ্না তখনো ঘুমোচ্ছে। শুলেই ঘুম স্বপ্নার, কোনো হুঁশ নেই।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ে।

জগদীশ, ও জগদীশ। বমি করছিস? বমির শব্দ শুনি...অনঙ্গমোহন দরজায় টোকা দেন। বৌমা, ও বৌমা, দরজাটা খোলো।

অঞ্জলি বলে, ঢং। বুড়ার ঢং।

জগদীশ বলে, দরজাটা খুলে দাও।

বুড়া করবোটা কী?

খোলো বলতাছি। খুইল্যা দাও।

অঞ্জলি ঘোমটাটা লাগিয়ে নেয় এবং গজগজ করতে থাকে. সারাদিন কেবল গবৌ গাবৌ আর অং বং চং। পণ্ডিতি। এদিকে মানুষটা শ্যাষ হইয়া গেল। তার উপরে একটা আত্মীয় জুটাইছেন। খিল খুলতে গেলে যতটা জোরে শব্দ হওয়া উচিত, তার চেয়ে অনেক বেশি জোরে খিল খোলার শব্দ হল। অনঙ্গমোহন ঘরে ঢুকে ছড়ানো বমির দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর বলেন বায়ু। বায়ু চড়া। পিত্ত প্রবল।

হবে না? এতগুলোর ভাতের জোগাড় করতে হয় না?

অনঙ্গমোহন অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে থাকেন

জানেন, আরও একটা টিউশনি নিছে? আজ বাড়ি আসারও সময় হয় নাই. খালি প্যাটে গ্যাস হয় না?

বিকালে সামান্য কিছু হলেও আহার করা উচিত। এক মুষ্ঠি চিড়া দিয়া...

থাক। হইছে।

জগদীশ কটমট করে তার স্ত্রীর দিকে তাকায়। অঞ্জলি আরও বেশি উত্তেজিত হয় তখন। বলে এর মধ্যে আবার অসীমরে জুটাইছেন উনি। কাণ্ডজ্ঞানটা কী?

অনঙ্গমোহন বলেন, মুখরা হয়ো না বৌমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ বুইজ্যা তো এতদিন ছিলাম। আর তো পারা যায় না। দ্যাখেন না মানুষটার কী অবস্থা, চোখের পাতা কি খাইছেন?

অনঙ্গমোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফ্যালেন। বলেন ঝনঝনায়তে। বলেই চলে যান তাঁর বারান্দার মাদুরে। বিড়বিড় করে বলেন—শান্ত পাত্রী। পাত্রী খুবই শান্ত। এই নমুনা। ঝনঝনায়তে। 'ঝনঝনায়তে' কথাটা প্রায়ই বলেন অনঙ্গমোহন, এটা একটা তাঁর প্রিয় অলঙ্কার। এর মানেটা বিলু জানে। একটা সংস্কৃত শ্লোক আছে, যেটা বিলু জানে না, তার মানেটা হল—অতসী ফুল বড় চমৎকার, সোনার মতো রঙ। ভাবলাম এত সুন্দর ফুল যখন, না জানি কত ভাল ফল হবে। এই ভেবে গাছে জল ঢাললাম, যত্ন করলাম। তারপর যখন ফল হল, দেখি কেবলই ঝনঝন করে। আর কিছু নয়।

অনঙ্গমোহন বারান্দায় ঘুমোন। অনঙ্গমোহন আর অসীম। অসীম হল বোবাঠাকুরের ছেলে। অনঙ্গমোহনের শ্যালকপুত্র। অনঙ্গমোহনের টোলে অসীম পড়ে। অসীম বিলুর কাকা হয় সম্পর্কে, যদিও বয়সে বছর দুইয়ের মাত্র বড়।

হাতমুখ ধুয়ে জগদীশ শুয়ে পড়ে। দুটো বিছানা হয় ঘরে। একটা তক্তপোশের উপরে আর একটা তলায়। তক্তপোশে বিলু আর বাবা শোয়। মেঝেতে, স্বপ্না আর অঞ্জলি।

জবুথুবু বিলুকে অঞ্জলি বলে, তুই আজ তোর দিদির পাশে শো। তোর বাবার শরীল খারাপ।

ঘুম জড়ানো চোখে ওর বাবার দিকে একবার তাকাল বিলু। লজ্জা করল তাকাতে। ধুতে গিয়ে হাত ফসকে পড়ে যাওয়া কাচের গেলাসের টুকরোগুলোর দিকে যেরকম অপরাধীর মতো তাকিয়ে থাকেন মা, ওরকম তাকাল বিলু। বিলুর মনে হল বাবার কষ্টের জন্য ও নিজেও দায়ী। ও কেন ঝপঝপ করে এতটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে, কেন এত খিদে পায় বিলুর। কী করবে বিলু?

বিলু গুটি গুটি মশারির ভেতরে শুতে যায়। গামছার মশারি, গামছা সেলাই করে তৈরি হয়েছে এই মশারি। অনঙ্গমোহন মাঝে মাঝেই গামছা পান। যদিও যজমানি করেন না অনঙ্গমোহন, তবু মাঝে মাঝে কেউ বিপদে পড়ে ডেকে নিলে যেতে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ ভোজন, পণ্ডিত নিমন্ত্রণ, গীতাপাঠ এইসব ব্যাপারে অনঙ্গমোহন খুশি মনেই যান। গীতাপাঠ করলে একটি গীতা দান করার নিয়ম তো আছেই, একটি রেকাবিতে গীতা রেখে তারপর একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচ্ছাদন দেওয়া হয়, প্রায়শ সেটা একটা ছোটমোট গামছা। পণ্ডিত নিমন্ত্রণে ভোজন দক্ষিণার সঙ্গে গামছাও পাওয়া যায় অনেক সময়। এই সমস্ত 'গামছা সংগ্রহ' সেলাই করে মশারি বানিয়েছে অঞ্জলি। ঐ মশারিটা দেখলেই বিলুর 'হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর' কবিতাটা মনে পড়ে। গোবিন্দবাবু বাংলার স্যার কবিতাটা পড়াতে গিয়ে প্রথমেই বলেন—ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি। বিভেদের মধ্যে ঐক্য। ওই কবিতাটার মধ্যে আছে না, নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান। মশারিতে লাল গামছা আছে, হলুদ গামছা আছে, লাল হলুদের ডোরা আছে, লাল সবুজের ডোরা আছে, পাতলা আছে, খাপি আছে, সব নিয়ে এই মশারি, হাওয়া ঢোকে না। হাওয়া ঢোকে না তাই এই মশারি মায়ের আর স্বপ্নার। কারণ ওরা মেয়েছেলে। আর যে মশারি আসল মশারি, ফুটো ফুটো মশারি, হাওয়া ঢোকে, সেটায় বিলু শোয়, বিলুর বাবা শোয়। কারণ ওরা ব্যাটাছেলে।

স্বপ্না ঘুমিয়ে আছে। কী গভীর ঘুম ওর। স্বপ্নার বালিশের তলায় গোঁজা ছিল ওর ব্রেসিয়ার। বালিশ সরে যেতে বেরিয়ে পড়েছে। উঃ দিদি, তুই বডিজ পরিস?

ইশ্, কত রকমের খরচ বাবার। বিলু জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। জানালার সামনেই বটগাছ। চাঁদের আলো পাতার গায়ে পড়েছে, লাল লাল বটফলের গায়ে পড়েছে। দিদির শরীরের সান্নিধ্য থেকে সরে মশারির গায়ে গায়ে লেগে শুয়ে পড়ে। বালিশ নেই, ভাঁজ করা কাঁথা। মা এইখানে শোয়। মায়ের বালিশ নেই। মশারির প্রায় গায়ে গায়ে লেগে শুয়ে থাকে বিলু। মশারির পাশেই জানালা। লাল গামছার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো পাওয়া বটফুল রহস্যময় দেখায়। আর একবার ওয়াক্ তোলে বিলুর বাবা বিলুর মনে হয় ওরও কিছু করার ছিল।

যে বাড়িটায় বিলুরা থাকে সেটা দোতলা। এক তলায় একটা কালির কল। কালির বড়ি তৈরি হয়। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। মেশিনের ওপরের ফাঁদল দিয়ে একটা গুঁড়ো গুঁড়ো জিনিস ছেড়ে দেয় আর মেশিনের মুখ দিয়ে টপটপ করে পড়ে কালির বড়ি। ঐ কালির বড়ি জলে গুলে দিলে দোয়াতের কালি তৈরি হয়। নিবের কলমে ঐ কালি দিয়ে লেখা যায়। অনঙ্গমোহন এখনো নিবের কলমে লেখেন। কালির কারখানার মালিক বনমালী সাহা অত্যন্ত ভাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ। অনঙ্গমোহনকে বলে রেখেছেন—পণ্ডিতমশাই, আপনার দরকার হলে কালির বড়ি চেয়ে নিয়ে যাবেন। অনঙ্গমোহন এই কালিই ব্যবহার করেন। পি এম বাগচীর চেয়েও ভাল কালি। গরম জল দিয়ে খুব সুন্দর কালি তৈরি হয়।

তবে যত ভালই হোক না কেন, অনঙ্গমোহনের পিতার তৈরি কালির কাছে কিছুই নয়। অনঙ্গমোহনের পিতারও ছিল চতুষ্পাঠী। কাব্য ব্যাকরণ ছাড়াও স্মৃতিতীর্থ ছিলেন তিনি আর নানারকম ক্রিয়াকর্মের বিধান দিতে হত। নিজেই তৈরি করতেন সেই কালি।

ভুষা ত্রিফলা, বকুলের ছালা
ছাগ দুগ্ধে করি মেলা
তাহাতে হরিতকী ঘষি,
ছিঁড়ে পত্র, না উঠে মসী।

এখানে, কালির কলে কালি তৈরি হয় এক অদ্ভুত নিয়মে। লম্বা ত্রিপল বিছিয়ে সাদা সাদা একটা পাউডার ফেলা হয়। ঠিক ময়দার মতো দেখতে। এটার নাম ডেক্সট্রিন। এটা নাকি আলু থেকে তৈরি হয়। শুকনো আলুর গুঁড়ো। একটা ড্রামে রঙ গোলা হয়। কালো রঙ, লাল রঙ, নীল রঙ, সবুজ রঙ। ঐ সাদা রঙগুলো, রঙ গোলা জল দিয়ে মাখা হয়। মেখে মেখে দলা করা হয়, ঠিক ময়দা মাখার মতো। এবার ঐ রঙিন মণ্ড শুকোতে দেওয়া হয় ছাদে। শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে যায়। তারপর ঐ কড়কড়ে শক্ত দলাগুলো মুগুর দিয়ে পেটানো হয়। পিটিয়ে ছোট ছোট খণ্ড করা হয়। ঐ খণ্ডগুলো একটা মেশিনে দিয়ে দিলে মিহি গুঁড়ো হয়ে যায়। এবার কালি তৈরির আসল মেশিনের উপরে খাড়া করা ফাঁদলের মধ্যে ঐ গুঁড়ো ফেলে দিলে মেশিনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে কালির বড়ি। ব্ল্যাক নাইট কালি, কিং কালি, মাধুরী কালি...মাধুরী কালি হল লাল, বড় বড়। মাধুরী কালি যে কৌটোয় ভরা হয়, সেই কৌটোয় একটা মেয়েমানুষের ছবি, মেয়েটির হাতে একটা কালির বড়ি, বড়িটা ছুঁয়ে রেখেছে ঠোঁটে। কারখানার হেড কারিগর অনিল ব্যাপারটা খোলসা করে দিয়েছিল অনঙ্গমোহনকে। এটা লিপিস্টিক দাদু, লিপিস্টিক। সস্তার লিপিস্টিক। জল লাগিয়ে ঠোঁটে ঘষে দিলেই লাল। বিহারে যায়, উড়িষ্যা যায়। তাই আমরা লাল কালির বড়িতে গোলাপের সেন্ট মেশাই, শুঁকে দেখুন...।

বিলু মাঝে মাঝে একা একা থাকলে কালির কলে মেশিনের খেলা দেখে। একটা মোটর ঘুরছে, তার সঙ্গে বেল্ট লাগানো, চারটে মেশিন চলছে তাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুঁড়োগুলো ডাইসের মধ্যে পড়ছে। ডাইসের ওপর, একটা ভারী লোহার চাপ পড়ছে। এই যে যন্ত্রের শব্দগুলো, তার মধ্যেও একটা তাল, ছন্দ আছে, আর মেশিনের মুখ দিয়ে টুপুর টুপুর কালির বড়ি বেরুচ্ছে। একটা ড্রামে পড়ছে। বিলু একদিন একমুঠো কালির বড়ি সাট্ করে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নেয়।

ঝুলনে তো পুতুল সাজায়, রাধাকৃষ্ণ দোলে। কালো রঙের রাস্তা হয়, সবুজ মাঠ হয়। রঙ করা কাঠের গুঁড়ো বিক্রি করে ন্যাড়াদা, ঝুলনের আগে আগে। বিশ্বকর্মা পুজোর আগে আগে যেমন সুতো আর ঘুড়ি, কালীপুজোর আগে আগে বাজি। রথের সময় পাঁপড়-ভাজা।

তখন পাঁপড়-ভাজা বিক্রি করছিল ন্যাড়াদা। বিলু গুটি গুটি ন্যাড়াদার কাছে আসে। ন্যাড়াদা বলে কি রে, পাঁপড় খাবি? বিলু বলে উঁহু।

তবে?

এমনি।

পাঁপড় ভাজা দেখচিস?

হুঁ।

কোনো কাজই ইয়ে নয়। ডিগনিটি অব লেবার এসে পড়েছিস?—পড়িসনি তো, পড়বি। ভেরি ইম্পোর্ট্যান্ট। পি কে দে সরকারের বইতে আছে। আমি তো সব করি। আই কম ফেল, তাতে কী হয়েছে। বাঁচার জন্য স্ট্রাগেল করছি।

তখন বিলুর পকেটে হাত। হাতে একমুঠো কালির বড়ি।

বিলু বলল—ন্যাড়াদা, আমিও স্ট্রাগেল করছি। বাঁচার জন্য।

তা তো করতেই হবে। তোরা তো বাঙাল, সব ছেড়েটেড়ে এধারে এসেছিস, একে চাকরি নেই। তাতে আবার তোরা ভাগ বসাচ্ছিস। বিধান রায় তো স্টেটবাসে সব বাঙালদেরই চাকরি করে দিলেন। ফুটপাতের হকারদের দ্যাখ এইট্টি পার্সেন্ট বাঙাল। আমিও তাই ভাবলুম বাঙালরা যদি এরকম ফাইট করতে পারে আমরাও পারব না কেন। স্ট্রাগেল ছাড়া উপায় নেই। যখন যা ডিমান্ড তাই বিক্‌কিরি করছি।

আমিও একটা জিনিস বিক্রি করব ন্যাড়াদা। কিনবে? তোমার দরকার হবে ন্যাড়াদা, সামনে ঝুলন। পকেট থেকে মুঠোটা বার করে বিলু। লজ্জামুঠি খুলে যায়। ন্যাড়াদা সোজা তাকায় বিলুর চোখের দিকে।

ঝাড়ামাল?

বিলুর মুখ নিচু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে যা। কিং বড়ি খুব ভাল। ক'টা আছে?

একমুঠো।

ক'টা? গুনে ফ্যাল।

বিলু গুনছিল। হরি সাহার বাড়ির রেলিং, নিমগাছ, নিমগাছের ডালে বসা কাক, ল্যাম্পপোস্ট, পোস্টের বাল্‌ব সবাই গুনগুনিয়ে দুয়ো দিচ্ছে। বিলু বলল, তেইশটা।

টুয়েনটি থ্রি ইন্টু থ্রি ইজিকাল্টু সিক্সটি নাইন। তোমাকে ষাট পয়সা দিচ্ছি। হাত পেতে পয়সা নেবার সময় বিলু দেখল ওর বাঁ হাতের চেটো সবুজ হয়ে গেছে। হাত ঘেমে ছিল বুঝি?

কিছু লাল আর কালো দিয়ে যাস পরে।

বিলু ঘাড় নাড়তে পারছিল না, যে ঘাড় নাড়ায় সম্মতি প্রকাশ করা যায়।

আরে লজ্জা কী? স্ট্রাগেল, স্ট্রাগেল।

প্রেশার খুব কম।

জগদীশ আর জি কর হাসপাতালের আউটডোর থেকে ফিরে এসে বলল।

আর কী বলল ডাক্তার। অঞ্জলির ব্যস্ত প্রশ্ন।

—মাছ, মাংস, ডিম, সন্দেশ...

—আর?

—পেট খালি রাখা চলবে না। মাঝে মাঝে বিস্কুট।

—ওষুধ?

—না।

—যাক।

ওষুধ লাগবে না জেনে অঞ্জলি 'যাক' শব্দ করে নিশ্চিন্ত হল দেখে জগদীশ হাসল। বলল, মাছ-মাংসের দাম কি টনিকের চেয়ে কম? বিলু দেখল, বাবার হাতের প্রেস্‌ক্রিপশনের কাগজটা ক্রমশ দলিত হচ্ছে বাবার মুঠোর মধ্যে। পিষ্ট হচ্ছে। একটা গোলা পাকিয়ে গেল ক্রমশ।

দু'আনা দামের দুটো সন্দেশ কিনল বিলু। সন্দেশ কিনে ঘরে ফিরছে। শালপাতায় কাঠি ফুঁড়ে একটা ঠোঙা আর একটা শালপাতার কাঠি ফুঁড়িয়ে ঠোঙাটা ঢাকা দেওয়া আছে। বিলুর বাঁ হাত ঠোঙার ওপরে, আর ডান হাতটা তলায়। খুব সাবধানে নিয়ে যাচ্ছে বিলু। দামী জিনিস নিয়ে যাচ্ছে বিলু। ভাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২১ www.amarboi.com ~

করে নিয়ে যাচ্ছে, চারদিক তাকাতে তাকাতে। আকাশে তাকাল। চিল আছে কি না দেখল। বিরামের দোকান থেকে জিলিপি আনছিল সেদিন, একটা চিল ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছিল। এখন আকাশে চিল নেই, মেঘ। কালচে মেঘ। বৃষ্টি আসবে। শিখা যাচ্ছে বিরামের দোকানে ওর বাবার জন্য সন্দেশ আনতে। বিলু বাঁ হাতটা সরিয়ে নিল, যেন ঠোঙাটার পরিপূর্ণ অবয়ব দেখা যায়। দেখ শিখা দেখ, আমিও বাবার জন্য সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছি। জগদীশ, জগদীশ কাঁচকলা ভাতে দিস এবার? দ্যাখ, বিলু মানে বিপ্লব ভট্টাচার্য ওর বাবার জন্য সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছে।

সামনেই সুরকির মিল। ঝুড়ি ঝুড়ি ইটের টুকরো ফেলে দিচ্ছে একটা বিরাট জাঁতার মধ্যে। কী প্রচণ্ড শব্দ! ইটের টুকরোগুলো ক্রমশ কেমন গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। গুঁড়ো হতে কী আনন্দ হয়। জাঁতার মধ্যে ইটের টুকরোগুলোর কেন যে এত উচ্ছ্বাস। কাঁপছে, নাচছে, লম্ফ দিচ্ছে।

বিলু একবার ঠোঙাটার গন্ধ শোঁকে। শালপাতার গন্ধ পায়। শালপাতার গন্ধের মধ্যে একটা কি যে ভাল ব্যাপার আছে ঠিক বোঝানো যায় না। শালপাতায় লেগে থাকা কচুরির ছোলার ডাল জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করার সময় বিলু দেখেছে ঐ ছোলার ডালের অবশেষ শালপাতার সঙ্গে মিশে গিয়ে কি অদ্ভুত ব্যান্ডপার্টির সুর তৈরি করে। আলুকাবলির পরেও শালপাতা চেটেছে বিলু, কিংবা ফুচকার খাট্টাখানি খাবার সময়েও। এখন শালপাতা সমেত সন্দেশটার গন্ধ পেতে চেষ্টা করল।

বিলুর দাদু সন্দেশ আনেন বছরে দুবার তো বটেই, দারুণ সন্দেশ। দাদু ক'দিন আগে থাকতেই বলতে থাকেন—অমুক দিন জ্যোতিষ সম্রাটের বাড়ি পণ্ডিত নিমন্তন্ন। অনঙ্গমোহন ধুতি-ঢাকা পিতলের রেকাবি ও একবাক্স সন্দেশ নিয়ে হাসতে হাসতে ঢুকে বলেন—অনন্ত জ্যোতির্ভূষণের তুলনা হয় না। তার পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে কোনো কৃপণতা নেই। কে করে আজকালকার দিনে? বৌমা—সন্দেশ।

গন্ধ পেতে চেষ্টা করে বিলু। ঘ্রাণ নেয়। বিলু তারপর কাঠিটা খোলে। আচ্ছাদনী শালপাতাটা সামান্য ফাঁক করে। দ্যাখে একজোড়া সন্দেশ কেমন আদরের দুলালী হয়ে বসে আছে এবং তখনই দ্যাখে সন্দেশের গায়ে মণি-মাণিক্যের মতো লেগে রয়েছে গোলাপী আভার কিশমিশ। টুসটুসে কিশমিশ। বিলু ভাবল খাই? কিশমিশ দুটো খাই? পাতাটার ঢাকনা সরিয়ে যেই না কিশমিশ খুঁটতে গেল বিলু, ওমনি কানের পাশ দিয়ে সাঁই করে নেমে

এল একটা চিল। ছোঁ মারল বটে, কিন্তু পাতার ঠোঙাটা ছিনতাই করতে পারল না। সন্দেশদুটো রাস্তায় পড়ে গেল। এক পলক তাকিয়ে দেখল ঐ আহত যমজ সন্দেশদের। তারপর পিছনে তাকাল। শিখা-টিখা নেই রাস্তায়। দ্রুত তুলে নিল তারপর। খুব ভাল ছেলে হয়ে বিলু বাড়িতে ঢোকে। কলঘরটা একতলায়, ঠিক সিঁড়িটা পাশেই। কলঘর বন্ধ করে দিল বিলু। অল্প আলোয় সন্দেশ দুটোকে ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল বিলু। সামান্য ধুলো লেগে আছে মনে হল। জামাটা দিয়ে মুছে নিল। একটা সন্দেশ মাঝখান দিয়ে ফেটে গেছে। দু হাত দিয়ে জোড়া লাগাল। এবারে কী করবে বিলু? রাস্তায় পড়ে যাওয়া সন্দেশ কি ওর বাবাকে দেবে? নাকি নিজে খেয়ে নেবে অথবা ফেলে দেবে? আবার ভাল করে পরখ করল সন্দেশ দুটোকে। ধুলোবালি দেখতে পেল না তেমন। ধুলোবালি না থাক জীবাণু তো আছে, জীবাণু তো আর চোখে দেখা যায় না। কিন্তু জীবাণু যে কেবলমাত্র রাস্তার ধুলোতেই থাকবে তা তো নয়, কালবৈশাখী ঝড়ে জানালা দিয়ে আসা যে ধুলো সেটা কি রাস্তার ধুলো নয়? গঙ্গার জলে তো জীবাণু ভর্তি। দাদু আর বাবা যে সন্ধ্যা-আহ্নিক করার সময় গঙ্গার জল আচমন করে তাতে বুঝি জীবাণু যায় না? আর ধুলো-বালি তো সবসময় উড়ছে। দোকানের মুড়িতে, গুড়ে, কিসে নয়? সব কিছুতেই ধুলো পড়ছে। আর বিকেল বেলা যখন বটগাছের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে রোদ্দুরের ফোকাস আলো ঘরের ভেতরে এসে পড়ে, তখন বিলু দেখেছে গুঁড়ি, গুঁড়ি, গুঁড়ি বিন্দুর চেয়েও ছোট কত সূক্ষ্ম ধুলো-বালি উড়ছে। কিচ্ছু হবে না, এই সন্দেশ বাবা খেলে কিচ্ছু হবে না। খাল-ব্রিজের তলায় থাকা ভিখিরিরা তো নর্দমার থেকেও খুঁটে খায়, কই ওদের কি কিচ্ছু হচ্ছে?

সন্দেশ দুটো ঠোঙায় বসিয়ে কাঠি গেঁথে নিয়ে ওর মায়ের কাছে যায় বিলু। মা তখন কুলোয় খৈ নিয়ে ধান বাছছিলেন। অনঙ্গমোহন রাত্রে দুধ-খৈ খান। মায়ের কপাল কুঁচকে ছিল, বিরক্তির রেখা। বিলু ওর মায়ের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে কিছুটা সংকোচে বলল, মা বাবার জন্য সন্দেশ এনেছি দুটো। বিলুর মায়ের কপালের কুঞ্চন মসৃণ হয়ে গেল হঠাৎ। এবারে বিস্ময়। তাই নাকি?

এবার ক'দিন আনব।

পয়সা?

কুড়িয়ে পেয়েছি।

 www.amarboi.com ~

জগদীশের ধুম জ্বর। সঙ্গে পিঠের ব্যথা। হোমিওপ্যাথি বই খুলে লক্ষণ মিলিয়ে ওষুধ খেল জগদীশ। কমল না। অঞ্জলি বলল প্রকাশবাবুকে ডাকি? প্রকাশবাবু এম-বি। চার টাকা ভিজিট নেন। জগদীশ বলল আর একটা দিন দেখি। অঞ্জলি তবু ডাক্তার ডাকল। প্রকাশবাবু বড় রসিক লোক। হা হা করে হাসেন। জগদীশকে দেখে আজ খুব একটা মজার কথা বললেন না, বললেন, মনে হচ্ছে কিড্‌নিতেই ব্যথা। পেচ্ছাপ পরীক্ষা করাও, রক্ত পরীক্ষা করাও।

দুদিন পর হাত-পা ফুলে গেল। বুকে কফ ঘড়ঘড় করে। অঞ্জলি লক্ষ্মীর ঘট ভেঙে ফেলেছে। প্রকাশবাবুর কোনো ওষুধই কাজে আসছে না। প্রকাশবাবু বলেন, অমল রায়কে ডাকো। অমলবাবু বিলেত ফেরত। বত্রিশ টাকা ভিজিট নেন।

অনঙ্গমোহনকে অঞ্জলি বলে বাবা, আপনার কাছে কোনো টাকা-পয়সা আছে?

অনঙ্গমোহন খুবই অপ্রস্তুতে পড়েন। আর মাস দুয়েক পর হলে কিছু দিতে পারতেন। তাঁর টোলের জন্য সরকারি সাহায্য পান তিনি। ঐ টাকা আলাদা তহবিলে রাখেন না কখনো। ঐ টাকার আলাদা হিসেবও রাখেন না। জগদীশ যে টাকা এনে তাঁর হাতে দিত, তার মধ্যে মিলিয়ে দিতেন। এখন বৌমার টাকার সঙ্গে মিশিয়ে রাখেন। সরু তিরতিরে নদী যখন গাঙে পড়ে, নদী ভাবে ঐ বিশাল জলরাশির মধ্যে আমার দেওয়া জলও রয়েছে। এইভাবেই খলু সংসারে জড়িয়ে আছেন অনঙ্গমোহন।

ট্রাংক খুললেন অনঙ্গমোহন। যত্নে রাখা রিফিউজি সার্টিফিকেট, দেশের বাড়ির জমির পরচা, পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠীর অনুমোদনের চিঠি, বিদ্যোৎসাহদায়িনী সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত প্রশস্তিপত্র, বিসম্যাগ ট্যাবলেট, এসিনার কৌটো, ইলেকট্রিক লোশনের শিশি, মাধুরী কালির খালি কৌটো। ঐ-কৌটো খুলে পঞ্চম জর্জের আমলের টাকা চারটি ছাড়া সিকি আধুলি টাকা মিলে ছেচল্লিশ টাকা গুনলেন অনঙ্গমোহন। ছ'টি টাকা রেখে চল্লিশটি টাকা একটা রুমালে বাঁধলেন। অঞ্জলিকে বললেন, নাও বৌমা।

জগদীশের সর্বাঙ্গে ব্যথা। বমি। জ্বর। বুকে কফ। অমল রায় রিপোর্ট দেখলেন, সারা শরীরে স্টেথো চাপলেন। প্রকাশবাবুকে বললেন, মিসটেরিয়াস।

বিলু বুঝতে পারল ডাক্তারবাবুরা রোগটাই ধরতে পারছে না। একটা বিচ্ছিরি ধরনের জীবাণু ঢুকেছে শরীরে। অমল রায়ের ওষুধেও কাজ হচ্ছিল

 www.amarboi.com ~

না। হাত-পা আরও ফুলে গেল। জগদীশ হাতের ইশারায় বিলুকে কাছে ডাকলেন, বিলুর হাতটা চেপে ধরলেন। অনেক কষ্টে বললেন, বিলু আমায় বাঁচা। আমায় বাঁচা। বিলুর চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। নিজেকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত করে ফেলতে ইচ্ছে করে। উঃ বাবা, কেন আমি রাস্তায় পড়ে যাওয়া সন্দেশ তুলে খাইয়েছিলাম। চোখের কোণায় জল টলটল করছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ঐ জলের ফোঁটাকে টানছে। চোখের কোণা থেকে বিচ্যুত হলেই ঐ জল পড়বে বাবার বুকে। বিলু আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে—জল যেন চোখের কোণেই রয়ে যায়। নিউটন, নিউটন গো...

তিন

বিলু আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে, জল যেন চোখের কোণাতেই রয়ে যায়। সামনে বাবার ছবি। তারানাথ স্মৃতি-তীর্থ বলছেন, ব্রহ্মচারী, এবার এদিকে আয়। এখনো অনেক কাজ বাকি। হোমকুণ্ড তৈরি। সমিধ দিতে হইবে।

বিলু কাপড় চাপা দেয় চোখে। জল টেনে নেয় গেরুয়া বসন। আবার আসনে এলে কামাখ্যা পুরোহিত বলেন এবার উদীচ্যকর্ম তারপর কিঞ্চিৎ ব্যাদপাঠ। তারানাথ স্মৃতিতীর্থ বলেন, আর ব্যাদপাঠ...। হুঃ। ব্যাদের শ্লোকের উচ্চারণই করতে পারে না কেউ। সব শেষ হইয়া গেল। কামাখ্যা পুরোহিত বললেন জহরলাল, বিধান রায় দুই জনেই কুষ্মাণ্ড। আমার এক ভাইগনা জহরলালী বিবাহ করল—এক কৈবর্ত কন্যা—রেজিস্ট্রারি। তারানাথ বলল মহা সংকটের দিন আসতাছে অনঙ্গ, তোমার আমার ঘরেও এইসব ঢুকবে। সংস্কৃত, সংস্কৃতি কিছুই থাকবে না। অনঙ্গমোহন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বললেন, এত নিরাশাব্যঞ্জক কথা কইয়ো না কামাখ্যা ভাই, সংস্কৃত সহজে মরব না, মরতে পারে না।

যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ যাবদ বিন্ধ্য-হিমাচলৌ
যাবদ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্।

যতদিন গঙ্গা গোদাবরী, ততদিন সংস্কৃত ভাষা আছে। অনঙ্গমোহন হঠাৎ ডাকতে থাকেন—অসীম-অসীম...। অসীম কাছে ধারে ছিল না।

কাজের বাড়ি। অল্প হলেও নিমন্ত্রিত কয়েকজনের পাত পড়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৫ www.amarboi.com ~

ততক্ষণে। অঞ্জলি নিজেই পরিবেশন করছিল। অঞ্জলি শুনল—অসীম-অসীম—অনঙ্গমোহনের ঐ ডাকের ভঙ্গিমায় বেশ ক্ষোভ মেশানো ছিল। অসীম যে কিছুটা একটা অন্যায় করেছে অঞ্জলি বেশ বুঝতে পারছিল। ঐ বুড়ো অসীমকে বড় আশকারা দেয়। নিজের নাতি বিলুর চেয়েও ভালবাসে। অঞ্জলির মোটেই এসব ভাল লাগে না। এই সময় অসীম কিছু ধমক-ধামক খাবে বুড়োর কাছে। অঞ্জলিও ডাকতে লাগল অসীম, অ্যাই অসীম...

বিজু ওদের ঘরেই ছিল। ও জানালা দিয়ে অসীমকে দেখতে পায় রাস্তায়। খগেন পাগলার পেছনে লেগেছে। অসীম সুর করে বলছে, মোহনবাগান হেরেছে। খগেন পাগলা তেড়ে গিয়ে বলছে, তোর বাপ মরেছে। অসীম বলছে, কমুনিস পার্টি এম.এল.এ, খগেন বলছে, তোর বাপের ছ্যাদ্দ খেয়ে লে।

বিজু একবার শিখার দিকে চায়। মিটি মিটি হাসে। বাইরে তখন অসীম-অসীম। বিজু বলে অসীম অসীম করে মায়, অসীম গেছে কাদের নায়। অনঙ্গ বুড়ো চিল্লায়, অসীম রে তুই ঘরে আয়। ততক্ষণে অনঙ্গমোহন জানালা দিয়ে অসীমকে দেখতে পেয়েছেন। অনঙ্গ অসীমকে ডাকেন, গলার শির ফুলে যায়, অ্যাই অসীম, বেতরিবত, লঘু, কুষ্মাণ্ড, হতভাগা, আয়।

অসীম আসে, অসীমের পায়ে কাদা। অনঙ্গমোহন বলে ব্যাদ্দপ, তরে না কইছি সর্বক্ষণ আমার পাশে থাকবি, সমস্ত উপনয়ন প্রক্রিয়া লক্ষ্য রাখবি, বলেই একটা থাবড়া তোলেন, মারেন না, বলেন এক চপেটাঘাতে মৃতকল্প কইরা দিমু, বে-আক্কইল্যা, শয়তান কাঁহাকা।

তারানাথ স্মৃতিতীর্থ অনঙ্গমোহনের কাঁধে হাত দিয়ে বলেন, বড় বেশি উত্তেজিত হও তুমি, আর উত্তেজিত হলে বড় বেশি যাবনিক শব্দ ব্যবহার কর। ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহ্, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ...অনঙ্গমোহন মাথা নিচু করেন। আকস্মিক ক্রোধের কারণে না যাবনিক শব্দ ব্যবহারের কারণে বোঝা যায় না। অনঙ্গমোহন অসীমের মাথায় হাত রেখে বলেন—শুন, আমি তোমার পিসামশয়, কিন্তু আমি তোমার আচার্য, গুরু। আমার চতুষ্পাঠীতে তুমি অধ্যয়ন কর। চতুষ্পাঠী। হ, হ, চতুষ্পাঠী। আমি গুরু। তুমি তোমার ঘরবাড়ি ছাইড়া, পিতা-মাতা ত্যাগ কইরা এই আমার কাছে আসছ, প্রাচীনকালের গুরুকুল প্রথায় যেমন হইত। তুমি গুরুগৃহে আছ। ব্যাকরণ কাব্য পাঠাদির মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা করবা যেমন, সংস্কৃতিরও শিক্ষা করবা। কইছিলাম না, আজ আমাগোর লগে থাকবা, চূড়াকরণ, উপনয়ন, চরুহোম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাগ-যজ্ঞ দেখবা, আর তুমি অপদার্থ, রাস্তায় রাস্তায় ভো ভো ঘুরতাছ? পাষণ্ড।

বোবাঠাকুর, মানে অসীমের বাবা, ভীষণভাবে মাথা নাড়ছেন, সম্মতির মাথা নাড়া, আঙুলে আঙুল লাগাচ্ছেন, যেন ঠিক কথা—ঠিক কথা। মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ বের হচ্ছে, গালের কষ দিয়ে গড়াচ্ছে লালা, কামাখ্যা পুরোহিত বললেন, যজ্ঞবেদি তৈয়ার।

অনঙ্গমোহন বললেন, কামাখ্যা, তোমার পাঁতি অসীমরে দাও। ও কিঞ্চিৎ তন্ত্রধারী করুক। কামাখ্যা পুরোহিত বললেন, বেশি-বেশি কইরো না অনঙ্গ, তোমার অসীম ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারব না। অনঙ্গমোহন বললেন অসীম আমার ছাত্র। ঠিকই করবে। কামাখ্যা বললেন, স্নেহ বড় অন্ধ। তুমি অরে নিয়া অতিরিক্ত ভাবতাছ। অনঙ্গমোহন হাসলেন। বললেন—

মূর্খো বদতি বিষ্ণায়
ধীরো বদতি বিষ্ণবে
দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং
ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ।

বুঝলা না? চতুর্থীর একবচনে বিষ্ণু শব্দ বিষ্ণবে হয়, কিন্তু বিষ্ণায় কইলেও খোদ বিষ্ণুর বুঝতে ভুল হয় না। তারানাথ বললেন এটা কূট তর্ক। অর্থহীন। তাইলে আর মন্ত্রই-বা কেন। মন্ত্রপাঠ না কইরা, শেষকালে যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ ইত্যাদি কইয়া দিলেই তো হয়। হে প্রভু যা ভুল উচ্চারণ করছি, যে যে মন্ত্র আদৌ উচ্চারণ করি নাই, তুমি পূর্ণ কইরা লও। তাহলে তো শূদ্রও পূজা যাগযজ্ঞ করতে পারে, দোষ কী?

অনঙ্গমোহনের বেশ লাগে। আহা, যেমন পণ্ডিত সভা। পণ্ডিত সমাবেশ। পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক না হলে কি ষোলকলা পূর্ণ হয়?

অনঙ্গমোহনের পিতা নীলকমল বিদ্যালঙ্কার ছিলেন পণ্ডিতপ্রবর। যে কোনো শ্রাদ্ধ, উপনয়ন এমন কি বিবাহ বাসরেও তাঁকে ঘিরে থাকত অন্য পণ্ডিতরা। প্রায়ই বিতর্কসভা বসত। তুলনায় কমবয়সী হলেও নীলকমলকেই মধ্যস্থ হতে হত। পণ্ডিত বিতর্কে দুটি পক্ষ থাকত। উত্তরখণ্ড এবং পূর্বখণ্ড। একদল প্রশ্ন করতেন, অন্যদল উত্তর দিতেন। প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না হওয়া পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর চলতেই থাকত। মধ্যস্থের ভূমিকা ছিল কিছুটা বিচারকের। প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক হল কি না মধ্যস্থই বিচার করতেন। একটি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও তাঁর ছাত্র বা প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে একটি দল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত। কলাপ ব্যাকরণের সঙ্গে পাণিনির সূক্ষ্ম বিতর্ক, মনুর সঙ্গে পরাশরের বা সর্বানন্দকৃত তান্ত্রিক ঘটস্থাপন পদ্ধতির সঙ্গে প্রচলিত ঘটস্থাপন পদ্ধতির প্রভেদ কিংবা নৈষধ চরিতের অনুপ্রাসাধিক্য রসহানি করেছে কি না—এরকম বহু বিষয়েই নীলকমলের মীমাংসাই স্বীকৃত হত। অনঙ্গমোহন বসে বসে দেখতেন ওঁর পিতা কেমন সর্বত্র জিতে যাচ্ছেন। ন্যায়শাস্ত্রের ফক্কিকারি ধরে ফেলছেন। নীলকমলের পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠীর সমস্ত ছাত্র আচার্য গরবে উল্লসিত থাকত অপাদান শুদ্ধির কারণে। অপাদান শুদ্ধি কথাটা বললে এখন কি কেউ আর বুঝবে? এরকম কত কথা হারিয়ে গেল। অসীমকে জিজ্ঞাসা করলেন অনঙ্গমোহন, অপাদান শুদ্ধির অর্থ নি বুঝস অসীম্যা—অসীম ইতস্তত না করেই বলে—অপাদান কারক? ব্যাসবাক্যসহ শুদ্ধ করে অপাদান কারক লেখা? উপস্থিত পণ্ডিত সকল হেসে উঠলেন। তারানাথ বললেন, এইসব কি আর অরা জানে? অনঙ্গমোহন ব্যাখ্যা করলেন—ভাল গুরুর নিকট পাঠ নেয়ার নাম হইল অপাদান শুদ্ধি। তোমার অপাদান শুদ্ধি আছে অর্থাৎ প্রকৃষ্ট আচার্যের নিকট পাঠ নেয়া আছে।

এ সময় বাড়িতে শোরগোল। বিখ্যাত কেউ এসেছে যেন।

বিলুর মা যেন হঠাৎ উল্লসিত।

আরিব্বাস। কী সৌভাগ্য আমাগোর। ভাবতেই পারি নাই আপনেরা যে এত কষ্টটষ্ট করে আসবেন।

—আরে আপনি বলছেন, আসতেই তো হবে।

—তা তো হইল। কিন্তু বৌদি তো এখন এখানেই আছে। আনলেন না যে?

—কত বললুম। ওর দিদির সঙ্গে সিনেমা যাবে ঠিক করে রেখেছে। জয়া বই।

—আপনেরা যে আসছেন, কী যে ভাল লাগছে, আসেন।

—ছেলে কোথায়?

—ও তো ঘরে। পৈতার ঘরে। পৈতা শেষ হয় নাই। একটু কাজ বাকি আছে অখনো।

—তা যাই, দেখিগে, আপনাদের পৈতে-টৈতে এসব তো আমাদের হল না, সামনের জন্মে যদি বামুন হয়ে জন্মো নিতে পারি, হে হে হেঃ।

অঞ্জলি ঘরে ঢোকে, সঙ্গে তিনজন পুরুষ। একজন ধুতি আর ফুলশার্ট পরা, দুজন ফুলপ্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট। একজনের গায়ে টেরিলিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামা। জামার ভিতর থেকে দেখা যায় গেঞ্জির জালিমা। অঞ্জলি বলে আমার অফিসের লোকজন। কামাখ্যা পুরোহিত সাত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ান এবং বিলুর মাথার ঘোমটা টেনে দেন। অনঙ্গমোহনের কানের কাছে মুখ রেখে প্রশ্ন করেন, ব্রাহ্মণ তো?

অনঙ্গমোহন টেরিলিন পরা ভদ্রলোকটিকে চেনেন। আগেও কয়েকবার দেখেছেন। নামটা ঠিক মনে নেই, তবে পদবি মনে আছে, যশ। বর্ধমানের লোক। বৌমার চাকরির জন্য অনেক করেছেন উনি। অন্য ভদ্রলোক দুজনকে অনঙ্গমোহন চেনেন না।

অঞ্জলি আরও দু-পা এগিয়ে যায়। যশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে, আসুন।

অনঙ্গমোহন অঞ্জলির চোখের দিকে তাকায়, কিন্তু অঞ্জলি সে সময় তাঁর শ্বশুরমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে নেই, ফলে চোখাচোখি হয় না।

—বিলু ওঠ। তোর যশকাকু এসেছে।

—বৌমার ঘোমটা পড়ে গেছে। অনঙ্গমোহন চাকরিরতা বৌমার পুরুষ বন্ধুদের দেখেন। অনঙ্গমোহন অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে ইশারায় নঞর্থক ভঙ্গি করেন, অঞ্জলির ব্যস্ততা এখন ওর অফিসের অতিথি নিয়ে।

বিলু, এই যে, দ্যাখ তোর যশকাকু এসেছে। আর মুখার্জিকাকুর কথা শুনিস না, এই যে মুখার্জি, আর ইনি রামকুমার মণ্ডল। মণ্ডলকাকু।

যশকাকু বলেন, এক্কেবারে নিমাইয়ের মতো লাগছে। কলির নিমাই।

কামাখ্যা ও তারানাথ পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

কামাখ্যাচরণ চিৎকার করে বললেন—ঘোমটা দেও, ঘোমটা দেও বিলু। যশবাবু বললেন—ঘোমটা দেবে কেন? নতুন বৌ নাকি। তারানাথ বললেন—নিয়ম। আমাগোর নিয়ম।

এই বলে ঘোমটা টেনে দিলেন।

যশ আস্তে আস্তে মুখার্জির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল—বাঙালদের অনেক আজব নিয়ম। বিলু শুনল ব্যাপারটা। বিলু জানে ও বাঙাল। বাঙাল দেশ বিলু দ্যাখেনি কোনোদিন। দাদুর কাছে, মার কাছে চৌমহনী, দেওয়ানবাড়ি, গোয়ালন্দ এইসব কথা শুনেছে শুধু। বিলুর জন্ম বাগবাজারে, তবু সে বাঙাল। ইস্টবেঙ্গল হারলেই বিলু শুনত বাঙাল—পুঁটি মাছের কাঙাল। বাঙাল নিয়ে খুব ছড়া কাটে খগেন পাগলা। বাঙালু রস খাইলু ভাঁড় ভাঙিলু পয়সা দিলু না...

যশকাকুর হাতে ফোলিও ব্যাগ। চেন খোলার শব্দ পেল বিলু। ঘোমটার

 www.amarboi.com ~

ফাঁক দিয়ে বিলু দেখল দুটো প্যাকেট, লাল বুটিবুটি কাগজে মোড়া। একটা লম্বামতো বাক্স আর একটা চৌকা বাক্স। বিলু তাড়াতাড়ি ঝোলাটা নিয়ে এল। ভবন ভিক্ষাং দেহি। যশবাবুর হাতটা ঝোলার মধ্যে ঢুকল, তারপর বেরিয়ে এল ঐ লাল পাথর আর চকলেট পাথরের আংটি পরা হাত। বিলু অসীমের দিকে চাইল, অসীমের চোখে কৌতূহল।

কী আছে ঐ বাক্সে?

অঞ্জলি বলল, এসব আবার আনতে গেলেন কেন আপনারা? এসবের কোনো দরকার ছিল না। বড়জোর একটা টাকা দিয়ে দিলেই পারতেন।

আপনি চুপ করুন তো, এসব আমাদের ব্যাপার। যজ্ঞিবাড়ি যাচ্ছি, খালি হাতে যাব নাকি? মণ্ডলবাবু বললেন।

আসলে মণ্ডলবাবু জানিয়ে দিলেন ঐ যে দুটো প্যাকেট কেনা হয়েছে, তার মধ্যে মণ্ডলবাবুরও অবদান আছে।

অঞ্জলি ওদের সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেলে কামাখ্যা পুরোহিত তাঁর নিজের থলি থেকে বের করলেন একটা মহাভৃঙ্গরাজ তেলের শিশি। ঐ শিশিতে কিছুটা জল। পবিত্রবারি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এই একটু ছিটাইয়া দিই, কেমন? তারানাথ স্মৃতিতীর্থ বললেন—এইসবের কিছু জানি না আমি। অনঙ্গমোহনের শূন্যদৃষ্টি। এই মুহূর্তে একটা অনাচার হয়ে গেল। উপনয়নের মধ্যে শূদ্র প্রবেশ। বৌমাকে এখন আর তেমন কিছু বলতে পারেন না অনঙ্গমোহন। চাকরিরতা। ছেলে জগদীশের চাকরিটাই বৌমা পেয়েছে। ভাত-কাপড়ের জন্য বৌমার ওপরই নির্ভর। এই নির্ভরশীলতাজনিত হীনম্মন্যতাবোধ মাঝে মাঝেই অনঙ্গমোহনকে ক্রোধী করে তোলে। মাঝে মাঝে বলেই ফেলেন—ভাইবো না বৌমা, তোমার খাই, তোমার পরি। আমারও চতুষ্পাঠী আছে, পণ্ডিত বৃত্তি আছে, অঞ্জলি তখন ঠিক আছে, ঠিক আছে বা তা তো জানিই—এমন কায়দায় বলে যে তার ব্যঞ্জনার্থ বেশ বুঝতে পারেন অনঙ্গমোহন। অঞ্জলির ঘাড় কাত করা, দ্রুত হেঁটে যাওয়া, কথা না শোনার ভান বা ঐ ক্ষুদ্র বাক্যপ্রয়োগ যথা—জানা আছে, জানা আছে, বা ঠিক আছে—ইত্যাদি কথার ভাবসম্প্রসারণ করলে যা যা অর্থ প্রকাশ পায় তা হচ্ছে, অনঙ্গমোহন মনে মনে হিসেব করেন—

১. কত টাকা পণ্ডিতবৃত্তি পান তা জানি, তাতে আপনার গ্রাসাচ্ছাদন হয় না।

২. আপনি বিপত্নীক। আপনার স্ত্রী নাই। গরম জলটা, হরতকি ছেঁচা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাপড় কাচা ইত্যাদি কর্ম কে করে শুনি?

৩. আপনি বৃদ্ধ। পুত্র নাই, স্ত্রী নাই। আমি ছাড়া কে আপনাকে দেখবে। সুতরাং ভো ভো গর্দভঃ তুমি আমার ওপর নির্ভরশীল।

কামাখ্যা পুরোহিতের ভ্রূকুঞ্চিত মুখের দিকে একঝলক তাকালেন অনঙ্গমোহন। তারানাথও গুম হয়ে বসে আছেন। অসীমকে বললেন দ্যাখ তো বাবা, জিজ্ঞাসা কর ব্রাহ্মণ-ভোজনের আর দেরি কত? কামাখ্যা পুরোহিত বললেন, এত তাড়া কিসের? স্মৃতিতীর্থ আস্তে আস্তে বললেন অনাচার পুরী মধ্যে যঃ পলায়তি স জীবতি, বলেই হাসলেন। এটা কিন্তু একটা রসিকতা। অনঙ্গমোহনও কথাটা শুনলেন কিন্তু রসগ্রহণ করতে পারলেন না। কথাটা বরং ঝাঁঝালো শোনাল। অব্রাহ্মণ ঘরে এসেছে, ব্রহ্মচারী শূদ্রমুখ দর্শন করেছে— তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে। এখন কি আর তপোবন আছে না চতুরাশ্রম আছে। এখন তো সব প্রতীক মাত্র। স্মৃতির পণ্ডিতরা এরকম মনু-সর্বস্বই হয়। আর বেরসিক, যারা যজমানি করে। কাব্যরসগ্রহণ করতে পারে না। দণ্ডী, বিলহন, কালিদাস পড়া থাকলে বুঝতে পারতেন যুগে যুগে আচার-বিচার পাল্টায়।

কামাখ্যা পুরোহিত তাঁর পবিত্র জল ছিটিয়ে দিলেন ঘরের মধ্যে আর বিলুর গায়ে। কামাখ্যা পুরোহিতের ছেলে, রেলে কাজ করে। প্রচুর পাস পেয়ে থাকেন। পাসগুলি ব্যবহার করে তিনি মন্ত্র এবং বাস্তবের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

জলশুদ্ধির মন্ত্রটা হল—

গঙ্গেচ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেস্মিন সন্নিধিং কুরু।

অর্থাৎ এই জলে যেন গঙ্গা গোদাবরী যমুনা সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু আর কাবেরীর জল মিশে যায়। রেল কোম্পানির সহৃদয় সহায়তায় এই মন্ত্রকে সত্য করেছেন কামাখ্যাচরণ। সিন্ধুর জলটাই জোগাড় করতে পারেননি তিনি, এছাড়া সব। কামাখ্যাচরণ বা তাঁর রেল চাকুরে পুত্র তীর্থক্ষেত্রে গেলেই তীর্থবারি সংগ্রহ করেছেন। তারপর জলগুলো মিশিয়ে একটা তাম্রকলসে ভরে রেখেছেন। যখন যজমানিতে যান ছোট শিশি করে ঐ পুণ্যবারি নিয়ে যান। তাম্রকলসে কাদা লেপা মাটির সরার ঢাকনা থাকলেও বাষ্পীভবন ঠেকানো যায় না। তাম্রকলসের জল ক্রমশ কমে আসে। তখন কামাখ্যাচরণ তাঁর মতিলাল কলোনিস্থিত বাসভবনের পিছনের পানাপুকুরের জল ঐ পবিত্র কলসে মিশিয়ে নেন। তাতে জল-মাহাত্ম্য হ্রাস পায় না। পুকুরের জল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশলেও পবিত্র নদীর জলগুলি রয়েই যায়। কোনো দিনই শেষ হবে না। হোমিওপ্যাথি ওষুধও এরকম।

বিলুর সামনে তাম্রকুণ্ড আর ছিপকোষা। মোটা পৈতের সঙ্গে চামড়ার ঘসায় কেমন যেন সুড়সুড়ি লাগছে। উত্তরীয় শুষে নিচ্ছে ঘাম। কামাখ্যা পুরোহিত বললেন—নাও, তাম্রকুণ্ডের জল নাও। তারপর ঐ জল মাথায় ছিটাও। এই গরমে জল ছেটাতে ভালই লাগছে। কামাখ্যা পুরোহিত মন্ত্র পড়ান—ওঁ শন্ন অপো ধন্বন্যা, শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ। শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ। অনঙ্গমোহন বলেন—এর অর্থ জানো বিলু? হে মরুভূমির জল আমাদের মঙ্গল কর। হে জলময় দেশোৎপন্ন জল আমাদের মঙ্গলদায়ক হও। হে সমুদ্রোৎপন্ন জল, আমাদের মঙ্গল বিধান কর। কূপোৎপন্ন জল আমাদের মঙ্গল করো।...হে জলসমূহ, তোমরা সুখদায়ক, তোমরাই আমাকে অন্নভোগের অধিকারী কইরা দিছ এবং রমণীয় ব্রহ্মের সঙ্গে সংযোজিত কইরা দিছ। হে জল। হে প্রিয় জল। পুত্রস্নেহাতুরা জননী যেমন...ওঁ যো বঃ শিবতমো রস স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। পুত্রস্নেহাতুরা জননীরা যেমন তার নিজের স্তন্য রসসুধা পান করায় তার পুত্রকে, তুমিও তেমনই জল...অনঙ্গমোহনের গলাটা ক্রমশ ভারী আর উদাত্ত হয়ে আসছিল। গলাটা কাঁপছিল।

অসীম ঝোলা থেকে বার করলো বাক্সদুটো। বিলু অসীমের দিকে কটমট করে তাকাল। অসীম আবার বাক্সদুটো ভরে দিল সেই ঝোলায়। কী আছে কী—বাক্সে?

বিলুর মামা জেসপ কোম্পানির ফিটার। পৈতের কদিন আগে জিজ্ঞাসা করেছিল পৈতেয় কী নিবি বিলু? বিলু বলেছিল যা চাইব তাই দেবে মামা? বিলুর মামা বলেছিল—তা কি সম্ভব? তুই যদি আংটি চাস, ঘড়ি চাস আমি কী করে দেব, অন্য কিছু, যা আমি দিতে পারব আর তোরও কাজে লাগবে। ভীষণ সমস্যায় পড়ল বিলু। কী চাইবে বিলু? আশ্চর্য রুমাল? আপনার পছন্দমতো কাহারও সামনে বশীকরণ-সুগন্ধী মিশ্রিত আশ্চর্য রুমালটি নাড়িয়া দিলে সে স্ত্রী বা পুরুষ যেই হউক না কেন, আপনার বশীভূত হইবে। নাকি ম্যাজিক লণ্ঠন। পর্দায় আপনার প্রিয় চিত্রতারকার ছবি দেখুন। মোহন সিরিজ নেবে, মোহন সিরিজ? পরিত্রাতা মোহন, সমুদ্রবক্ষে মোহন, অজানা দ্বীপে মোহন, মোহন ও বিষকন্যা...নাকি তিরিশ দিনে স্বাস্থ্যবান হন। মহামৃতসালসা। পুরা কোর্স ২৮ টাকা। শিবরাম চক্রবর্তীর বই। ক্রিকেট ব্যাট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেবে, ক্রিকেট ব্যাট? উইলো কাঠের?...বিলু কিছু বলতে পারছিল না। মামা বলেছিল ঠিক আছে, তোকে একটা টেরিলিনের জামা দেব, দেখবি কি হাল্কা। দশ মিনিটে জল শুকিয়ে যায়...মামা কখন আসবে কি জানি। আজকেও ওভারটাইম?

হে জল, সকল তোমরা সকল পদার্থকে তৃপ্ত কর, সম্পূর্ণ কর। সেই সুধারসে আমরাও যেন তৃপ্তি লাভ করি।

বিলুদের একটাই কলঘর। সব ভাড়াটের একটাই কলঘর। শিখা যখন স্নান করে কলঘর থেকে বের হয়, ওর গায়ের থেকে সুগন্ধ বের হয়। শিখা রোজ সাবান মেখে স্নান করে।

মহাপ্রলয়ের সময় কেবল সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্মই আছিলেন। তারপর জলময় সমুদ্র উৎপন্ন হইল। তারপর সেই সমুদ্র থিক্যা উৎপন্ন হইল সূর্য, চন্দ্র...সমুদ্রে কি ঢেউ, কি সুন্দর ঢেউ। মা, বাবা আর বিলু সিনেমায় গিয়েছিল। সমুদ্রের ঢেউ দেখছিল বিলু। বাবা বলেছিল, ওগুলো মিছিমিছি। ওগুলো ছবি। মা সিনেমায় টিফিন বেলায় ঝালনুন ছিটানো বাদাম, লাল লাল বাদাম মুখে বলেছিল, একদিন আমরাও পুরী যামু...অ্যাঁ!

যিনি সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী তেজের প্রাণস্বরূপ, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী শক্তির অভিন্ন আধারস্বরূপ, যিনি...

কী আছে ঐ বাক্সয়? যে বাক্সদুটো যশকাকু দিয়ে গেল? যে বাক্সটা লম্বা, তাতে নিশ্চয়ই পেন আছে। আর ও চৌকোটায়? জ্যামিতি বাক্স? জ্যামিতি বাক্স তো ওর আছে। ওর দিদিরটাই। পেন্সিল কম্পাসটা হারিয়ে ফেলেছিল স্বপ্না, বাবা তারপর নিয়ে এসেছে একটা কোত্থেকে যেন। তাছাড়া জ্যামিতি বাক্স হলে আরও বড় হত। তবে কি খেলনা? ধুস! এখন খেলনা কী করবে বিলু। টিফিন বাক্স? কী হবে ওটা দিয়ে? বিলু কখনও টিফিন নেয় না। অনেকে নেয় বটে, পাউরুটি জেলি, মাখন রুটি, মদন শীলের বাড়ি থেকে ওদের চাকর আসে, টিফিন বেলায় ইস্কুলের সামনে রকটায় দাঁড়ায়। মদন শীল সন্দেশ খায়, আপেল খায়, তারপর দুধ খেয়ে হাতের চেটোয় ঠোঁট মুছতে মুছতে ইস্কুলে ঢোকে। মদন কি জানে, একটা পেয়ারায় তিনটে আপেলের সমান উপকার, বিধান রায় বলে গেছেন? বিলুর বাবা তো তাই পেয়ারা খাবার জন্য পাঁচনয়া দিত। এখনও মাঝে মাঝে দাদুর থেকে পাঁচনয়া-দশনয়া নিয়ে যায় বিলু। পাঁচ পয়সার কুড়মুড়ে বিস্কুটের উপর গৌর পাত্র মাখিয়ে দেয় গৌরের স্পেশাল ঘুগনি। তারপর পাউডারের কৌটো ঝাঁকিয়ে মিহি মশলার আস্তরণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই ভাল। কী দরকার টিফিন নিয়ে? তাছাড়া দিচ্ছেই-বা কে? মা তো চলে যায় অফিসে।

এটা টিফিন কৌটোই যদি হবে, এত সুন্দর প্যাকিং কেন? তাছাড়া টিফিন কৌটো হলে তো আরও হাল্কা হত। তবে কী আছে ঐ চৌকো বাক্সে? তবে কি খেলনাটা? ঐ যে, একটা লাট্টু মতো, বাঁই বাঁই ঘোরে, তার তলায় আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিতে হয় চাঁদ, তারা, সাপ, মাছ। তখন চাঁদ নাচে, তারা নাচে, সাপ নাচে, মাছ নাচে। তারার পাঁচটা কোনা, আঁকাবাঁকা সাপ, ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ, সুঠাম মাছ, প্রত্যেকেই নাচে যে যার মতো। ঐ লাট্টুটার তলায় বোধহয় চুম্বক আছে আর ঐ মাছ-তারা-চাঁদ-সাপ সব টিনের। জেলেপাড়ার মোড়ে একটা ট্যারা লোক এইসব বিক্রি করে। বেলুন, বাঁশি, সিনেমার বাক্স, সেই টিনের তৈরি সিনেমার মধ্যে ফিলিম দিলে দেখা যায় সায়রাবানু, আশা পারেখ, দেব আনন্দ, রাজকাপুর, কল্পনা...। ফট করে টিপে দিলেই মুরগি ডিম পাড়ে। আর ঐ ড্যানসিং স্টার। চাঁদ-তারা নাচে। ওরা আকাশের। সাপ, মাছ নাচে, ওরা জল মাটির। একই চাকার তলে আকাশ ও পৃথিবী নাচে। ঐ খেলনাটা বড় পছন্দ বিলুর। দশ আনা দাম। দশ আনা মানে হল বাষট্টি পয়সা। কোথায় পাবে বাষট্টি পয়সা বিলু? বিলু একদিন ওর বাবার দাড়ি কামানোর বাক্সে ষাট পয়সা পেয়েছিল। দাড়ি কামানোর বাক্সে কেন পয়সা ছিল বিলু বোঝেনি, ও খুঁজছিল একটা ব্লেড। পয়সাগুলো পেয়ে ও ভাবছিল, পয়সাগুলো নিয়ে নেবে কি না, নাকি মাকে দিয়ে দেবে। বিলুর ঐ আকাশভরা সূর্যতারা খেলনাটার উপর বড় লোভ ছিল। ও ভাবল, ওর ইচ্ছের কথা জেনে ওর বাবাই এই পয়সা কটা পাইয়ে দিয়েছে। বিলু পয়সা কটা হাতের মধ্যে নিয়ে হাতজোড় করে বলেছিল—হে বাবা, বাবা গো, তুমি যদি বেঁচে থাকতে তাহলে চাঁদ-তারা খেলনাটা চাইলে তুমি ঠিকই কিনে দিতে। এখন এটা আমি নিচ্ছি...

কিন্তু বিলু ঐ খেলনাটা শেষ পর্যন্ত কেনেনি। একটা রজনীগন্ধার মালা আর ধূপকাঠি এনেছিল।

সেই বাক্সটা যদি থাকে তো বেশ হয়। ভাল হয়। তবে এই বাক্সটা যেন আরও একটু বড় আর ভারী। কী আছে ঐ বাক্সটায়?

সুমিতা এল। বিলু তখন আহ্নিকরত। সুমিতা বলল, আরে বিপ্লব, এ যে দেখি বৈপ্লবিক কাণ্ড। ঘরটা একেবারে তপোবন হয়ে গেছে। যজ্ঞবেদী, ঋষিবালক, সমবেত ঋষিসমূহ এবং হরিণ শিশু। হরিণ শিশু বলেই ঘরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোণায় বসে থাকা বেড়ালটার দিকে তাকাল সুমিতা। তখনই বেজে উঠল পৃথিবী আমারে চায়...রেখো না বেঁধে আমায়, কারণ প্যাকেটের মোড়কটা ততক্ষণে খুলে ফেলেছে বিলু। বিলু চিৎকার করে উঠল—রেডিও, ছোট রেডিও। যশকাকু দিয়েছে। বোবাঠাকুর যন্ত্রটার দিকে স্থির চেয়ে রইলেন। উচ্ছ্বাসসূচক গোঁ গোঁ শব্দ বার করতে থাকলেন মুখ দিয়ে। কামাখ্যা পুরোহিত বললেন—মা, গৃহে যেটি আছে, আমার পুত্র আনছে আর কি, সেটি আকৃতিতে আরও বৃহৎ। বিদ্যুৎ লাগে। ইয়ার দেখি তারটার কিছুই নাই। কী আশ্চর্য কও দেখি।

তারানাথ বললেন—আশ্চর্যের কী। আমাদের দ্যাশে প্রাচীনকালে এই সবই আছিল। ঐ যে দৈববাণী হইত, ঐগুলি রেডিও বার্তাই আসলে। এখন ঐ দৈববাণীরেই নাম দিছে আকাশবাণী।...

ইয়ে রেডিও সিলোন কী পঞ্চরংগী কারিক্রম হ্যায়। ডম ডম ডিগা ডিগা/মৌসম ভিগা ভিগা...কাঁটা ঘোরাচ্ছে বিলু...

সবই ছিল, সবই ছিল, বেতার ছিল, বাইস্কোপ ছিল, এরোপ্লেন ছিল।

হ হ—বিমান তো ছিলই। অনঙ্গমোহন হঠাৎ যেন উৎফুল্ল হলেন। প্রাপ্তা মুহূর্তেন বিমান বেগাৎ কুলং ফলাবর্জিত পুগমালম। কোনখান হইতে কইলাম? সুমিতার দিকে তাকিয়ে সহাস্যে প্রশ্ন করেন আনন্দমোহন। ক্ষণেক চিন্তা করে সুমিতা চিৎকার করে বলে, রঘু বংশম, রঘু বংশম। এতে বয়ং সৈকত ভিন্ন...। অনঙ্গমোহন পুলকিত হয়ে ওঠেন। সবার দিকে একবার করে তাকিয়ে নেন ছাত্রীগর্বে গর্বিত অনঙ্গমোহন। অসীমের দিকে তাকিয়ে বলেন, ইয়ার অর্থনি বুঝ অসীম্যা? সমুদ্রের কূল ঝিনুকের মুক্তাসমূহ দ্বারা শোভিত, সুপারি গাছগুলি ফলভারে আনত, আমরা বিমানের দ্রুতগতিতে মুহূর্ত মধ্যে পৌঁছিলাম।

অনঙ্গমোহন বললেন, আরও আছে। রামচন্দ্র সীতারে কইতাছেন, ওগো করভোরুমৃগপ্রেক্ষিণী, করভোরু অর্থনি বুঝলা, যে নারীর উরু হাতির শুঁড়ের মতো। ক্রমশ নীচের দিকে সরু হইতাছে। তুমি দ্যাখ...এযা বিদূরীভবতঃ সমুদ্রাৎ সকাননা নিম্পততীব ভূমিঃ। সুমিতা বলতে শুরু করে—সমুদ্র ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, সকাননা ভূমি থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে সমুদ্র। কখনও দেবতাদের সঙ্গে, কখনও মেঘেদের সঙ্গে, কখনও পাখিদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে বিমানটি। আমার মনের মতো।

বাঃ সুন্দর স্মৃতিশক্তি তোমার। অনঙ্গমোহন উঠে দাঁড়িয়ে সুমিতার পিঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত রাখেন। পিঠের দিকটা অনেকটা গোল করে কাটা ব্লাউজ।

কী ব্যাপার? গান হচ্ছে, ঘরের রেডিওর গান। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল উল্লসিত অঞ্জলি। সুমিতা পিঠের হাতটার থেকে সরে দাঁড়াল। বিলু বলল, মা, যশকাকুরা দিয়েছে দ্যাখো...।

যশকাকুরা পান চিবুতে চিবুতে ঘরে এল। বলল—ওঃ ডারুণ। ডারুণ রান্না হয়েছে। যেমন টরকারি, টেমন মাছ। বাঙালরা, মানে পূর্ব বাংলার লোকেরা যা রান্না করে, জবাব নেই...

অঞ্জলি বলল, আবার রেডিও কিনতে গেলেন কেন—ছি ছি।

যশবাবু বললেন, এটাকে বলে ট্রানজিস্টার।

তা কেন কিনতে গেলেন এত দাম দিয়ে? লজ্জায় ফেললেন।

ভাইপোকে দিলুম। রিলে শুনবে। লজ্জা কী?

কামাখ্যা পুরোহিত মহাভৃঙ্গরাজ তেলের শিশিটা আবার বার করেছেন। বিলু ট্রানজিস্টারটির নব ঘোরাতে থাকে।...আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হল—

পাকিস্তান আবার কচ্ছ সীমান্তে সেনা সমাবেশ করেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচাবন তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় বোমাবর্ষণ করেছে। এডোয়ার্ড হোয়াইট ও জেমসম্যাকডিভিট নামে দুই মার্কিন মহাকাশচারী মহাকাশযান জেমিনি থেকে বের হয়ে মহাশূন্যে কিছুক্ষণ সাঁতার কেটেছেন। দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত মানা উদ্বাস্তু শিবিরে বিক্ষোভকারী উদ্বাস্তুদের উপর গুলি চালনার ফলে দুজন নিহত হয়েছে।

চার

শ্মশানে জ্বলন্ত পাটকাঠি হাতে কামাখ্যা পুরোহিত বলছিলেন, আস বিলু, অগ্নি ধর। মুখাগ্নি করতে হবে। বৌমা, শোক সংবরণ কর। শব প্রদক্ষিণ কর। অঞ্জলি তার দু'বাহু দিয়ে বিপ্লব ও স্বপ্নাকে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছিল। ডুকরে কাঁদছিল। কেবলই বলছিল, তোদের কী হবে...

১৯৪৭ সালের আগে যারা জন্মেছে তাদের মধ্যে স্বপন নামের কোনো ব্যক্তি দেখা যায় না। স্বাধীনতার পর যে প্রজন্ম, তাদের বাপ-মা'রা তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগামী প্রজন্মকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। এই কারণেই কি জগদীশ তার সন্তানদের নাম রেখেছিল স্বপ্না, বিপ্লব! জগদীশের ভাসা ভাসা চোখে কি প্রত্যাশা ছিল? কী স্বপ্ন? কী বিপ্লব?

জগদীশের চোখ তুলসীপাতায় ঢাকা। সাজানো চিতায় শুয়ে আছে জগদীশ। অনঙ্গমোহন স্থির। রবিবাবুর যেখানে দাহকার্য হয়েছিল সেখানে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা। হে ভৈরব শক্তি দাও, ভক্ত পানে চাহ—রবিবাবুর গান মনে পড়ল অনঙ্গমোহনের। অনঙ্গমোহন কামাখ্যা পুরোহিতের ঐ আহ্বান আবার শুনলেন—আস, আসরে ভাই বিলু। অগ্নিশলাকা হাতে লও। অনঙ্গমোহন চোখ বুজে থাকেন। মনে মনে শংকরাচার্যের মোহমুদগর থেকে কিছু শ্লোক মনে করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিছু মনে পড়ে না, বরং বাবা, আমি বাঁচুম, আমারে বাঁচান...জগদীশের ঐ ক্রন্দন কাতর আর্তি জপমালার মতো ফেরে। মৃত্যুর আগের দিনও বাঁচার তীব্র অভীপ্সা জানিয়েছিলেন জগদীশ। অনঙ্গমোহন পারেননি। পারেননি ছেলেকে বাঁচাতে। নিজের স্ত্রীকেও পারেননি। জগদীশ তবু ক'টা দিন সুযোগ দিয়েছিল। সুরবালা সেই সুযোগটুকুও দেননি। জীবন এরকমই। নলিনীদলমধ্যস্থিত জলের মতোই অনিত্য।

নলিনী দলগত জলমতি তরলং তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং—এই তো মনে পড়ছে মোহমুদগরের শ্লোক। না ভোলেননি তো, ভুলতে কি পারেন? তো মনে এল কা তব কান্তা কস্তে পুত্র...

দাদু আঠারো টাকা বাকি আছে কাঠের দাম, দিয়ে দিন। শ্মশানের লোকটা বলল। অনঙ্গমোহন পোড়ামাংস গন্ধমাখা বাতাসে ওঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস মিশিয়ে দিয়ে থলের মধ্যে হাত ঢোকালেন। হে চণ্ডাল, আমার প্রিয়পুত্রের প্রেতকার্যাদি সুসম্পন্ন করিয়া দেও। আমি যথাসর্বস্ব দিব। রাজা হরিশচন্দ্র নাটকের অনুবাদ করেছিলেন অনঙ্গমোহন তাঁর যৌবনে। পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠীর ছাত্ররা অভিনয় করেছিল দেওয়ানজী বাড়ির আঙিনায়। অনঙ্গমোহন তাঁর ছিটকাপড়ের থলের মধ্যে হাত ঢোকালেন। মধুর শিশি, ঘৃতের কৌটা, খবরের কাগজে মোড়া তিল, যব, চন্দনকাঠ ইত্যাদির ভিতর থেকে একটা রুমাল বের করলেন, রুমালের মধ্যে লাল সুতোয় লেখা পতি পরম গুরু। সুরবালা সুতোয় সুতোয় লিখেছিল। যত্নে রাখা রুমালে ছিল আরও কিছু টাকা।

বল, মন্ত্র বল...দহেয়ং সর্বগাত্রানি দিব্যানলোকান স গচ্ছতু। এইবার শবমুখে অগ্নিপ্রদান কর। মুখে আগুন দাও, মুখে আগুন দাও বিলু—অঞ্জলির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন ধুলায় আঁচল হাওয়ায় দুহাত। হুতাশন লেগেছে শরীরে। অঞ্জলি আছাড়ি বিছাড়ি খায়। এরকম করবেন না বৌদি। উঠে দাঁড়ান। শক্ত হতে হবে।

অঞ্জলির কাঁধে হাত। পরপুরুষের। কার হাত চেনে না অঞ্জলি।

আমরা জগদীশদার অফিসেরই লোক। এত ভেঙে পড়ছেন কেন, আমরা তো আছি। আমার নাম শ্রী পরিতোষ যশ।

অঞ্জলি দুহাতে মুখ ঢাকে। সংসারটা ভাসাইয়া দিয়া গেল। বাচ্চা দুইটা নিয়ে কোথায় দাঁড়ামু।

তা আমরা কি ভাবছি না? পরিতোষ যশ বলল।

তারপর চিতার ছাইয়ে কানাকড়ি ছিটিয়ে জল ঢেলে স্নান সেরে ঘরে ফিরল বিলুরা। সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল শিখার মা। হাতে বঁটি, দা, কেরোসিন কুপি। লোহা ছুঁয়ে, আগুন ছুঁয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। শিখার মা জড়িয়ে ধরল হঠাৎ বিলুর মাকে। ওরা জড়াজড়ি করে অনেকক্ষণ কাঁদল। পরিতোষ যশ বিলুর কানের কাছে মুখ দিয়ে বলল—পরশু আসব।

বিলু ঐ লোকটার মুখের দিকে চাইল মাথা উঁচু করে। চাষীরা যেমন করে মেঘ দেখে। মেঘে বৃষ্টি হবে কি না দেখে। তখন দৈববাণীর মতো ভেসে এল—চিন্তা করো না—চিন্তা করো না, আমি আছি। বিলুর মাথার চুলে বিলি কেটে দেয় ঐ লোকটা।

—কোন ক্লাসে পড়?

—সিক্‌স।

—ইশ্‌শ।

পরিতোষ যশ এসেছিলেন কিছু ফলফলাদি নিয়ে। অনঙ্গমোহনকে প্রণাম করতে গেলে অনঙ্গমোহন পিছিয়ে গেলেন, প্রণাম গ্রহণ করলেন না। অশৌচ অবস্থায় প্রণাম গ্রহণ নিষেধ। বিলু একটা ধুতি পরে, আলুথালু বসে ছিল। হাতের চেটো শুকনো সর্দির কারণে চটচটে। গলায় বাথরুমের খারাপ হয়ে যাওয়া তালাটার চাবি ঝোলানো রয়েছে। কাঁধের কাছটা ভীষণ জ্বালা করছিল বিলুর। কারণ গতকাল রাত্রে নিজের গলাটা খামচে ধরেছিল। নিজেই।

পরিতোষ যশও মৃদু হাসলেন বিলুর দিকে তাকিয়ে।

স্বপ্নার কী বুদ্ধি। ও তাড়াতাড়ি শিখাদের ঘর থেকে চেয়ারটা নিয়ে এল। যশবাবু চেয়ারে বসলেন না। চেয়ারের হাতলটা ধরলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দ। তারপর বললেন, এরকম কী করে হল।

AMARBOI.COM

বিলুর গলার কাছে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত আটকে রইল। খড়খড়ে মেঝেতে কাটল নখের আঁচড়। ভীষণ খাটতে পারতেন জগদীশদা। চেহারা তো ভালই ছিল। এরকমটা হবে আমরা ভাবতেই পারিনি। আমি, আমিই। রাস্তায় পড়ে যাওয়া সন্দেশ আমিই দিয়েছি বাবাকে। বিলু কখনোই কাউকেই বলতে পারবে না একথা। ও খড়খড়ে মেঝেতে নখের আঁচড় কাটে। অনঙ্গমোহন তাঁর হাতটা ক্রেনের মতো কপালের দিকে নিয়ে যান। কপালের উপরে গিয়ে হাতটা স্থির থাকে। মুখে শুধু বলেন—বিধিলিপি। পরিতোষবাবু পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করলেন।

পঁচাশি আছে। ছোট কোম্পানি আমাদের। আমরা চাঁদা তুলে এটুকু জোগাড় করলুম। মালিককে বলেছি, কিছু আদায় করব। আপনাদের ক'দিনে কাজ?

দশ দিনে।

এর আগেই কিছু দিয়ে যাব।

অনঙ্গমোহন বললেন—তারপর?

পরিতোষবাবু কিছু না বুঝে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

—তারপর কী হইবে আমাদের?

পরিতোষ যশ মাথা নিচু করে।

আমি চাকরি করব, আমার হয় না চাকরি? বিলু হঠাৎ বলে ফেলল।

বিপ্লব না তোমার ভাল নাম?

হুঁ।

তুমি তো পড়াশোনায় খুব ভাল। জগদীশদা তোমার কথা খুব বলতেন। তুমি পড়।

কী করে পড়ব?

হঠাৎ গলার স্বর চড়ালেন অনঙ্গমোহন। এই কথা ক্যান?

ইস্কুলের মাইনে?

আমি কি মইর‍্যা গেছি নাকি? আর ইস্কুল ছাড়া পড়া যায় না নাকি। আমার চতুষ্পাঠী নাই? আমার চতুষ্পাঠীতে তিরিশজন ছাত্র পড়ত, এক কালে।

চতুষ্পাঠী? মানে—ইয়ে? টোল?—পরিতোষ যশ যেন অবাক হয়।

বিরামের দোকানের স্বপন আর ভজা দু'জনেই বিলুরই বয়সী। ওরাও তো চাকরি করছে। বিলু মনে মনে ভাবে। ওর বাবার কোম্পানির সঙ্গে কত বড় বড় সন্দেশ রসগোল্লার দোকানের যোগাযোগ। এই কোম্পানি টিনের কৌটো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৈরি করে। বড় বড় রসগোল্লার দোকানগুলো ঐ টিনে রসগোল্লা ভরে বাইরে চালান দেয়।

আপনি চাকরি করবেন—বৌদি? পরিতোষ যশ অঞ্জলিকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে।

আচমকা এই প্রশ্নে কেমন হতভম্ব হয়ে যায় অঞ্জলি। অনঙ্গমোহনও দেশভাগে গান্ধীর নীরব সম্মতি। অর্থাৎ পার্টিশন ফাইনাল। 'আপনে কোনদিকে থাকবেন পণ্ডিতমশায়?' দত্তপাড়া স্কুলের হেডমাস্টারের আচমকা প্রশ্নে এইরকমই নীরব হয়ে গিয়েছিলেন অনঙ্গমোহন। অঞ্জলি কোনো উত্তর দিল না।

অনঙ্গমোহন বললেন, বৌমা করবে চাকরি?

মালিককে চাপ দিয়ে দেখতে পারি।

তখনই হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল অঞ্জলি।

বিলু মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই মা চাকরি করবে? এই মা ড্রেস দিয়ে শাড়ি পরবে? জুতোর শব্দ হবে খটখট, কাঁধে ঝুলবে ব্যাগ?

অনঙ্গমোহন তাকিয়ে থাকেন বৌমার দিকে। সারদাচরণ ন্যায়ালংকারের পৌত্রী। বোয়ালিয়ার ন্যায়ালংকার বাড়ির কন্যা—এইটুকুই জেনেছিলেন অনঙ্গমোহন। আর কিছু নয়। জগদীশের বিবাহের জন্য সম্বন্ধ দেখা হচ্ছিল, অনঙ্গমোহনেরা তখন শেঠবাগানের কলোনিতে। বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত মানুষরা তখনও তাদের পরিচয়ের সঙ্গে বয়ে বেড়াত গ্রাম-নাম। যেমন চৌমুহনীর রসময় ঠাকুর, দত্তপাড়ার বরদা কাব্যতীর্থ, সেনাচাকার বৈকুণ্ঠ স্মৃতিতীর্থ কিংবা মাইজদিয়ার অনন্ত চক্রবর্তী। তাঁরা কেউ আছেন ধুবুলিয়া ক্যাম্পে, কেউ লেকের ধারে ঝুপড়ি বানিয়ে, কেউ দমদম বা যাদবপুরের কলোনিতে। শেঠবাগানের কলোনিতে শ্রীরামপুরের অনঙ্গমোহন শুনলেন, বোয়ালিয়ার ন্যায়ালংকারের গৌরবর্ণ পৌত্রী আছে—ধুবুলিয়া ক্যাম্পে। ব্যস, এটুকুই। আশীর্বাদের দিন দেখেছিলেন পাত্রী যথার্থই গৌরবর্ণা। লাবণ্যময়ী, মুখের বামভাগে একটি ক্ষুদ্র জড়ুল। শুভলক্ষণ। জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ল্যাখাপড়া করতে পারছনি কিছু মা? মেয়েটি বলেছিল, সিক্‌ছে উঠছিলাম।

কোন ইস্কুলে পড়তা?

ক্যান? বঙ্গবালা!

ঠিকই তো। বোয়ালিয়ার বিখ্যাত নারী শিক্ষা নিকেতন। প্রতিবারই আট-দশ জন করে বালিকা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিত। অনঙ্গমোহন শিক্ষিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুত্রবধূ পেয়ে খুশিই হয়েছিলেন।

অঞ্জলি মাটির দিকে তাকিয়ে বলল—আমি কি পারব চাকরি করতে? লেখাপড়া যে জানি না...

—আমাদের টিনের ফ্যাক্টরি। তেমন লেখাপড়ার কী দরকার?

—তবে কি কাজ করবে বৌমা? নারী শ্রমিক?

—এভাবে নেবেন না। বাঁচতে তো হবে। লড়াই তো করতেই হবে। আপনি বৃদ্ধ, ওরা শিশু। তবে?

খুব ভাল লাগল ছেলেটিকে। ওর কথার মধ্যে কেমন সহানুভূতি। জিজ্ঞাসা করলেন আপনের নাম কী?

পরিতোষ। পরিতোষ যশ।

দ্যাশ?

বর্ধমান জেলা।

অনঙ্গমোহনদের আদি পুরুষ বর্ধমান থেকেই গিয়েছিলেন সন্দীপরাজের আমন্ত্রণে। অনঙ্গমোহনরা রাঢ়ী। কুলপঞ্জি থেকে জানা যায় মন্তেশ্বরের কাছে ছিল তাঁদের দেশ। অনঙ্গমোহন জিজ্ঞাসা করে, মন্তেশ্বরের নিকটেই কি আপনার গ্রাম?

না না, বেশ দূরে। আমার গ্রাম গলসীর কাছে।

জমি আছে?

আছে।

ধানের গোলা?

আছে।

গাই-বলদ?

আছে।

পিতামাতা?

আছে।

পরিবার?

দেশে।

অনঙ্গমোহন কেমন যেন কৃতজ্ঞতাপরবশ হন। নিজেরা হল উড়ে এসে জুড়ে বসা মানুষ। এ দেশীয়দের খালি জমি, বাগান, বাগানবাড়ি জবরদখল করছে। পুকুরটুকুর ছারখার করেছে। রাস্তাঘাট নোংরা করেছে। অথচ কত এ দেশীয় মানুষ কতভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অনঙ্গমোহনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিতোষের দিকে মনে মনে হাত বাড়ান। যেন লাউ গাছ, আঁকশি বাড়াচ্ছে।

পরিতোষই কথা বলে। জগদীশদা তো টাইপিস্ট ছিল। তা পনের বছরের চাকরি। মালিককে চেপে ধরে একটা কিছু করতেই হবে।

অঞ্জলি, মেঝের দিকে চোখ রেখে বলল—অফিসে উনার টাকাপয়সা কিছু নাই? পরিতোষ বলল—তা তো আছে। কিন্তু বোঝেনই তো, মাড়োয়ারি ফার্ম। ক'পয়সা মাইনে দেয়। প্রভিডেন্ড ফান্ডের নিয়মকানুন কিছুই তো মানত না মালিক। অল্প ক'বছর হল ওসব চালু হয়েছে। তবে কত পাওনাগণ্ডা আছে এখনো হিসাব হয়নি বৌদি। দাদার কাজ মিটে যাক, আপনি একদিন অফিসে আসুন।

অঞ্জলি বাইরের জানালার দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকে। বটগাছে ফল হয়েছে। লাল লাল ফল।

বটের ফল বটের ফল,
গহিন গাঙে কত জল।
পতি কোলে বেউলা যায়
পদ্মবনে হায় হায়।

অনঙ্গমোহন মনঃস্থির করতে পারেন না। সংসারের আয় বলতে চতুষ্পাঠীর সরকারি বৃত্তি। চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের কাছ থেকে দক্ষিণা নেওয়া যায় না। চতুষ্পাঠীর শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। সরকারি বৃত্তি যা পেয়ে থাকেন তাতে নিজেরও ব্যয় নির্বাহ হয় না। স্কুলের চাকরি হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই অনঙ্গমোহনের। মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরাজি জানাটা বড়ই আবশ্যিক। কিন্তু অনঙ্গমোহন ইংরাজি জানেন না। ইংরাজি শিক্ষা তিনি নেননি। পণ্ডিতের ঘরের সন্তান। তাঁর পিতার চতুষ্পাঠীতেই তাঁর শিক্ষা। অনঙ্গমোহনের পিতা মনে করতেন, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। মেকলে প্রবর্তিত ঐ ম্লেচ্ছ শিক্ষাব্যবস্থায় অনাবশ্যক পাশ্চাত্য অনুরাগ জন্মে। ইংরাজের হীন অনুকৃত কিছু কুষ্মাণ্ড তৈরি হয়। অনঙ্গমোহন যখন শিশু, প্রতিটি জেলায় ততদিনে ইংরাজি স্কুল তৈরি হয়ে গেছে। ঐ সমস্ত স্কুলে এফ এ পর্যন্ত সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য ছিল। কিন্তু ঐ সমস্ত স্কুলের ঘোর বিরোধী ছিলেন অনঙ্গমোহনের পিতা। ঐ সমস্ত স্কুল ছিল প্রতি জেলায় একটি বা দুটি। ব্যয়সাপেক্ষও ছিল। অন্যদিকে চতুষ্পাঠী ছিল গ্রামে গ্রামে। যেখানেই ২০-২৫টি ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস, সেখানেই ছিল চতুষ্পাঠী।

অনঙ্গমোহনের পিতা নীলকমল বিদ্যালংকারের চতুষ্পাঠীটি প্রকৃত অর্থেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুষ্পাঠী ছিল। কাব্য, ব্যাকরণ, বেদ এবং দর্শন, চারটি শাখাই পড়ানো হত। সরকারি 'তীর্থ' উপাধি ছাড়াও সারস্বত সমাজের অধীনে যে পরীক্ষাগুলি হত তাতেও ছাত্র পাঠাতেন নীলকমল। শলাকা পরীক্ষার মতো কঠিন পরীক্ষাতেও কৃতকার্য হত তাঁর ছাত্ররা। হাতে লেখা বিভিন্ন পুঁথির মধ্যে একটি শলাকা চালিয়ে দিতেন পরীক্ষক। শলাকার সূচীমুখে যে পৃষ্ঠাটি বিদ্ধ হত তার উপর ভিত্তি করেই হত পরীক্ষা।

সন্দীপের রাজা দান করেছিলেন তিন দ্রোণ নিষ্কর জমি। পিতৃপক্ষে অর্থাৎ মহালয়ার আগে জমিদাররা পণ্ডিতদের বাৎসরিক বৃত্তির জন্য আহ্বান করতেন। শুধু হিন্দু জমিদাররাই নয়, মুসলমান জমিদাররাও এই বৃত্তি দিতেন। তা থেকেই সম্বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহ হত। চাহিদাও ছিল খুব কম। মোটা বস্ত্র, সামান্য আহার। ডাল, ভাত আর একটা কিছু। ডাল বলতে খেসারির ডাল। আর তরকারি বলতে কলাগাছের থোড়। যার ডাকনাম ছিল আইল্যা।

'আইল্যা ভাজা কইল্যার ডাইল' কথাটা প্রবাদ প্রবচনের মতো ছিল। অর্থাৎ কলাইয়ের ডালের সঙ্গে আইল্যা অর্থাৎ কলার থোড়ের তরকারি।

অনঙ্গমোহনের পিতা নীলকমল বিদ্যালঙ্কার পূর্ববাংলার পণ্ডিতমহলে একটি বিশিষ্ট নাম ছিলেন। বিভিন্ন পঞ্জিকার অনুমোদক মণ্ডলীর মধ্যে তাঁর নাম থাকত। ঢাকার সারস্বত সমাজের সভ্য ছিলেন তিনি। পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলনের জনক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ছিলেন নীলকমলের স্নেহভাজন। আবদুল রশিদ সাহেব, যিনি আসলে ছিলেন আবদুল রসিদ তর্কবাগীশ, দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের আইনসভায় স্পিকার হয়েছিলেন, তিনিও নীলকমলের চতুষ্পাঠীতে পড়তে এসেছিলেন। বেদ পড়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু আবদুল রশিদ মুসলমান। মুসলমান বেদ পাঠ করতে পারে না। শূদ্রও পারে না। নীলকমল অনুমতি দেননি। তাই ন্যায় পড়েছিলেন তিনি। সাত মাইল দূর থেকে পড়তে আসতেন আবদুল রশিদ। কিছুদিন পরেই কিন্তু নীলকমল বুঝতে পেরেছিলেন, ন্যায়শাস্ত্রে আবদুল রশিদ অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হবে। নীলকমল তাই একটি চিঠি লিখে জীবনানন্দ তর্কালংকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

নীলকমল মুখে মুখে শ্লোক রচনা করতে পারতেন। পিতৃপক্ষে যখন বিভিন্ন জমিদার-বাড়ি দান গ্রহণ করতে যেতেন, তখন মুখে মুখে জমিদার সম্পর্কীয় শ্লোক রচনা করে দিতেন। চট্টগ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রী রজনীকান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

সাহিত্যাচার্য ছিলেন নীলকমলের শুভাকাঙ্ক্ষী বান্ধব। চট্টল সংস্কৃত কলেজ এবং ধর্মমণ্ডলী সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নীলকমল।

চট্টল সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের জন্য রজনীকান্ত সাহিত্যাচার্য অত্যন্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেছিলেন। তৎকালীন জেলাশাসক ম্যাকফার্সন সাহেবের পদোন্নতি হয় এবং কলকাতা চলে আসেন। এর পরিবর্তে জেলাশাসক হয়ে যিনি এসেছিলেন তিনি ঐ সংস্কৃত কলেজটিকে ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তখন নীলকমল বিদ্যালংকার কলিকাতাস্থ ম্যাকফার্সন সাহেবকে সংস্কৃত শ্লোকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তা আবার তিনি চট্টল সংস্কৃত কলেজকে উপহার দিয়েছিলেন। ম্যাকফার্সন সাহেবের চেষ্টায় সে যাত্রায় সংস্কৃত কলেজটি রক্ষা পায়।

সুমধুর সংস্কৃত শ্লোকে লেখা ঐ শ্লোকটি বহুদিন পর্যন্ত অধ্যক্ষের ঘরে রাখা ছিল।

অস্মিন সংস্কৃত পাঠ পদম সরসি
তৎ স্থাপিতা যে সুধী
হংসাঃ কাল বশেন পক্ষরহিতাঃ
দূরংগতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংপ্রতি
পূনর্ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্তান যদি পাসিপালক
তদা কীর্তি শ্চিরং স্থাসাতি।

এই সংস্কৃত বিদ্যায়তনটি যেন একটি সরোবর। তাতে আপনি যে অধ্যাপকদের নিযুক্ত করেছিলেন তারা যেন সব হংস। আপনি দূরে চলে যাওয়ায় তারা আজ নিরাশ্রয়। এখন সেই সরোবরের তীরে কয়েকজন ব্যাধ এসে বাসা বেঁধেছে। তারা সেই হংসগুলিকে ধ্বংস করতে উদ্যত। আপনি যদি তাদের রক্ষা করেন তাহলে আপনার কীর্তি অবিনশ্বর থাকবে।

নীলকমলের তুলনায় অনঙ্গমোহন কিছুই নন। তবু তো সংস্কৃতসেবী অধ্যাপক, তাঁর ঘরেও একটি চতুষ্পাঠী আছে। তাঁর ছাত্রাবাসে একটি ছাত্র আছে। অসীম। আচার্য-গৃহেই খায়, অবস্থান করে।

নিজের একমাত্র পুত্র জগদীশকে ইচ্ছামতো সংস্কৃত শিক্ষা দিতে পারেননি অনঙ্গমোহন। তাঁদের পার্শ্ববর্তী গ্রামেই ইংরাজি স্কুল প্রবর্তিত হল। দত্তপাড়া গ্রামের জমিদার বীরেশ্বর দত্ত জমি দিলেন। জমিতে খেলার মাঠ হল। চর্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মিত ফুটবল খেলতে লাগল ছেলেরা। জগদীশ বায়না তুলল—ওই ইস্কুলে ভর্তি হবে। ঐ ইস্কুলে কোঠাবাড়ি, ঐ ইস্কুলে ঢং ঢং শব্দ। ঐ ইস্কুলে টেবিলচেয়ার, ব্ল্যাকবোর্ড। আগে ইংরাজি ইস্কুলে পড়তে হলে আট মাইল হাঁটতে হত। এখন দুই মাইলের মধ্যে ইস্কুল হওয়াতে, ছেলেরা সব ঐ ইস্কুলে ভর্তি হল। কায়স্থবাড়ির ছেলেরা, বৈদ্যবাড়ির ছেলেরা তো আগেই দূরের ইস্কুলে পড়তে যেত। এবার ব্রাহ্মণ বাড়ির ছেলেরাও ভর্তি হল দত্তপাড়ার মিডল স্কুলে।

ইংরাজি ইস্কুলে না পড়লে ডেপুটি সাব-ডেপুটি হওয়া যায় না। এমনকি কেরানিও হওয়া সম্ভব না। অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি। হাইস্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতদেরও ইংরাজি জানা চাই। সংস্কৃত শিক্ষকরাও আর টোল চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত নয়, ইংরাজি স্কুল-কলেজের আই এ, বি এ নিদেনপক্ষে ম্যাট্রিক ও তৎসহ সংস্কৃত উপাধি। সুতরাং জগদীশও ইংরাজি ইস্কুলে ভর্তি হল এবং গোপনে ঐ স্কুলে সেই বছরই প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হল। ২৬ জানুয়ারি, ১৯৩০।

জগদীশ ম্যাট্রিক পাস করতে পারেনি যদিও কাব্যতীর্থ হয়েছিল। জগদীশের কাব্যতীর্থ উপাধি পাবার দিন দশেক পরে নীলকমলের প্রয়াণ ঘটে। তাঁর প্রয়াণের আগেই তিনটি কাজ সেরে রেখেছিলেন নীলকমল। ম্লেচ্ছসংস্পর্শ দোষের কারণে একটি প্রায়শ্চিত্য, দত্তপাড়া ইস্কুলের হেডমাস্টারমশাইকে তার নাতির একটি চাকরির জন্য অনুরোধ এবং উপাধি প্রাপ্তির কারণে শ্রীনারায়ণকে এক সহস্র ও আটটি তুলীপত্র প্রদান। নীলকমলের কয়েকটি মুসলমান ছাত্র শুধুমাত্র ছিল, এই কারণেই যে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন তা নয়। মূল কারণ, তাঁর একমাত্র পৌত্র জগদীশ ইংরাজি বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন করেছে, জাতি নির্বিশেষে এক পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করেছে, স্পর্শিত খাদ্যগ্রহণ করাও আশ্চর্য নয়। এই জগদীশের স্পর্শ করা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন নীলকমল। এই জগদীশের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজনও করতে হয়েছে। জগদীশ আর সদ্‌বিপ্র নেই। স্কুলের মাস্টারি তো বিদ্যাবিক্রয়। অতঃপর এই পতিত বিপ্র যদি বিদ্যা বিক্রয় করে তবে তার দোষের কিই-বা ইতরবিশেষ হবে?

—'যুধিষ্ঠির কহিলেন পিতামহ, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বকর্ম নিরত ও কেহ কেহ-বা কুকর্মপরায়ণ হইয়াছেন। আপনি তাহাদের বিষয় বিশেষভাবে কীর্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ, বিদ্বান, সুলক্ষণসম্পন্ন ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বত্র সমদর্শী বিপ্রগণ ব্রহ্মতুল্য। ঋক, যজুঃ ও সামবেদে দীক্ষিত স্বকার্য নিরত ব্রাহ্মণগণ দেবতুল্য আর স্বকার্যবিহীন ব্রাহ্মণগণ চণ্ডালতুল্য।' বিদ্যাদানের বিনিময়ে যে ব্রাহ্মণ টাকা পয়সা গ্রহণ করে সে ব্রাহ্মণ শূদ্রবৎ। স্কুল মাস্টারাঃ শূদ্রবৎ দ্বিজাঃ। আর জগদীশ, বিলাতি বাহুল্যের ক্রীড়নক, এই তার নিয়তি। জগদীশও বেতনভূক পণ্ডিত। অথচ এই স্কুলে পণ্ডিত পদ প্রাপ্তির জন্য সুপারিশপত্র লিখতে হয়েছে নীলকমলকে। এগুলি অন্যায়। তাই প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন মৃত্যুর আগে। যজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, যে ব্যক্তি পাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্য না করে, সে ব্যক্তি ইহলোকের নিকট ঘৃণিত ও পরলোকে ঘোর নরকে পতিত হয়।

নীলকমলের মৃত্যুমুহূর্তে গীতা পাঠ করেছিলেন স্বয়ং অনঙ্গমোহন। নীলকমল মৃত্যুর আগে তাঁর রচিত পাণ্ডুলিপিগুলি দেখতে চেয়েছিলেন একবার। বিদ্যাশতকম, বচঃ পুষ্পাঞ্জলী এবং কবি নবীনচন্দ্র সেনের পরলোক গমনোপলক্ষে রচিত চট্টলাবিলাপম্। পাণ্ডুলিপিগুলি একবার স্পর্শ করেছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল নীলকমলের। সে ইচ্ছা অপূর্ণই রয়ে গেল। নীলকমল সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেছিলেন। মৃত্যুর আগে কৃষ্ণনাম জপ করেছিলেন। কিন্তু মুমূর্ষু নীলকমলের ওষ্ঠকম্পনে অনঙ্গমোহনের মনে হচ্ছিল, তিনি বিড়বিড় করেছিলেন চতুষ্পাঠী, চতুষ্পাঠী...

জগদীশের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলপাঠ ছিল বলেই প্রকৃতপক্ষে অনঙ্গমোহনকে অনাহারে কালাতিপাত করতে হয়নি এই সত্য অস্বীকার করতে পারেন না অনঙ্গমোহন। জগদীশ দত্তপাড়া স্কুলে পণ্ডিতদের পদ পেয়েছিলেন নীলকমলের সুপারিশের ফলেই হয়তো। বেতন মাসে আঠার টাকা। দেশ ভাগের পর সরকারি চাকুরিয়াদের অপশন দেবার সুযোগ ছিল। দ্বিখণ্ডিত দেশের ভারত নামক অংশে তারা চাকরি পেয়েছিল। জগদীশের সে সুযোগ ছিল না। কারণ, সে সরকারি চাকুরিয়া ছিল না। নিরালম্ব নিরাশ্রয় অনঙ্গমোহন আশ্রয় পেয়েছিল কলকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষী অনন্তনাথ জ্যোতির্ভূষণের বাড়িতে। তাঁর বাড়িতে সর্বদা দারোয়ান থাকত। তাঁর একটি অতিথিশালাও ছিল। অনন্তনাথ ছিলেন নীলকমলের ছাত্র। পরে শ্রীহট্টে জ্যোতিষ অধ্যয়ন করেন। তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। 'বল বল বল সবে' গানটি শুনতে শুনতে তিনি এক দূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, অনঙ্গমোহনকে কথা প্রসঙ্গে একদিন জানিয়েছিলেন সে কথা। 'বল বল বল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবে' গানটির মধ্যে আছে—ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে...ইত্যাদি। তারপরই আছে তেত্রিশ কোটি মেরা নহি কভু হীন। তখনই অনন্তনাথের মনে হল, তেত্রিশ কোটির মধ্যে অন্তত তিন কোটি বোকা লোক আছে। সুতরাং ভাবনা কী? কলকাতা গেলেন তিনি। তখন যুদ্ধের সময়। 'জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করিবে।' 'চেম্বারলেন পদত্যাগ করিবেন।' 'ডানকার্কের পতন হইবে' এইরকম কয়েকটা ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন তিনি। তারপরই পি এম বাগচীর পঞ্জিকায় বর্ষফল, রাষ্ট্রফলের লেখক। মহামান্য পঞ্চমজর্জের স্বাস্থ্য কিরূপ যাইবে, গান্ধীজির সম্ভাব্য বিপদ ও প্রতিকার এই ধরনের প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন জ্যোতিষবার্তা পত্রিকায়। সেই অনন্তনাথের এক পরম ভক্ত ছিলেন নগেন মজুমদার। সেই নগেন মজুমদার একদিন এসে জানাল সুসংবাদ। জমি পাওয়া গেছে। শেঠবাগানে। কচুরিপানা ভরা ডোবার সাথে খুঁটি পুঁতে এলেন অনঙ্গমোহন। নগেন মজুমদার দাঁড়িয়ে রইল। বাস্তুহারা পরিষদের গোলচশমামতো একজনকে নগেন মজুমদার বলে দিল—এরা আমার লোক। মুলিবাঁশের বেড়া এবং খড়ের ছাউনি দিয়ে ঘর হল রাতারাতি। নগেনের কয়েকজন লোক গায়েগতরে খেটে দিল। নগেন বলত—কেন পাট্টিশনে ওরা রাজি হল পণ্ডিতমশাই জানেন? পশ্চাদ্দেশ শুড়শুড় করছিল ওদের কখন গদিতে বসবে। আরে মারামারি চলছিল তো কী হয়েছে। ক দিন চলত। পাট্টিশন হয়ে কি মারপিট বন্ধ হবে? চলবেই। দেখুন দিকি এখন কী অবস্থা। ডিম খাচ্ছে দারোগাবাবু, গভর্ভযন্ত্রণা হাঁসের। বাজে কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, কিছু মনে করবেন না পণ্ডিতমশাই। নগেনের দেশ ছিল হাওড়া জেলায়। প্রকৃত ঘটি। ও একটা বাঙাল পরিবারের জন্য যা করেছে তা অবিস্মরণীয়। এই পর্যন্তই শেষ নয়। কালিকলের বনমালীবাবুর বাড়িতে এই নগেনই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। শেঠবাগানের কলোনিতে দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগেই থাকত। আসলে ঐ জমি ছিল শোভাবাজারের শীলদের। উচ্ছেদের জন্য নানা প্রক্রিয়া ক্রমাগতই চলছিল। একবার কয়েকটি ঘরে আগুনও লাগানো হয়েছিল। জগদীশের তখন সদ্য বিবাহ হয়েছে। নগেন বলেছিল—আমনারা হলেন পণ্ডিত ফ্যামিলি। এসব জায়গায় আমনারা পারবেন না। অন্য জায়গায় দেখে দিচ্ছি। কিছু ভাড়া দিতে হবে।

ভাড়া দিয়ে থাকা সম্ভব হয়েছিল জগদীশের ইংরাজি জানার ফলেই। সামান্য হলেও সে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত, সে কারণেই শিয়ালদহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নস্করদের মাছের গুদামের ম্যানেজারের চাকরি পেয়েছিল। নস্কররাও ছিল অনন্তনাথের ভক্ত। অনন্তনাথের কথা ফেলতে পারেনি নস্কররা। নামে ম্যানেজার হলেও বেতন ছিল যৎসামান্য। জগদীশ টাইপ শিখতে শুরু করে। তারপর ঐ টিন কোম্পানিতে চাকরি।

কোনো জাগতিক ঘটনাই মানুষের ইচ্ছানুযায়ী ঘটে না। জগদীশ্বরের ইচ্ছা-নির্ভর এই জগৎ। জগদীশ্বরের ইচ্ছা এই কথাটা ভাবতেই খবর কাগজের চন্দ্রযাত্রী দুই মানুষের ছবির কথা মনে পড়ল। কবে যেন হিমালয় শৃঙ্গ এভারেস্টে তেনজিং না কে যেন উঠে গিয়ে মানুষের পতাকা ধরিয়ে এসেছে। জগদীশ্বর কোথায় থাকেন? কোথায় দেবভূমি? আর দেবতা বৃত্তান্ত যদি নেহাত কবি-কল্পনাই হয়, কেবল ব্রহ্মই সত্য হয়, তবে ব্রহ্মের স্বরূপ কী? স্থানং ন মানং ন চ নাদ বিন্দু রূপং ন রেখা ন...শোনাও যায় না, দেখাও যায় না—নারীও নহেন, পুরুষও নহেন—লিঙ্গমূর্তি নহেন। ব্রহ্মাও বিষ্ণু ন চ—যিনি ব্রহ্মাও নন, বিষ্ণুও নন সেই ব্রহ্মকে নমস্কার। শঙ্করাচার্যের ব্রহ্ম তো এইরকম। রঙ নাই, রূপ নাই, ঘন নহেন, শূন্য নহেন, ব্যক্ত নহেন, অব্যক্ত নহেন, তিনি তবে কী? এ তো মহা গণ্ডগোলের ব্যাপার। তার আবার ইচ্ছা কী? কিছুই তো বোঝা যায় না। বরং ন স্বর্গো নাপবর্গ বোঝা যায়। চার্বাক বোঝা যায় তাহলে আমি এখন কী করি? কী তা করতাম, কী তা করতাম রে?

অনঙ্গমোহন ভাবেন জীবন বড় জটিল। জীবনক্রম পরিকল্পিত করা যায় না। তবে জীবনের ঘটনাগুলির মধ্যে কার্যকারণ যোগ কিছু আছে। আব্দুল করিম, যে ছিল নীলকমলের মেধাবী ছাত্র, সে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে ভোজন করতে পারত না। বেদ পড়তে অনুমতি দেওয়া হয়নি তাকে। মুসলমান চাষীরা কেউ তাঁদের দাওয়ায় উঠতে পারত না। অনঙ্গমোহনের বাস্তুচ্যুতির পিছনে ইতিহাসের বিধান ছিল। একেই বলা হয় বিধির বিধান। মুকুন্দদাসের গান ছিল—বিধির বিধান ভাঙবে তুমি এতই শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান। আজ বিধির বিধানে যদি তাঁর পুত্রবধূকে চাকরি করতেই হয়, তাতে আপত্তির তেমন কীই-বা আছে?

অনঙ্গ। অনঙ্গ। নিজের গুয়ে চন্দন লেপতাছ তুমি? তুমি কারে বুঝাও। নিজে টিউশনি পার না? যজমানি পার না? পুত্রবধূরে বাজারে নামাইতে চাও ক্যান? চাকরি করা অর্থ কি নামা? অবনমন? এইটা ঠিক কথা নয়। আর আমার কীই-বা করণীয় ছিল? সংস্কৃত ছাড়া তো কিচ্ছুই জানি না আমি। আমি তো অসহায়, জালে পড়ে যাওয়া চিত্রগ্রীব। সংস্কৃতের কোনো বিক্রয়মূল্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাই। যজন ও যাজনের সঙ্গে সংস্কৃতের যোগ নাই, ঐ সব কর্মপ্রচ্ছায়া মাত্র। হীনকর্ম। ইস্কুলের শিক্ষকতা পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ম্যাট্রিক পাস ছাড়া ইস্কুলের পণ্ডিতি হয় না।

জগদীশও ইস্কুলের চাকরির চেষ্টা করেছিল। দত্তপাড়া মিডল স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত ছিল। জগদীশ ঐ পর্যন্তই পড়েছিল। কাব্যতীর্থ হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলার স্কুলে কুত্রাপি চাকরি পায়নি। ম্যাট্রিক ছাড়া 'পণ্ডিত স্যার' হয় না। সংস্কৃত প্রশ্নপত্রে ইংরাজি থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করতে বলা হয়। অনঙ্গ, এই পৃথিবী বড় সুন্দর। এই পৃথিবীতে দাঙ্গা হয়, পার্টিশন হয়, মহামারী হয়, বন্যা হয়, ধর্ষণ হয়, তবু তো গঙ্গা কলকল, শীত ঋতুর পর খালধারের কৃষ্ণচূড়া শাখায় শির শির করে পাতা, ভগবদলীলায় জারিত জড়িত এই জগতে মরতে আসো নাই, মরতে আসো নাই রে...। জীবন, জীবন রে তুই না থাকিলে তবে সোহাগ করুম কারে। চপলা তটিনী মধ্যে পতিত নিশ্চল প্রস্তরখণ্ডই শৈবালাক্রান্ত হয়। কারণ সে নিশ্চল।

সুতরাং পরিবর্তনশীল জগতের যোগ্য হও। নচেৎ বাঁচব না। সংশয় ত্যাগ কর। ন সংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রানি পশ্যতি। সংশয়ং পুনরারুহ্য যদি জীবতি পশ্যতি। সংশয় অতিক্রম না কইরা কেউ মঙ্গল দেখতে পায় না। সংশয়ের মধ্যে বাঁইচ্যা থাকলেই সে মঙ্গলরে দেখতে পাবে। সুতরাং তুমি অন্নপূর্ণা হও, বৌমা, বৌমা গো।

অঞ্জলিকে নিয়ে ট্রামে উঠেছিলেন অনঙ্গমোহন। অঞ্জলির থানকাপড়ে গুঁড়ি গুঁড়ি নীল রঙ। কালির কারখানার কালি তৈরির মশলার সূক্ষ্মরেণু বাতাসে ওড়ে। সাদাকাপড় জুড়ে সেই দাগ। বাতাসে কালিমা ওড়ে—অনঙ্গমোহন একবার ভাবলেন। অনঙ্গমোহন ট্রামের হলুদ টিকিটটা পাকাচ্ছিলেন। ফতুয়াটা গায়ে আছে এখন। জামা পরেন না তিনি। ধুতি এবং একটি চাদর, যাকে ভালো কথায় উত্তরীয় বলা হয়, এটাই তাঁর পোশাক। জগদীশ একটি ফতুয়া কিনে দিয়েছিল। অঞ্জলির অনুরোধে এটা গায়ে দিয়েছেন তিনি। ঈষৎ ঠাণ্ডা পড়েছে। দেয়ালের গায়ে রৌদ্রের শোভা। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনাম থেকে হাত ওঠাও। আমার নাম তোমার নাম—ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম। ভিয়েতনাম কি কম্বোজ? কম্বোজেও সংস্কৃতচর্চা হত। গত সপ্তাহের বসুমতী কাগজে সুনীতিবাবুর প্রবন্ধ পড়েছেন অনঙ্গমোহন। রাস্তার দু'ধারের প্রাসাদ মধ্যবর্তী আকাশ মেঘমুক্ত, কী নীলবর্ণ। গত পরশুর শেষ রাত্রে পাশের ঘর থেকে বীরেন ভদ্রের ভাবগম্ভীর গলায় শুনেছেন—আশ্বিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জির। ধরণীর বহিরাকাশে অন্তর্হিত মেঘমালা। প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ীর আগমন বার্তা। অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোকে ও রসলোকে আনে নব ভাবমাধুরীর সঞ্জীবন। ব্যাকরণে ভুল আছে।

নবভাবমাধুরীর সঞ্জীবন কিন্তু মনে মনে টের পান অনঙ্গমোহন। বৌমার চাকরি হলে নির্বিঘ্নে চতুষ্পাঠী চালাতে পারবেন তিনি। সুমিতা বড়ই আদর্শ ছাত্রী। অসীম আছে, গুরুগৃহে আশ্রিত। জীবন আছে—হোমিওপ্যাথির ডাক্তার, বড়ই সংস্কৃতপ্রেমী। আরও কয়েকজন নিষ্ঠাবান ছাত্র সংগ্রহ করতে হবে।

অঞ্জলি অবগুণ্ঠন সরিয়ে পিছন দিকে তাকাচ্ছে বারবার। বিচলিতা যেন-বা। রাজাবাজার কি পার হয়ে গেল? কন্ডাকটার বললেন, দেরি আছে। মানিকতলার ব্রাহ্মণসভায় মাঝে মাঝে আসেন অনঙ্গমোহন আর যান সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদে। বৃত্তির জন্য তাগাদা দিতে হয়। বৃত্তির নাম হয়েছে ডিএ। ইন্সপেক্টর নলিনীকান্ত মিশ্রও বলেন ডিএ; ডিএ-র সংস্কৃত হল মহার্ঘভাতা। বেতন-এর সঙ্গে ডিএ সংযুক্ত হয়, এটাই নিয়ম। কিন্তু এখানে বেতন নেই। সরকারি ভাতার নাম ডিএ। সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে চল্লিশ টাকা মাসে। রাজাবাজার অঞ্চলে বিশেষ যাবার প্রয়োজন হয়নি অনঙ্গমোহনের। কন্ডাকটারকে পুনরায় বললেন অনঙ্গমোহন, রাজাবাজার অবগত করাবেন ভাই। হাতের ইশারায় লেডিজ সিটে বসা অঞ্জলিকে আশ্বস্ত করেন অনঙ্গমোহন। অঞ্জলি আজ বের হবার আগে নারায়ণ প্রণাম করেছে সাষ্টাঙ্গে। জগদীশের ছবিকেও প্রণাম করেছে। যেন পরীক্ষা।

রাজাবাজার নেমে ঠিকানাটা বার করলেন অনঙ্গমোহন। গোমাংসের দোকানের পাশ দিয়ে রাস্তা। লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পৌঁছলেন আইডিয়াল টিনবক্স ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানিতে। সাইনবোর্ডটা অঞ্জলিই পড়ল।

পরিতোষের খোঁজ করেই পেয়ে গেল। পরিতোষ বলল—সব কথা বলে রেখেছি। চলুন মালিকের ঘরে।

ক্রমাগত ঠন ঠন আওয়াজ। দেওয়ালের ধারে নানা সাইজের টিনের কৌটা। কোনো টিনের গায়ে রসগোল্লার ছবি। কোনোটায় কমলালেবুর। বাংলাতেও লেখা দেখতে পেল—পিউরিটি বার্লি। পরিতোষ বলল—ঐ টিনগুলোয় কে সি দাসের রসগোল্লা ভর্তি হয়, ঐ রসগোল্লা বাইরে চালান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়, দিল্লি-বোম্বেতেও যায়। ঐগুলো গাঙ্গুরামের। রসগোল্লাই আমাদের বড় ক্লায়েন্ট।

কাঠের দরজার উপরের দিকটায় কাচ লাগানো। দরজাটি যেন বায়ুভূতে নিরাশ্রয়, ওটি সামান্য ফাঁক করে পরিতোষ তার গলামাত্র বাড়াল। বলল, জগদীশদা কা উইডো আয়া। ভিতর থেকে কথা এল—লিয়ে আসুন। অঞ্জলি ঘোমটা বাড়িয়ে দিল। আঁচল দিয়ে ঢাকা দিল শরীর। ওরা ভিতরে ঢুকল। মালিক বলল বসুন। অনঙ্গমোহনকে বলল—শুনলাম আপনি একজন পণ্ডিতজি আছেন। আপনার মতন কুছ কাম ইখানে নেই। জগদীশবাবুর লেড়কা ভি বহুত ছোট আছে। এখন কী আমি করতে পারি।

অনঙ্গমোহন নিশ্চুপ। টেবিলে কালো টেলিফোন, কিছু কাগজপত্র, আর একটা প্লেটে ভাঙা জিলিপি। কয়েকটা মাছি।

বলেন—কী আমি করতে পারি?

অনঙ্গমোহন পরিতোষের দিকে তাকায়। পরিতোষের চোখে তখন কারুকার্য। কৃষিক্ষেত্রে, যুদ্ধে ও রাজদরবারে যারা দীর্ঘসূত্রতা করে তারা মূঢ়।

আমার এই পরিবারটিরে রক্ষা করেন শেঠজি।

সংস্কৃত শ্রেষ্ঠী শব্দ থেকে আগত শেঠজি, হা হা করে হেসে উঠলেন। তাঁর কপালে শ্বেতচন্দনের তিলক, কণ্ঠে স্বর্ণহার, গালে মেচেতা। মুখে পান দিয়ে বললেন—হামার কী ক্ষ্যামোতা আছে রক্ষা কোরার? অ্যাঁ?

অনঙ্গ আবার পরিতোষের দিকে তাকায়। পরিতোষের চোখে কারুকার্য। অনঙ্গমোহন বলেন, আপনি ইচ্ছা করলেই—পারেন।

বলুন আমি কী ইচ্ছা করতে পারি? আপনি কী চান পণ্ডিতজি?

অনঙ্গমোহন বুঝতে পারেন কথাটা তার মুখ দিয়েই বার করতে চান শ্রেষ্ঠী। অনঙ্গমোহন মূষিক নিন্দিত কণ্ঠে বললেন—আমার এই বৌমার যদি একটা চাকরি...কফে ঘড়ঘড় করে উঠল গলা, কিছু টিন গড়িয়ে পড়ল হুড়মুড় করে। মাটিতে চাকা বিঁধে যাওয়া কর্ণের বিলাপের মতো বলল, আপনের দয়া হইলেই...।

আপনি কী কাজ করতে পারবেন ম্যাডাম? অঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রেষ্ঠী।

জানি না। অঞ্জলির মাথায় ঝাঁকুনি।

প্রভুর সঙ্গে কথার মধ্যে এত ঝাঁঝ কেন মা? অনঙ্গমোহন মনে মনে বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেষ্ঠী বললেন—জগদীশ লোকটা খুব ভালো ছিল। ওর উপরে আমার থোড়াবহুত সিমপাথি আছে। আউর আপনি ভি পণ্ডিতজী আছেন। তো একটা কিছু আমাকে করতেই হবে। যশবাবু ভি বহুত রিকোয়েস্ট করেছে। দেখি কী কোরা যায়। আর এখন জগদীশের ডিউজ যা ছিল, সব দিয়ে দিব। একথা বলেই যশবাবুর দিকে তাকান। যশবাবুর ঘাড় ও শরীরে তখন কারুকার্য। যশবাবু দ্রুত একটা ফাইল নিয়ে এসে মালিকের সামনে ধরেন। মালিক তাঁর আঙুল জিভে ঠেকিয়ে ফাইলের পৃষ্ঠা ওল্টান। এবার অঞ্জলির দিকে ফাইলটা বাড়িয়ে বলেন—সিগনেচার লাগিয়ে দিন ম্যাডাম। পরিতোষ যশ তার কালো রাইটার কলমটা বাড়িয়ে দেয়। এইটিন হানড্রেড সেভেনটি ফাইভ। এই টাকাটা পাচ্ছেন। অঞ্জলি সই করে। শুভকার্যে হুলুধ্বনি বিধেয়। বাইরে টিনের শব্দ। টিনের উপরে টিন। টিনের ঝনঝন।

দেখি, কী কোরা যায়। আমি খোবর দিব, বুঝলেন।

অঞ্জলি মৃদু ঘাড় নাড়ল।

সাঁই সাঁই গাড়ির ফাঁকে ওরা দুজন। জেব্রা ক্রসিং-এর সামনে ওরা দুজন। রাস্তা পার হবার সময় অঞ্জলির হাত ধরলেন অনঙ্গমোহন। হাত আর্দ্র। ঘর্মাক্ত। অনঙ্গমোহনের ইচ্ছা হয়, এই বিধবা পুত্রবধূকে কিছু সুখাদ্য খাওয়ান। সামনের মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে কিছু নরম সন্দেশ কিনে দেন। একবার মিঠাই দোকান ও একবার অঞ্জলির মুখের দিকে তাকান অনঙ্গমোহন। কিছুতেই কথাটা বলতে পারেন না। অনঙ্গমোহন যেন সেই জমদগ্নি, ব্যাধ-কপোত কথার ব্যাধ।

কলিকাতা বড় কোলাহলপ্রবণ। বাসের হর্ন, ট্রাম, জঞ্জাল-লরির ঘড়ঘড়। কিছুই ভাল লাগে না। সমস্ত কলকাতা জুড়ে বড় টিন ঝনঝন ঝনৎকার। কলকাতার পায়ে বিড়ালের থাবার নৈঃশব্দ্য সংস্থাপন কইরা দিমু আমি... অনঙ্গমোহন ভাবলেন। বারো নম্বর ট্রাম আসে। সন্দেশ কেনার কথা আর বলা হল না।

কুলবধূ যে অন্তঃপুরেই থাকবেন এমন নিয়ম কৃত্রিম। পুরাকালে মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, গার্গী এমন আরও কত কুলবধূ জ্ঞান ও মেধার চর্চা করেছেন, পণ্ডিত সভায় গিয়েছেন, কুলবধূদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখা যাবনিক পর্দাপ্রথারই প্রভাব। এবার পেটে হাত দেন অনঙ্গমোহন। রুমালটার অস্তিত্ব অনুভব করেন।

রুমালে আছে ওয়ান থাউস্যান্ড এইট হানড্রেড সেভেনটি ফাইভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাউস্যান্ড সহস্র হয়, হানড্রেড শত, ল্যাক লক্ষ, ক্রোড় কোটি কহ অবিরত। রুমালটায় সুতোয় সুতোয় লেখা আছে পতি পরম গুরু। সুরবালা করে দিয়েছিল এটা। সুরবালা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না ছিলেন।

বিবাহের সময় সুরবালার অক্ষরজ্ঞান ছিল না। বিবাহের সময় সুরবালা ছিল মাত্র তের বৎসরের বালিকা। কুল আর ঢেউয়া গাছের তলায় ছিল বিচরণ। আহা ঢেউয়া। এদেশে এসে আর ঢেউয়া দেখতে পাননি অনঙ্গমোহন। স্বর্ণবর্ণের কোয়া। লবণে জারিত করে নিলে কী আশ্চর্য স্বাদ। সুরবালা দেখত, বাড়ির কত ছাত্র পড়ছে, মাদুরে ছড়ানো পুঁথি, কত বই। সুরবালা বুঝতে পারত না কোনটা ভট্টিকাব্য, কোনটা কলাপ, কোনটা রঘুবংশ। ও শুধু বইপত্রগুলির দিকে, বইয়ের কালো কালো অক্ষরগুলির দিকে নির্বাক তাকাত।

বামা জাগরণী সমিতি তৈরি হল দত্তপাড়ার জমিদার বাড়িতে। জমিদার বীরেশ্বর দত্ত স্বরাজ্য পার্টির মেম্বার। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তার বাড়িতে যাওয়া আসা করেন। বীরেশ্বর দত্ত, একদিন সদলবলে হাজির নীলকমলের বাড়িতে। নীলকমলের সাক্ষাৎপ্রার্থী স্বয়ং জমিদার। কী বৃত্তান্ত? না, সাহায্য চাই, সাহায্য। বীরেশ্বর দত্ত বললেন, আমরা বামা জাগরণী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছি।

—আপনারা বামা জাগরণ করাইয়া কী করবেন? ম্যাম বানাইবেন?

তা কেন? মেম তাড়ামু।

অর্থাৎ?

দেখেন পণ্ডিত মশয়, ব্রিটিশ তাড়াইতে গেলে তো শুধু গান্ধী, তিলক, চিত্তরঞ্জনবাবু দিয়া হইব না, প্রত্যেকেরেই চাই। মা-ভগ্নীগরেও সঙ্গে চাই। তার আগে চাই ল্যাখাপড়া। শিক্ষা। অন্তঃপুরে শিক্ষা প্রচার দরকার। ঠিক কি না কন।

নীলকমল বললেন—যথার্থ নয়।

কেন?

নীলকমল বললেন—আপনারা কেহই ন্যায়াধীশ নহেন, স্মার্ত নহেন। সুতরাং এ মীমাংসা আপনাদের সঙ্গে নয়।

—তবে কি আপনি স্ত্রী শিক্ষার বিপক্ষে?

—নটী, বারাঙ্গনাদি নারীদের শিক্ষার প্রয়োজন। কুলবধূদের নয়।

—তবে—খনা, লীলাবতী, মৈত্রী—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—সে যুগের কথা পৃথক।

বীরেশ্বরবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—কাকা, আপনি একজন বিদ্যোৎসাহী ব্রাহ্মণপণ্ডিত। আপনি যদি স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা না দেন তবে ব্রাহ্মণদিগের বালিকারা কেউ ইস্কুলে আইব না। আমরা কতগুলি বালিকা পাঠশালা স্থাপন করুম। এই গ্রামেও একটা করুম। আপনার অনুমোদন ছাড়া...

আমার অনুমোদন নাই। সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন নীলকমল।

কিন্তু নীলকমল জমিদার নয়। দত্তবাবুই জমিদার। তাই শেষ পর্যন্ত পাঠশালা হল। নলিনীকান্ত শূরের ভিতরের বাড়িতে রোজ দুপুরে বসত পাঠশালা। নলিনী শূরের পুত্রবধূ এন্ট্রান্স পাস। কলিকাতা-বনিতা, বেথুন কলেজের ছাত্রী। নলিনী শূরের পুত্র এম বি ডাক্তার, সদরে বসেন। আর ঐ পাঠশালার শিক্ষিকা হল ঐ নলিনীবাবুর ম্যাট্রিক পাস পুত্রবধূ। সে সেমিজ পরে, পায়ে জুতো পরে ঘটিহাতা জামা; বিলাতি বেগুনকে বলে টমেটো।

নীলকমল সে সময়ে নলিনীকান্ত শূরের উদ্দেশ্যে একটি শ্লোক রচনা করেছিলেন—

শস্ত্র হরণে শূরাবহব; সন্তি মানবাঃ
শাস্ত্র হরণে শূর এক এব ভবান ভুবি।

অর্থাৎ অনেক বীর আছেন যাঁরা শস্ত্র হরণ করতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্র হরণকারী একা তুমিই আছ হে শূর।

কায়স্থ বাড়ির, বৈদ্যবাড়ির মেয়ের কেউ কেউ ঐ স্কুলে যেতে লাগল। পুজোয় চণ্ডীমণ্ডপে দক্ষযজ্ঞ পালার আগে হল স্বদেশী গান।

লক্ষ্মী তোমরা সাবিত্রী তোমরা জননী তোমরা নারীগণ।

গৃহপতি সেবার সঙ্গে বিদ্যা করহ অনুশীলন...অশ্বিনী রায় গান গাইলেন।

মেয়েরা ভিতর বাড়িতে বসে বসে দেখল। চিকের ব্যবস্থা ছিল না। নীলকমলদের ভট্টবাটিতে চোদ্দঘর ব্রাহ্মণ। নীলকমলের জ্ঞাতি-ভাইদের কোনো কোনো সংসারের দু'একজন মেয়ে ঐ পাঠশালায় যাতায়াত করতে লাগল। নীলকমল একদিন অধ্যাপনারত অবস্থায় শুনলেন পার্শ্ববর্তী অঙ্গন থেকে ক্রীড়ারতা বালিকাদের গান—

পামকিন চালকুমড়া কুকুম্বার শশা।
ব্রিঞ্জল বার্তাকু হয়, প্লাউম্যান চাষা।

নীলকমল চিৎকার করে উঠেছিলেন। গোল কোরো না, লঘু বালিকারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরবালাও বালিকা। অনঙ্গমোহনের সঙ্গে সদ্য বিবাহ হয়েছে। সম্প্রতি রজস্বলা হয়েছে। সুরবালার ঐ পাঠশালায় পড়তে যাওয়া প্রশ্নাতীত। তবে প্রতিবেশী রোহিণী, চপলা, এদের সঙ্গে ওর বড় ভাব। তারাও জ্ঞাতি, স্বগোত্র। আসা-যাওয়া আছে, যদিও বয়সে সুরবালার চেয়ে কম। একদিন নীলকমল বললেন—অনঙ্গ, ওরা যেন এ বাড়িতে না আসে। বৌমারে জানাইয়া দিও। শূর বাড়িতে এখন আসুরিক কাজকর্ম। নামে পাঠশালা, আসলে ইংরাজি ইস্কুল।

একদিন দুপুরে শূরবাড়ি থেকে কুড়োবা কুড়োবা লিজ্যে, কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্যের পরিবর্তে শোনা গেল—

ত্রিশদিনেতে হয় মাস সেপ্টেম্বর
সে রূপ এপ্রিল জুন আর নভেম্বর

এবং সবচেয়ে বড় কথা পার্শ্ববর্তিনীরা একদিন গাইল—

পামকিন চালকুমড়ো কুকুম্বার শশা
কাম-ইন ভিতরে আসা সিট-ডাউন বসা।

নীলকমল চোখ বড় বড় করে বললেন—পণ্ডিতঃ ধ্রুব ভাবতে, কইছিলাম না, ম্যাম তৈরি হইতাছে? ম্যামের কারখানা? কইছিলাম না?

অনঙ্গমোহন সুরবালাকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন যেন ঐ বালিকাগুলি কেউ এ বাড়িতে না আসে। পিতার আজ্ঞাই শিরোধার্য। সুরবালা মৌন ছিল তখন। তারপর অনঙ্গমোহনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল, কিন্তু আমারও যে পড়তে ইচ্ছা করে। আপনেগর সারা বাড়িতে কত বই। বইয়ের মধ্যে কত অক্ষর। আর আমার কাছে ও-গুলানই কেবল কালো কালো দাগ। আমারে শিখাইবেন? অ আ ক খ?

অনঙ্গমোহন শেখাচ্ছিল। অ আ ক খ শেখাচ্ছিল। স্লেট পেনসিলে সুরবালাও অ আ ক খ অভ্যেস করছিল। নীলকমলের অনুমোদন ছিল এতে।

আস্তে আস্তে অ-কার যোগ, উ-কার যোগ শিখছিল সুরবালা। সুরবালা প্রায়ই 'ম' অক্ষরের পাশে ফুলদানির মতো আকার বসিয়ে দিত। আর তখনই অক্ষরটা জীবন্ত হয়ে উঠত। মাতৃহারা সুরবালা উচ্চারণ করত মা। তখন ঐ মা শব্দের উচ্চারণে ধূপ-দীপ জ্বলত। লক্ষ্য করত অনঙ্গমোহন, প অক্ষরের পাশে ত-য়ে হ্রস্বই যোগ করে মৃদু মৃদু হাসত সুরবালা। একা একা অক্ষর দিয়ে খেলা করত সুরবালা। ফ অক্ষরের তলায় নূপুরের মতো উকার যোগ করে দিত, তারপর ল। কখনো রাত্রে দীপালোকে স্লেটে র লিখে অনঙ্গমোহনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বলতো, এবার কী লিখি? অনঙ্গমোহন লিখে দিত ত-য়ে হ্রস্বই।

একদিন রাত্রে শয্যায় শুয়ে অনঙ্গমোহনের রোমশ বুকে হস্তলেপন করছিল সুরবালা। চম্পাকলির ন্যায় কোমল আঙুল। একটা একটা রোম ধরছিল, মৃদুটান দিচ্ছিল এবং তখন—

তবলা বেহালা বাঁশি বীণা পাখোয়াজ/করতাল তানপুরা সেতার এস্রাজ
সানাই সারঙ্গ শঙ্খ কাশী ঢাক ঢোল/নাগারা টিকারা কাড়া জগঝম্প খোল...

আমারে বাল্যশিক্ষা কিন্যা দিবা? বাল্যশিক্ষা? কী সুন্দর ছবি। ঘোড়ার ছবি, হাতির ছবি, সুবোধ বালকের ছবি। অনঙ্গমোহন বলেছিল, দিমু।

একদিন নীলকমল চৌকির তলায় ইঁদুর মারার কল পাততে গিয়ে দেখলেন, ঘরের কোণায় কাগজ। কলম। কলমে বিলাতি পিরামিড নিব। কাগজে লেখা অজ-আম-ঈশ। দেখলেন পরপদ লয়কর কমলজ নয়ন। তারপর বললেন—অনঙ্গ এই ইস্কুইল্যা জ কে লিখছে? বৌমা না?

ইস্কুইল্যা 'জ' হল ছাপা বইয়ের 'জ'। যা প্রচলিত হস্তলিখিত 'জ'-এর মতন নয়। আলাদা ধরনের। অনঙ্গ মাথা নিচু করে বলেছিল, হ। নীলকমল শুধু বলেছিলেন—সব নোড়াই শালগ্রাম হইলে বাটনা বাটব কীসে?

কাগজপত্র বই কলম—সব কিছুই পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিল সুরবালা। সেই দিনই।

ট্রামের ঘড়ঘড়। অঞ্জলি বসে আছে অবগুণ্ঠানাবৃতা। সাদা শাড়িতে নীলবর্ণের ছিটে। ধাবমান ট্রাম। এই ট্রামে টিন কোম্পানিতে চাকরি করতে যাবে অঞ্জলি। সময় এরূপই ধাবমান।

পাঁচ

উপনয়নের পর ডিম খেতে পাচ্ছে না বিলু। পেঁয়াজ রসুন ডিম এসব তো নিষেধই, বাইরের কিছু কিনে খেতেও নিষেধ করে দিয়েছেন অনঙ্গমোহন। বাজারে কিছুদিন ধরে চালের টানাটানি। রেশনে চালের বরাদ্দ কমিয়ে গম বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বাড়িতে রুটি হচ্ছে। প্রফুল্ল সেন বলছেন, গম খান। চাল কম খান। অনঙ্গমোহন রুটি খেতে চান না। খৈ এবং গুড়সমেত কাঁসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থালায় আজকাল বড় তীব্র ঠং শব্দ শোনেন অনঙ্গমোহন। বিলু বেশ ভালো কায়দায় রুটি খায়। একটা শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে রুটিতে মাখিয়ে নেয়, সঙ্গে একটু সরষের তেল এবং নুন। গরম গরম খেতে হেভি লাগে। রুটির সঙ্গে তরকারি খেতে নিষেধ করেন অনঙ্গমোহন। সিদ্ধ ব্যঞ্জন লবণ প্রয়োগে উচ্ছিষ্ট হয়।

আজ রান্নাঘরে সস্‌প্যানে ভাতের ফ্যানের উপর ডিমের খোলা ভাসছে। তাহলে আজও মামলেট হয়েছিল। বিলুর মা সাড়ে ন'টার সময় কাজে চলে যায়, তখন রান্নাঘরে তরকারির খোসা ছড়ানো থাকে, শিলনোড়ায় শুকনো মশলা, কখনো ভাতের ফ্যানের উপর ভেসে থাকে ডিমের খোলা। অবশ্যই হাঁসের। মুরগির ডিম ঢোকে না। স্বপ্নার মরনিং স্কুল। স্বপ্না স্কুল থেকে এসে রান্নাঘর পরিষ্কার করে, অনঙ্গমোহনকে খেতে দেয়। এখন ঢাকা উঠিয়ে বিলু দেখল মামলেট রাখা আছে, একাকী, অনাথ। অন্য সব ডাল-তরকারি থেকে বিচ্ছিন্ন। আলাদা করে ঢাকা দেওয়া, অন্য ডাল-তরকারিতে যাতে স্পর্শদোষ না লাগে। মামলেটটার থেকে বেরিয়ে আসছে লঙ্কার কুঁচির সবুজ আভাস। আহা ডিম। কেন যে পৈতা হল।

অনঙ্গমোহন তাঁর টোল খুলে বসেছেন। তিনটি মাদুর গোটানো থাকে বারান্দায়। বারান্দাটা ঘরেরই লাগোয়া এবং বারান্দার দক্ষিণ দিকে একটি জানালা আছে। দক্ষিণের জানালার তলায় জেলেপাড়ার বস্তি। চারিদিক ঘেরা কিন্তু আচ্ছাদনহীন কলঘর, দোতলার বারান্দার দক্ষিণের জানালা দিয়ে দেখা যায়। চৈত্রে, যখন দক্ষিণ দিক থেকে হু হু করে হাওয়া আসে, তখন ঐ দক্ষিণের জানালার শিক ধরে শিখার বাবা গান করেন, আজি দখিন দুয়ার খোলা—ঐ জায়গাটা এখন পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠী। বারান্দাটার এই অংশটুকু লাল সিমেন্ট করা। মসৃণ। শিখা ও স্বপ্না এক্কা-দোক্কা খেলত, এখন খেলে না। এখানে একটা ছোট্ট গর্ত আছে, ওটা পিল। ওখানে গুলি খেলা যায়। বিলু ও অসীম গুলি খেলে। জায়গাটা এখন এই মুহূর্তে পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠী। অনঙ্গমোহন বসেছেন একটি আসনে। মাদুরে সুমিতা ও ডাক্তারবাবু। মেঝেতে বসে আছে অসীম। অনঙ্গমোহন বললেন, পঞ্চমে পঞ্চমাংস্কৃতীয়ান্নবা—এটাই হইল সূত্র। বুঝলানি অসীম। অসীম মাথা চুলকোল। অসীম ব্যাকরণের আদ্য পড়ছে। ডাক্তারবাবুও তাই। সুমিতা কাব্যের আদ্য-মধ্য পাস করেছে। উপাধি দেবে। উপাধি পাস করলেই কাব্যতীর্থ হয়ে যাবে সুমিতা। সুমিতা অনঙ্গমোহনের গৌরব। অসীম ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তারকে বিদায় করে সুমিতাকে নিয়ে বসবেন অনঙ্গমোহন। অনঙ্গমোহন বললেন—বর্গপ্রথমাঃ পদান্তাঃ পঞ্চমে পরে পঞ্চমান্যপদান্তে তৃতীয়ান্নবা। অর্থাৎ বর্গের পঞ্চম বর্ণ পরে থাকিলে পদান্তে স্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম অথবা তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা বাক্‌যুক্ত মতি এখানে ক হইল প্রথম বর্ণ। আর পঞ্চমবর্ণ ঙ। তা হলে গিয়া বাঙমতী। তারপর তৃতীয় বর্ণ অর্থাৎ গ্ হইয়া বাগ্মতী হইল। তাইলে বাক্‌যুক্ত মতি সমান সমান বাগ্মতী। সেইরূপ প্রাকযুক্ত কথন সমান সমান প্রাগকথন। ক স্থানে গ। সংস্কৃত এইরূপ সূত্র-বদ্ধ ভাষা। নড়চড় হইবার উপায় নাই।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—পণ্ডিতমশাই, আমরা যে বলি, কাগের ডিম, বগের ডিম। এখানে ক স্থলে গ হয় কেন?

সুমিতা অনঙ্গমোহনের দিকে মুখ টিপে হাসল। অনঙ্গ সুমিত্রার ভ্রূভঙ্গি প্রত্যক্ষ করে বললেন—অপৃষ্ঠ বহুভাষাতে।

অনঙ্গমোহন বললেন—তোমরা ভ্রান্তিবশত কাকরে কও কাগ। বকরে বগ। দ্বিপ্রহর শব্দাগত দুপুররে তোমরা কও দুকুর, পিপড়ারে কও পিমড়ে। এইসব ভ্রম।

পণ্ডিতমশাই কিছু মনে করবেন না। আমনারাও কিছু ভুল উচ্চারণ করেন। টাকাকে বলেন টাহা। এই 'আমনারা' মানে কী বলতে চাইছে এই ডাক্তার ছাত্র, অনঙ্গমোহন বুঝে নেন। আমনারা মানে বাঙালরা।

একটা ঘটনা মনে পড়ে যায় অকস্মাৎ। তখন সদ্য কলকাতা এসেছেন অনঙ্গমোহন। অনন্তনাথ জ্যোতির্ভূষণের বাড়িতে রয়েছেন। এক পণ্ডিত-নিমন্ত্রণে তারকেশ্বর পাঠালেন অনন্তনাথ। ট্রেনে বসেছিলেন। জানালা দিয়ে কয়লার গুঁড়ো আসছিল। ধুতি এবং নামাবলীতে কুঁচি-কুঁচি কয়লার গুড়ো ভেসে এসে পড়ছিল। পাশে বসে কথা বলছিল দু'জন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। বলছিলেন, তেভাগার ঝামেলি মিট্‌মিটন্তি হল নে, অছতো আবার আরেকটা আইন আসছে। আবদুল্লা রসুল আর ভূপালপাণ্ডা খুব নাফাচ্ছে। আর একজন বলল, চাষে আর কিছু থাকবেনি। দিনকে দিন খরচ বাড়ছে অছতো ফসলের ভাগ ওদেরকেই দিতে হবে। অরাজক। অন্যজন, ট্যাক্সো দিচ্ছি আমরা অছতো চেল্লাচ্ছে নাঙল যার জমি তার। অনঙ্গমোহনের সামনে বসে ছিল একটি যুবা। হাতে একই বই—মৃদু মৃদু হাসছিল। পরনে ফুলপ্যান্ট ও জামা। হঠাৎ বলল—এই রেল কোম্পানির অবস্থাটাই দেখুন না। কয়লা ওড়াচ্ছে, অছতো ট্রেনের জানালা নামানো যায় না, অছতো আবার ভাড়া বাড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনঙ্গমোহনকে লক্ষ করলেন সেই মধ্যবয়সী দুজন পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল। একজন বলে উঠল, খুব তো ড্রেস লাগিয়েচ। ফুলপ্যান্টালুন গলিয়েচ। অছতো ভদ্রতা শেখনি।

মনে মনে রসিক যুবকটিকে তারিফ করেছিলেন তিনি।

সেই দিনই তারকেশ্বরে আর এক ঘটনা। ফলারের সময় পরিবেশনকারীকে অনঙ্গমোহন বললেন, দধির সঙ্গে কিঞ্চিৎ চিড়া দেও। পরিবেশনকারী বলল—চিড়া কি আবার, বলুন চিড়ে। একটু পরে অনঙ্গমোহন বললেন, সামান্য গুড়ে দেও। একথা শুনে সে হেসে উঠল। একজন ভাটপাড়ার পণ্ডিত টিপ্পনী কাটল, 'বাঙালা যদি মনুষা, হরিহরি, প্রেতাস্তদাকিদৃশ্য।'

অনঙ্গমোহন পরবর্তী সূত্রে চলে যান। বলেন, সন্ধিবৃত্তি দ্রুত শেষ কর। আরও অনেক পড়া আছে। অসীম উশখুশ করে। বলে ইস্কুল যাব। অনঙ্গমোহন বলেন, আর একটা সূত্র। বর্গপ্রথমেভাঃ শকারঃ স্বরযবরপরচ্ছ... কাশতে থাকেন অনঙ্গমোহন। অসীম উঠে পালায়। ডাক্তার জীবন মজুমদার জিজ্ঞাসা করলেন—রাত্রে বাড়ে? কপাল ঘামে? জল পিপাসা কেমন? কাশির দমকের মধ্যেই অনঙ্গমোহন হাত বাড়িয়ে বললেন, থামো। থামো। জীবন মজুমদার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। 'হোমিওপ্যাথিক অমৃত' নামে একটি বই লিখেছেন তিনি। সহজ হোমিও চিকিৎসা। ছড়ার ছন্দে বিরচিত। কাশির দমক থামলে অনঙ্গমোহন বললেন, আগে সূত্রটি শেষ করি, পরে তোমার প্রশ্নাদির উত্তর। তোমার হোমিও প্রশ্ন বড় দীর্ঘ প্রলম্বিত হয়। বর্গপ্রথমেভ্য শকার...জীবন ডাক্তার বললেন—কিন্তু অসীম ভাই যে নেই...। অনঙ্গমোহন দেখলেন অসীম পালিয়েছে। তিনি কপালে মৃদু চপেটাঘাত করলেন। সুমিতাকে বললেন, আমার এরকমই অদৃষ্ট। দেখ দেখি, গুরুগৃহে থাইক্যাও কেমন গুরুর অবাধ্য হয়...। ঝনঝনায়তে। সুমিতা বলল, অসীমভাইকে নিয়ে বড় বেশি উচ্চাশা আপনার, কিছু মনে করবেন না।

এই চতুষ্পাঠীতে ছাত্ররা পরস্পরকে ভাই বলে সম্বোধন করে। অনঙ্গমোহনের এই রকমই নির্দেশ। অনঙ্গমোহনের পিতার চতুষ্পাঠীতেও এরকমই নিয়ম চালু ছিল। বয়স নির্বিশেষে সব ছাত্রই পরস্পরের ভাই। মাধবভাই, আশুভাই, শশাঙ্কভাই, এমনকি রশিদভাই। গুরুকুলের এমনই নিয়ম। এক গুরুর দীক্ষিতরা যেমন পরস্পরের গুরুভাই। তেমনই একই আচার্যের ছাত্ররা পরস্পরের গুরুভাই। এই প্রাচীন নিয়ম এখনো চালু রাখতে চান অনঙ্গমোহন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন ডাক্তার বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই বললেন, কদিন ধরে এরকম কাশি হচ্ছে পণ্ডিতমশাই? পণ্ডিতমশাই ডাকটা খুব একটা পছন্দসই নয় অনঙ্গমোহনের। সুমিতা যখন আচার্যদেব বলে ডাকে তখন হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে অনঙ্গমোহনের।

কাশি কি শুকনো?

কাশির সঙ্গে গয়ের ওঠে, গয়ের?

এই ছাত্রটিকে একেবারেই অপছন্দ অনঙ্গমোহনের। অথচ বলতে পারেন না, তোমার মতো ছাত্রের দরকার নেই আমার। কারণ পাঁচজন ছাত্র না দেখাতে পারলে সরকারি সাহায্য পাওয়া যায় না। এই জীবন ডাক্তার যদি পুনঃপুন অকৃতকার্য হয় এবং সেইসঙ্গে অধ্যবসায় বজায় রাখে তবে সে এই টোলের একটি স্থায়ী ছাত্র হিসাবে বহুদিন পাঁচজনের একজন থাকতে পারে। এ কারণেই জীবন ডাক্তারকে রুষ্ট করেন না অনঙ্গমোহন, বরং তুষ্টই করেন।

জিভটা দেখান তো পণ্ডিতমশাই।

অনঙ্গমোহন জিহ্বা প্রদর্শন করলেন।

জীবন ডাক্তারের তিন দিনের ওষুধ দু'টাকা। জেলেপাড়ার মোড়ে তার চেম্বার, খুব ভিড়। অনঙ্গমোহনও তারই শরণাপন্ন। জীবন ডাক্তার একদিন সাদা সাদা গুঁড়োর মধ্যে একফোঁটা ওষুধ ফেলে বললেন—ঝুঝলেন পণ্ডিতমশাই, এ হচ্ছে অ্যাটমিক ওষুধ। অ্যাটমিক অ্যাকশন। সংস্কৃতে শুনেছি সব আছে। অ্যাটমের কথা আছে?

অ্যাটম? মানে অণু-পরমাণু? অনঙ্গমোহন মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, নিশ্চয় আছে। সবই আছে। সংস্কৃত ভাষা হইল হীরার খনিবিশেষ। এর মধ্যে থিক্যা সব সংগ্রহ কইরা নিতে হয়। জীবন ডাক্তার বললেন—বুঝলেন পণ্ডিতমশাই, সংস্কৃতটা শিখে নিতে পারলে হোমিওপ্যাথি নিয়ে একটা রিসার্চ করা যেত। এই দেখুন না, মহেন্দ্রবাবুর হোমিওপ্যাথির বইয়ের ফার্স্ট পেজে কী লেখা আছে—সমঃ সমং শময়তি। ল্যাটিনে হল সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরেন্টাম। আচ্ছা, সংস্কৃতে অ্যাটম, মানে অণু-পরমাণু সম্পর্কে কি বলা আছে? অনঙ্গমোহন বলেন—আছে, আছে, প্রচুর আছে। অণু আর পরমাণু এই শব্দ দুটোই তো সংস্কৃত।

এইভাবেই শুরু হয়েছিল জীবন ডাক্তারের সংস্কৃত প্রেম। আজ চার মাস যাবৎ অনঙ্গমোহনের টোলে যাওয়া আসা। শোনা যায়, এর আগে জীবন ডাক্তার কাজী সব্যসাচীর কাছে চার মাস আবৃত্তিচর্চা করেছিলেন, মনোহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইচের কাছে ব্যায়াম শিক্ষা নিয়েছিলেন আড়াই মাস।

মিষ্টি পছন্দ না নুন? ও হ্যাঁ, সে তো আমি জানিই, মিষ্টি পছন্দ।

—দিনে বাড়ে না রাত্রে বাড়ে?

তেমন কিছু নয় জীবন। ঔষধ না হলেও চলবে। সামান্য অনিয়ম হয়েছিল। রোজই গঙ্গাস্নান করি, গত পরশুদিন কলের জলে স্নান করেছিলাম।

—অসুখ অবহেলা করবেন না পণ্ডিতমশাই। সামান্য একদিন অসামান্য হয়। ছোট ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল। বলুন পণ্ডিতমশাই, রাত্রে বাড়ে?

রাত্রেই বাড়ে মনে হয়।

ওঃ পেয়ে গেছি। স্পঞ্জিয়া থার্টি।

দমকে দমকে কাশি রাত্রে বৃদ্ধি হয়।

স্পঞ্জিয়া থার্টি দিলে আরাম নিশ্চয়।

আমার হোমিওপ্যাথিক অমৃত বইতে লিখে রেখেছি আমি।

বিলু রান্নাঘরে ঢুকে ঢাকনা উঠিয়ে দেখে নেয় কী কী রান্না হয়েছে। দেখলে চারটে আলুর গোল্লা, ডাল, আর একটু দূরে অন্য বাটিতে ঢাকা মামলেট। একটা থালায় নটেশাক কুঁচি করা আছে। বোঝাই যাচ্ছে, রান্না করার সময় পায়নি মা। ডিমের মামলেটটা একটু খুঁটে নেয় বিলু। পাপ হল? ধুর। আত্মাকে কষ্ট দিতে নেই। চম্পা কেবিনে আলুর দম কুড়ি পয়সা প্লেট, ডিমের ওমলেট চল্লিশ পয়সা। ওমলেট না মামলেট? বাড়িতে বলে মামলেট, দোকানে লেখা থাকে ওমলেট। খুঁটে নেয়া ঐ ডিমের টুকরো মুখের মধ্যে চালান করে দেয় বিলু। জলে ভরে ওঠে মুখ। আহা, ময়ূরপঙ্খী ভিড়িয়ে দিয়ে সেথায়, রেখে এলাম তারে...সাত সাগর আর তের নদীর পারে। ফটাফট তেল মেখে নিল বিলু। আজ খেলা আছে, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল। বিলু মোহনবাগান। জার্নেল সিং, রহমন, অরুময়, চুনী গোস্বামী...। ট্রানজিস্টরটা ইস্কুলে নিয়ে যাবে বিলু।

স্বপ্না এসে গেছে স্কুল থেকে। সাদা ফ্রক, সামনের দিকে ঝালর। স্বপ্না হাত-মুখ ধুয়েই রান্নাঘরে যায় এবং সোজা সেই বিচ্ছিন্ন বাটিটার ঢাকনা তোলে, খপ করে তুলে নেয় ডিমের টুকরোটা। বিলুর মুখের সামনে আরতির মতো ঘোরায়। বিলু বলে, এক চড় মারব। স্বপ্না ডিমটা দাঁত দিয়ে কাটে।

বিলু আর স্বপ্নাকে দু'পাশে বসিয়ে অঞ্জলি ভাত খাইয়ে দিত। একটা ডিমের চারভাগের এক ভাগ থাকত থালাটার পাশে। ডাল দিয়ে মাখা ভাত।

www.amarboi.com ~

মায়ের হাত শুধু ডিমটাকে ছুঁয়ে স্বপ্নার মুখে চলে যেত, আর বিলুর মুখে যখন যেত তাতে লেগে থাকত ডিমের শাঁস, ডিমের কুচি, ডিমের গন্ধ। স্বপ্না মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করত। বলতো, আমায় তুমি রান্নাবাটি খেলার মতো মিছিমিছি ডিম দাও, আর ভাইরে দাও সত্যি সত্যি ডিম। অঞ্জলি বলত, থাম। ভ্যানর ভ্যানর করলে একটুও দিমু না। তুই মেয়ে না?

অসীম খেলে এল, পায়ে কাদা। খালধারের যুগোস্লাভ সাহেবদের বল কুড়িয়ে দেবার খেলা। ওরা একটা টেনিস কোর্ট করেছে। ওরা খেলে।

বিলু অসীম আরও সব অনেকে আছে, যারা বল কুড়িয়ে দেয়। ওরা মাঝে মাঝে বলে মোসিসো ও কে চান্দা, কিংবা বলে পিচকোমাতে...। যুগোস্লাভ সাহেবরা সল্টলেকে মাটি ফেলেছে। গঙ্গায় বড় বড় মাটি কাটার জাহাজ। ঐ জাহাজ থেকে জল মিশিয়ে গঙ্গার মাটি পাইপে করে যাচ্ছে লবণ হ্রদে। লাল রঙের ঐ মোটা পাইপের মধ্যে শিরশির, শিরশির। লবণ হ্রদ ভরাট হয়ে চলেছে। অসীম সিঁড়ি দিয়ে উঠছে লাফিয়ে লাফিয়ে। বলছে নরঃ নরৌ নরাঃ। বেঞ্চির উপর দাঁড়া। ফলম ফলে ফলানি, বেঞ্চির উপর দাঁড়াবনি।

স্কুল স্ট্রাইক। ছনি মনি গেটে দাঁড়িয়ে আছে, ঢুকতে দিচ্ছে না কাউকে। ছনি মনি দুই ভাই যমজ। হেভি মোটা। চাঁদিদা বক্তৃতা দিচ্ছে—ট্রামে বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ ট্রাম-শ্রমিকরাও পথে নেমেছেন। ট্রাম-শ্রমিকরা ধর্মঘট করছেন। গতকাল ছাত্র মিছিলের উপর পুলিস লাঠি চালিয়েছে নৃশংসভাবে। বিলু এখন কী করবে? বাড়ি যাবে না। স্কুলের দু'তিনজন আজ ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমায় যাবে। স্কুলের পাঁচিলে পোস্টার মারা তিন দেবীয়াঁ। ব্র্যাকেটে বড় হাতের এ। দেবানন্দ, নন্দা, কল্পনা, সিমি। বিলু এখন বাড়ি যাবে না। কোথায় যাবে বিলু? কয়েকটা ছেলে চলল খেলার মাঠে। র‍্যামপার্ট থেকে খেলা দেখবে। বিলু যাবে না। ওর নতুন ট্রানজিস্টার। ট্রানজিস্টারে রিলে শুনবে বিলু। আজ মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা।

নেতাজি বয়েজ ক্লাবের সামনের দেয়ালে খবর কাগজ সাঁটা। বিলু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে খবর কাগজ পড়ে। বসিরহাটের গ্রামে ক্ষুধার্ত নর-নারী কর্তৃক চাউলের লরি লুঠ। মঙ্গল গ্রহের ছবি পাঠাচ্ছে ম্যারিনা। আমেরিকা আরও পঞ্চাশ হাজার সেনা পাঠাল ভিয়েতনামে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে অসীম। অসীম অন্য ইস্কুলে পড়ে। অসীমের স্কুলেও স্ট্রাইক। অসীম খবর কাগজের এক জায়গায় আঙুল তুলে দেখাল। ঐ দ্যাখ বিলু, বিলু দেখল জন্ম নিরোধে লুপ লাগান। লুপ আবার কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসীম খিক খিক করে হাসল। রহস্যের হাসি।

অসীম খুব বাজে বাজে কথা বলে। বলে ব্যাটাছেলে আর মেয়েদের নিয়ে। বিলু বিশ্বাস করেনি। কী সব বিচ্ছিরি কথা। কিন্তু সেদিন যে ইস্কুলে পরাগ মিলন পড়াল, পুংকেশর আর গর্ভকেশর। পুংকেশর যদি গর্ভমুণ্ডের মধ্যে পতিত হয় তবে বীজ তৈরি হয়। এসব তবে কী? গাছেদেরও তো প্রাণ আছে। ফুলেদেরও।

অসীম আবার বলল, বিলু, তুই একটা মদন। চ সিনেমায় যাই। বিলু বলল, পয়সা? অসীম বলল, হলের সামনে চ, শোকেসে ছবি দেখব। জ্যান্ত সিনেমার মরা ছবি। পয়সা লাগে না।

পাঁচমাথার মোড় পেরিয়ে বিলু আর অসীম হাতিবাগানের দিকে যায়। চিত্রা সিনেমায় 'হকিকত'। সৈন্যের পোশাক পরা একজন দাঁড়িয়ে আছে আর একটা মেয়ে কাঁদছে। দর্পণায় 'জিদ্দি'। একটা মেয়ে নাচছে। অসীম বলল, আশা পারেখ। আর ঐ দ্যাখ জয় মুখার্জি। লাইন পড়ে গেছে। পঁয়ষট্টি পয়সার লাইনে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। মিনার হলে 'আকাশ কুসুম'। লোকজন নেই। ফাঁকা। অসীম বলল, বাজে বই। রাধা হলে 'জয়া'। ঘোমটা পরা সন্ধ্যা রায়।

ঘোমটা পরা বৌটি কে সরে এল দ্রুত? মা না? রাস্তা পার হচ্ছে মা। পিছনে যশকাকু। মা দ্রুত পার হয়ে গেল রাস্তা। যশকাকু বলছে, 'কী হল কী হল'? মা এখন এখানে কেন? মা কি অফিসে যায়নি? মায়ের অফিসও কি স্ট্রাইক? যশকাকু মা'র কাঁধে হাত দিয়ে কী যেন বলতে চায়। মা ঝটকায় সরে যায়। অসীম তখনো রবিবার মর্নিং শো-এর ইংরাজি সিনেমার ছবি দেখতে তন্ময় হয়। 'মা' বলে চিৎকার করে ডাকবার জন্য অনেকটা শ্বাসবায়ু গ্রহণ করে বিলু। কিন্তু নিঃশব্দে ছেড়ে দেয় সে বাতাস। সে বাতাসের রঙ যেন কিছুটা কালো। আহ্নিকের সময় প্রণায়াম যেমন। বায়ু গ্রহণ কইরা সে বায়ু কিছুক্ষণ ধারণ করবা। সেই বায়ু ধীরে ধীরে ছাড়বা, আর মনে মনে কল্পনা করবা—এই বায়ুর রঙ কৃষ্ণ বর্ণ। অন্তরের যা কিছু কালিমা এই বায়ুর সহিত নির্গত হইতাছে। দাদু বলেছিল।

অসীম বলল, এবার কোথায় যাবি বিলু?

বিলু বলল, বাড়ি যাব।

দেশবন্ধু পার্কে চল।

কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত দিন ঘাস দেখি না। গাছ দেখি না।

আমি বাড়ি যাব। বিলু বলল।

অশোকনগরে না, আমাদের বাড়ির পিছনে একটা বড় কদমগাছ আছে। বর্ষাকালে ফুলে ফুলে ভইরা যায়। গাছতলায় কী সুগন্ধ। দেশবন্ধু পার্কে কদমগাছ আছে। অসীম বলল।

আমার কদমগাছে দরকার নেই।

বস্তুত বিলু কদমগাছ ও কদমফুল ঠিকঠাক চেনেই না। কদমফুল সম্পর্কে বিলুর যেটুকু ধারণা হয়েছে তা হল, বিরামের দোকান থেকে। বাঁধানো ছবিতে গোপিনীর বস্ত্রহরণ।

সর্বস্ব হারায়ে বালা হরিনাম স্মরে।

কদম্বের ডালে বসি হরিলীলা করে।

গাছে ঝুলছে ডেক্রন, ট্রিংকল, শিখাদের যেমন ঝোলে, আর গাছের ডালে গোল গোল বলের মতো হলুদ হলুদ ফুল।

—চ বিলু, কুমারটুলি যাই।

—কেন?

—ঠাকুর গড়া দেখি চ। খুব ভাললাগে আমার।

—এখন আবার কী ঠাকুর।

—কিছু না কিছু আছেই।

—না, যাব না।

—তা হলে গঙ্গার ধারে চ।

—না।

—তা হলে কোথায় যাব?

কী বলবে বিলু? এখন কোথাও যাবার জায়গা নেই বিলুদের। কোনো কাজ নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই।

শেষ পর্যন্ত বিলু একা একা বাড়ি ফিরে আসে।

মোহনবাগান এক গোলে জিতে গেল। তেমন আনন্দ হল না। অসীম মৌলিক আর সীতেশ দাসকে ঢুকতেই দিল না জার্নেল সিং। চুনী কি কাটাল, তবু বিলুর যেন কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

সন্ধের আগেই অঞ্জলি এল। চুল বেয়ে জল পড়ছে। ছাতাটা মেলে দিয়ে ঘরের কোণাটায় রাখল। অনঙ্গমোহন একটা জলচৌকির উপরে কিছু একটা লিখছিলেন। কাগজটা খোলাই রেখে অন্য একটা বই থেকে কিছু একটা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজছিলেন। ছাতা থেকে ঐ খোলা কাগজের উপর জল পড়ল। সমীপেষুর মুর্ধন্য-ষ-এর উপর জলের ফোঁটা পড়ল। আনন্দবাজারের 'আ' গেল লেপ্টে। তখন অনঙ্গমোহন ইটা কি করলা ইটা কি করলা করতে করতে ছাতাটার গায়ে ধাক্কা মারেন। দুর্বল ছাতাটা উল্টে যায়, ডাঁটিটা উপরের দিকে। অঞ্জলি কিচ্ছু বলে না। অন্যদিন হলে এ নিয়ে একটা ছোটখাটো ঝগড়া শুরু হয়ে যেত। অঞ্জলি ছাতাটা সরিয়ে রাখে। বিলু একাকী জানালার ধারে বসে ছিল। বটের পাতাগুলি জানালার শিকের কাছাকাছি এসে গেছে। বৃষ্টিধোয়া পাতাগুলি উজ্জ্বল সবুজ। বিলু ওর মায়ের দিকে সোজাসুজি তাকাল না। অনঙ্গমোহন তাঁর লেখা কাগজটার দিকে তাকালেন। বিলুকে বললেন, দেখছ নি, ইশ। আবার লিখতে হইব। তারপর গলাটা একটু নামিয়ে প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলেন—কিছু তো কওন যাইব না।

অন্যদিন অফিস থেকে ফিরে অঞ্জলি যা যা করতে হয়, আজ তাই তাই করছিল না। তক্তপোশের কোণায় মাথাটা কিছুক্ষণ টিপে ধরে বসে ছিল। অঞ্জলি এলে অনঙ্গমোহন চা পান। আজ সে রকম লক্ষণ দেখতে না পেয়ে বিলুকে বললেন—একটা চিঠি লিখতাছিলাম আনন্দবাজারে। শুন।

সম্পাদক সমীপেষু। দীর্ঘদিন যাবৎ লক্ষ্য করিতেছি যে, আপনারা বাঙ্গালা ভাষা লইয়া কদাচার করিতেছেন। সন্ধি সমাস প্রত্যয় ইত্যাদির মূল সূত্রগুলি মান্য করিতেছেন না, যথেচ্ছ বানান লিখিতেছেন। গতকল্য ভাণ্ডারকে লিখিলেন ভান্ডার। অজ্ঞান না লিখিয়া অগ্‌গান লিখিলেন। চঞ্চলের স্থলে চনচল, লন্ডনকে লনডন ইত্যদি। কোমলমতি বালকদিগের মনে ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে সন্দেহ নাই।

আপনারা আপনাদের পত্রিকায় কথ্যভাষার প্রয়োগ করিতেছেন। তপোবনে, বনোমধ্যে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বল্কল পরিহিতাবস্থায় দেখিয়া পুলকিত হইয়া বলিয়াছিলেন, কিমিব হি মধুরাণা মণ্ডনং নাকৃতীনাম। কিন্তু পরবর্তীকালে শকুন্তলা যখন রাজঅন্তঃপুরে ছিলেন, দুষ্মন্ত তাহাকে বল্কল পরিতে দেন নাই। বল্কলে স্বাভাবিক শোভা প্রকাশ পায় সত্যকথা, কিন্তু তাহাতে মর্যাদা হানি হয়।

অঞ্জলি বিলুর সামনে এসে দাঁড়াল। বিলু একবার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নিল। অঞ্জলি বিলুর মাথায় একবার হাত দিল। সামান্য বিলি কেটে দিল চুলে। তারপর বলল, আজ একবছর হল। চাকরির।

বিলু ওর মায়ের মুখের দিকে পরিপূর্ণ তাকাল একবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঞ্জলির মুখে মেঘ।

অঞ্জলি বলল, দশ টাকা মায়না বাড়ল।

মাইনে বাড়লে কেউ কাঁদে নাকি? অথচ মায়ের চোখের কোণায় টলটল করছে ওটা জল না? লালুভুলু বইতে অনেকদিন পর লালু আর ভুলুর দেখা হলে ওরা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কী কান্না। খুব আনন্দ হলেও তো মানুষ কাঁদে।

—মাইনে বাড়াতে তোমার খুব আনন্দ হয়েছে, না মা?

ঠিক তক্ষুণি হু হু কেঁদে ওঠে অঞ্জলি। অনঙ্গমোহনের চিঠির উপরে, অন্তঃপুরের বিসর্গটার উপর টপ করে একফোঁটা জল পড়ে যায়। অঞ্জলি ঘর ছেড়ে চলে যায় দ্রুত। ব্যাপারটা কেন এরকম হল বিলু কিছুই বুঝতে পারে না। অনঙ্গমোহন ধ্যাবড়ানো বিসর্গর অশ্রুবারি নিজের চাদরে শুষে নেন। বিসর্গটার মধ্যেই কেমন যেন দুঃখ জড়ানো থাকে—বিলু মাঝে মাঝেই ভাবে। দুঃখ শব্দটার মাঝখানে বিসর্গটা যেন চোখের দু-ফোঁটা জল।

চা নিয়ে এল অঞ্জলি। পরিপূর্ণ বিধবা নারী। অফিসে যাবার হাল্কা ছাপা শাড়িটা পরিবর্তন করে নিয়ে থান চাপিয়ে নিয়েছে। সর্বাঙ্গ ঢাকা কাপড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা হাত, তাতে চায়ের কাপ। চায়ের প্রথম চুমুকটা দিতে এখনো ইতস্তত করেন অনঙ্গমোহন। বাড়িতে চা ঢুকুক অনঙ্গমোহন পছন্দ করতেন না। আমার নাম চা, আমি ম্যালেরিয়া দূর করি ইত্যাদি বিজ্ঞাপনেও ভজেননি অনঙ্গমোহন। জগদীশের মৃত্যুর পর তাই শ্যালক বোবাঠাকুরই তাঁকে চা খেতে অনুরোধ করেছিলেন মূলত খিদে মারার প্রয়োজনে। বাবা আপনার চা, এই উচ্চারণ এবং মেঝেতে কাপটি রাখবার শব্দের মধ্যে এক আশ্চর্য বিষাদ টের পান অনঙ্গমোহন। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু হয়েছে বৌমা? অঞ্জলি বলে, কী আবার হবে। এক বছর হল চাকরির। দশ টাকা মাইনে বাড়ল। আপনার সুবিধে হল আর একটু। আপনার এই টোলে আর একটা কাউকে ধরে নিয়ে আসুন। ছাত্র বাড়ান।

অঞ্জলি বিলুকে একটা টাকা দেয়। বলে যা বিলু, সন্দেশ নিয়ে আয়, সন্দেশ। বাড়ির সবাইকে সন্দেশ খাওয়াই। অন্য কিছু আনিস না, সন্দেশই। সন্দেশ নাকি উঠে যাবে শুনছি। একটু থেমে অঞ্জলি বলে, অফিসেও আজ সন্দেশ খাইয়েছি। হাতিবাগানে এসেছিলাম মিষ্টি কিনতে। বুঝলি বিলু, সবাই এমন করে ধরল যে, সন্দেশ উঠে যাচ্ছে সন্দেশ খাওয়াও, সন্দেশ খাওয়াও...হঠাৎ যেন হালকা হয়ে উঠল বিলুর মনটা। যেন হঠাৎ ওড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৬৬ www.amarboi.com ~

আনন্দবাতাসে এঁটো শালপাতা নেচে ওঠে গলির রাস্তায়। বিলু বলল, ও, বুঝেছি মা, বুঝেছি, তুমি হাতিবাগানে মিষ্টি কিনতে গিয়েছিলে তখন।

ও, তুই দেখেছিলি? তুই কেন গিয়েছিলি হাতিবাগান?

—এমনি। ইস্কুল স্ট্রাইক। অসীম বলল, চ ঘুরে আসি।

—কোথায় কী মিষ্টি পাওয়া যায় আমি তার কী চিনি ক? তাই যশবাবু সঙ্গে আসল।

চু যাব চরণে যাব রাক্ষসটার মাথা খাব, চু যাব চরণে যাব রাক্ষসটার মাথা খাব...বিলু ধায়।

খগেনের দোকানে বেগুনি ভাজছে। আঃ, কী গন্ধ বাতাসে। বেগুনিগুলো গরম তেলের মধ্যে কী হুড়োহুড়ি লাগিয়েছে যেন ইস্কুলের টিপিনবেলা। কতদিন এসব খায়নি বিলু। পৈতের পর এক বছর বাইরের জিনিস খাওয়া মানা। স্কুলে যেদিন গৌরের কাছ থেকে দশ নয়ার ঘুগনি নিয়ে যাচ্ছিল, পণ্ডিত স্যার দেখেই বলেছিলেন, এই যে বিপ্লব, অনঙ্গপণ্ডিতের নাতি, তোমারও এই অবস্থা? এইসব অখাদ্য খাও? সেদিন উপনয়ন হয়েছে না? একটাকায় আটখানা সন্দেশ হয়, তবে কি একজনের দুটো করে? কিন্তু ওরা তো পাঁচজন। দাদু, মা, স্বপ্না, বিলু আর অসীম। তা হলে কী করে কুলোবে? তবে কি অসীমকে দেবে না মা? তাহলে আবার তো সেদিনের মতো হবে। মাছ কম ছিল বলে অসীমকে দেয়নি অঞ্জলি, স্বপ্না আর বিলুকে দিয়েছিল, অনঙ্গমোহন এর পরদিন অন্নগ্রহণ করেননি। তাহলে হয়তো মা-ই খাবে না। বিলু ভাবে। মা তো অফিসেই খেয়েছে। বরং নাই খাক। বিলু খাবে না। সন্দেশ দেখলেই সেই বাবার কথা মনে পড়ে। হাত থেকে সন্দেশ পড়ে যাওয়া মনে পড়ে। কিন্তু খাব না বললেই কি অঞ্জলি শুনবে? তার চেয়ে অন্য এক কাজ করা যাক। বিলু মনে মনে অন্য বুদ্ধি করে। ও বেগুনি খাবে চার আনার। আর বারো আনার বোঁদে। ছটা সন্দেশের পরিবর্তে বোঁদে হলে ভাল। নিয়ে যাবে। বাড়িতে বলবে, ওর ভাগেরটা ও দোকানেই খেয়ে এসেছে। টেস্ট করে দেখতে হয় না বুঝি, জিনিসটা ভাল কি না? বিরামের দোকানে অনেক বাঁধানো ছবি আছে। নরকের শাস্তির ছবিতে পরস্ত্রী রমণের আর পরপুরুষ গমনের শাস্তি দুটো সবচেয়ে অসভ্য। অসীম বোধহয় ঠিকই বলে। কিন্তু মিথ্যা করার শাস্তিটাও কম কী? জিভ টেনে ধরে ছুরি দিয়ে কেটে দিচ্ছে। জীবনে কম মিথ্যে বলেনি বিলু, আজ একটু পরেই আর একটা মিথ্যা কথা বলবে। সমস্ত মিথ্যা কথাগুলো একসঙ্গে হয়ে শাস্তি হয়। সব গ্যাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফালতু। এসব কিস্‌সু নেই। স্বর্গ, নরক কিস্‌সু নেই। ঠাকুরও কি আছে? ভগবান?

বিলুর বাবার অসুখের সময় কতবার ভগবানকে ডেকেছে বিলু তার ঠিক নেই। মহাদেব কৃষ্ণ, বাগবাজার ঘাটের জগন্নাথ, শেতলা, কাউকে বাদ রাখেনি। শেষে যখন হিক্কা শুরু হল, তখন ব্যোমকালী তলায় গিয়ে মা কালীকে সোজাসুজি এবং স্পষ্টভাবে বলে দিল, দেখ মা কালী, তুমি আমার বাবাকে বাঁচিয়ে দাও। যদি বাবা বেঁচে যায়, তাহলে বুঝব আছ, তুমি সত্য। আর যদি বাবা মরে যায় তাহলে তুমি নেই।

বিরামের দোকান থেকে সন্দেশ কিনে খগেনের দোকানে আসে। চার আনায় পাঁচটা বেগুনি। খগেনের দোকানে তখনো বেগুনি ভাজা চলছে। বিলু ফুটন্ত তেলে বেগুনির লীলাখেলা দেখে। খগেনের কর্মচারী ওর নিজস্ব বাংলায় বলল, তবে পণ্ডিতমশাইয়ের নাতি অছন্তি না?

বিলু মাথা নাড়ায়।

তাংকর দেহটা কেমতি আছে ম?

দেহটা?

শরীরটা। সকালবেড়ে গঙ্গায় আমরা একসঙ্গে স্নান করি। আমিও ব্রাহ্মণ অছি না? তমার দাদু দু'দিন আসে নাহি।

—ঠিকই বলেছেন। দাদুর একটু জ্বর জ্বর ছিল।

—সেই আমি ভাবথিলি। তমার পিতামহটা বড় পণ্ডিত ম।

বিলু চুপ করে থাকে।

তোমার উপনয়ন হল না দুই মাস পূর্বে?

হ্যাঁ।

ভল ভল। তোমরা বড় ব্রাহ্মণ বংশ।

বিলু চুপ করে থাকে।

এখন কি নিবে?

বেগুনি। পাঁচটা।

কে খাবে?

বিলু চুপ করে থাকে। সত্যিই তো, কে খাবে বেগুনি? বিলুর দাদু তো মহাপণ্ডিত, দোকানের ভাজাভুজি খান না। বিলুর মা তো ব্রাহ্মণ বিধবা, আর বিলুর তো উপনয়ন হয়েছে।

বিলু বলল, দিদি খাবে আর দিদির বন্ধু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৬৮ www.amarboi.com ~

পাঁচটা বেগুনি আছে ঠোঙায়। এখানে খাওয়া চলবে না। রাস্তায় খেতে খেতে যাবে। খুব সাবধানে খেতে হবে যেন চেনা কেউ দেখে না ফেলে।

দাদু আসছে না? দাদুই তো। তাড়াতাড়ি বেগুনির ঠোঙাটা পকেটে ঢোকাল বিলু। ওর উরুতে তাপ লাগছে। দ্রুত পা চালাল বিলু। অনঙ্গমোহন সামনে এসে পড়েছেন। বিলু পাশ কাটিয়ে এগোতে গেল। অনঙ্গমোহন বললেন—বিলু, অসীমরে দেখছস? বিলু মাথা নাড়ায়। অনঙ্গমোহন বলেন, কুষ্মাণ্ডটা এখনও আসে নাই ঘরে। বিলু এগোয়। অনঙ্গমোহন ডাকেন বিলুরে, বিলু দাঁড়া। তারপর গলাটা নামিয়ে বলেন, সন্দেশ অসীমের জন্যও রাখিস। আমি একটু দেইখ্যা আসি, নচ্ছারটা গেছে কোথায়। বোধহয় সাহেবদের লগে খেলতাছে। বিলু বাড়িতে ঢুকল। সিঁড়ির মুখেই কলঘর। কলঘরে ঢুকেই ছিটকিনি বন্ধ করল বিলু।

পরদিন সকালবেলায় বাড়িতে হুলুস্থুল কাণ্ড। শিখার বাবা চেঁচামিচি শুরু করে দিয়েছে—আমি যত বলি কলঘর চাবি দেওয়া থাক, চাবি দেওয়া থাক, আমার কথা কেউ শোনে না এখনও। বস্তির ছোটলোকগুলো যখন-তখন বাথরুমে ঢোকে, নোংরা করে যায়। এখন কী কেলেঙ্কারি কাণ্ড। পণ্ডিতমশাই তো গঙ্গা নাইতে যান, আর অন্য একজন তো চ্যানই করে না, এদিকে আমার তো আপিস আছে, সাড়ে নটায় বেরুতে হবে।

অনঙ্গমোহন ততক্ষণে গঙ্গাস্নান সেরে নামাবলী গায়ে আহ্নিকে বসেছিলেন, শিখার বাবা এসে বলল, পণ্ডিতমশাই, বাথরুমের চৌবাচ্চায় বস্তির কোনো ছেলে হেগে রেখে গ্যাচে, এখন ব্যবস্থা করুন।

অনঙ্গমোহন জলশুদ্ধি আসনশুদ্ধি করে সব শন্ন আপ ধন্বন্যাঃ শুরু করেছিলেন, ঠিক সেই সময় সব শুনে মন্ত্র থামালেন।

ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কলে জল আসে। শিখার বাবার বহুদিনের অভ্যেস, ভোরে উঠে সদ্য আসা কলের জলে দাঁত মেজে নেন। তারপর কলের জলে বসে স্নান করে নেন। তার একটা ছড়া আছে, বলেন মাঝে মাঝে।

গঙ্গায় নায় পাপীতাপী
পুকুরে নায় চোর
কলের জলে চ্যান করে যে
তার বহু পুণ্যের জোর।

স্নান সেরে চৌবাচ্চার পাইপটা কলের মুখে লাগিয়ে দেন। আজ পাইপটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগাতে গিয়ে দেখলেন এই ব্যাপার।

বিলু চুপ করে ছিল। একদম চুপচাপ। বিলু সাতেও নেই পাঁচেও নেই। অসীম বোধহয় জমাদার ডাকতে চলে গেছে। বিলু বই খুলে বসল। টোলের বই। বিলুও গত মাসে অনঙ্গমোহনের টোলে ভর্তি হয়ে গেছে। সকালবেলায় আধঘণ্টা টোলের পড়া করে নিয়ে স্কুলের পড়া করে। বিলু খাতা খুলে অত্র চতুর্দশাদৌ স্বরাঃ, এইসব পড়ছে। অনঙ্গমোহন আবার আহ্নিক শুরু করেছেন, বিলু পড়ছে তেষাং...দ্বৌ...তেষাং দ্বৌ তেষায় দাবনোস্য সার্বর্ণ। অনঙ্গমোহন ছিপকাষায় ঠং শব্দ করে বিলুর দিকে চোখ পাকালেন। ভুল পড় ক্যান, ঠিক কইরা পড়। তেষায় দ্বৌ দ্বারন্যোন্যস্য সার্বনৌ। বিলু ঠিক পড়বে কি। বিলুর কি মনে আছে? মন কি থাকতে পারে এ খাতায়? ওসব যে কার কীর্তি বিলু কি জানে না?

গতকাল বেগুনি নিয়ে কলঘরে ঢুকেছিল বিলু। পকেট থেকে বার করেছিল ঠোঙাটা। বেগুনি তখনো যথেষ্ট গরম ছিল। একটা বার করে কামড়াল। একটু ফুঁ দিল। ধোঁয়াময় হাওয়া বের হল। হাওয়ায় সুগন্ধ। একটু একটু করে খাচ্ছিল বিলু। যেন শেষ না হয়ে যায়। এমন সময় কলঘরে করাঘাত।

কে?

অনঙ্গমোহনের কণ্ঠস্বর। আমি। একটু খোল। পদপ্রক্ষালন কইরা যাই।

বিলু, তৎক্ষণাৎ বাকি বেগুনি চারটে চৌবাচ্চার জলে ফেলে দেয়। তারপর মুখের অর্ধচর্বিত বাকিটা জল দিয়ে গিলে নেয়। দরজা খোলে।

অসীমরে পাইছি। বেশ গর্বের সঙ্গেই বলেন, ঐ গোরা সাহেবগুলির সঙ্গে ক্রীড়া করতাছিল। বিলু বোঁদের ঠোঙাটা নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। অনঙ্গমোহন বলেছিলেন—তুই এতক্ষণ কী করতাছিলি? বিলু সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে যেতে বলেছিল—মুখ হাত ধুচ্ছিলাম।

কলঘরে এমনিতেই আলো কম থাকে, ছোট একটা জানালা। জমাদার জিজ্ঞাসা করল, টর্চ আছে? শিখার বাবার টর্চ ছিল। জমাদারের হাতে কেন দেবে টর্চ? তাই চুপ করে ছিল। জমাদার ভাল করে চৌবাচ্চাটা দেখল। চৌবাচ্চার জল প্রায় শেষ। তলার দিকে যা ভাসছে তা ভাল করে দেখে বলল, লাগতা হায়, টাট্টি উট্টি নেহি হায়। চৌবাচ্চার তলায় গোঁজা ন্যাকড়া টেনে জল বার করে দিল, তারপর তলা থেকে বার করে আনল ফুলেফেঁপে থাকা চারটি বেগুনি।

অঞ্জলির সে কী হাসি। বিলুকে জড়িয়ে ধরল চুপি চুপি। অনেকদিন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক অনেক দিন পর। বলল দুষ্টু ছেলে।

মায়েরা কী করে সব বোঝে?

ছয়

সাইরেন বেজে উঠল।

একটা মহড়া। বিমান আক্রমণ ঘটতে পারে। স্কুলের মাঠে, পার্কে, লম্বা লম্বা গর্ত খোঁড়া হয়েছে, এর নাম হল ট্রেঞ্চ। বোমা পড়লে এর ভিতরে ঢুকে যেতে হবে। এর ভিতরে ঢুকে সেদিন সিগারেট টেনেছিল অসীম। স্কুলের গেটের সামনে বালির বস্তা ডাঁই করা। গতকাল ব্ল্যাক-আউট হল। হেভি লাগল বিলুর। সারা কলকাতা অন্ধকার। কোনো বাড়িতে আলো নেই, রাস্তায় আলো নেই। ঘুটঘুটি কালোর মধ্যে দু-একটা গাড়ি চলছে। টিমটিমে আলো জ্বালিয়ে। হেডলাইটের অর্ধেকটা কালো রঙ। দু'দিন আগে অমৃতসরের কাছে পাকিস্তান বোম ফেলে গেছে। ছাম্ব-এ এরোপ্লেনে এরোপ্লেনে লড়াই। কলকাতায় বোম পড়লে বেশ মজা হয়।

আজ ক'দিন ধরে সকালবেলা অনঙ্গমোহন বিলুকে খবর কাগজ কিনবার জন্য পয়সা দিচ্ছেন। আজ সেপ্টেম্বরের চার তারিখ। ঊনিশশো পঁয়ষট্টি সাল।

অনঙ্গমোহন আবার বললেন, বাপের ব্যাটা।

কে?

কে আবার, লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

অনঙ্গমোহন বললেন, যত মূর্খের দল।

কে?

যারা কয় সংস্কৃতে কিছু নাই।

কেন?

লালবাহাদুর তো সংস্কৃতজ্ঞ। ঐ সব বিএসসি, বিকম নয়। শাস্ত্রী। দেখ বিলু, শাস্ত্রীও বীর হয়। পণ্ডিতরাও বিক্রমশালী হয়।

পাকিস্তান সাবধান। সেনা গুটাও—নচেৎ উচিত শিক্ষা দিব। লালবাহাদুর শাস্ত্রী। এই এতদিনে একজন দেশনেতা পাইলাম। পাক অধিকৃত কাশ্মীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দখলের অধিকার ভারতের আছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

এই জন্য পুরা দায়ী জওহরলাল। প্যাটেল আছিল ব্যাঘ্রশাবক। কাশ্মীরে যুদ্ধ কইরা হানাদার তাড়াইয়া দিতে ছিল, জওহরলাল চিৎকার পাড়ল, যুদ্ধ থামাও, যুদ্ধ থামাও।

এবার আমি যুদ্ধে চললাম। অঞ্জলি বলল। আজ মাছ আছে। দিদি স্কুল থেকে এসে যেন ভাত না খায়। ভাতে টান আজ। অঞ্জলির গা থেকে পাউডারের গন্ধ পেতেই অনঙ্গমোহন নাসিকা কুঞ্চন করলেন। বিধবা বৌ প্রসাধনও করছে?

অনঙ্গমোহন আবার কাগজের দিকে চোখ রাখেন। আকাশ যুদ্ধে দুইখানি পাক জেট বিমান ধ্বংস। টিথওয়াল, উরি প্রভৃতি জঙ্গলে ভারতীয় সৈন্যের অগ্রগতি। খিলখিল হাসির শব্দ শোনা গেল।

সুমিতার গলা না? অনঙ্গমোহন খবরের কাগজ থেকে চোখ তুললেন।

অজিতবাবু তো সকালে গান শেখান না। তবে সুমিতা আজ কেন ও-ঘরে? অনঙ্গমোহন কান খাড়া রাখেন।

তাহলে তোমার ব্ল্যাক-আউট ভালই লাগে বলছ, অ্যাঁ? অজিতবাবুর গলা শুনতে পান অনঙ্গমোহন। সুমিতা আবার হাসে।

বুঝলে সুমিতা, এ রকম ব্ল্যাক-আউট হতে থাকলে আর দশ মাস পরে দেশের পপুলেশন বেড়ে যাবে মনে হচ্ছে। অজিতবাবুর গলা, পাশের বারান্দায়। অজিতবাবু এখনো অফিসে যাননি তাহলে। অজিতবাবুর স্ত্রী-ও দু'দিন ধরে বাড়িতে নেই। তার ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশনে বারুইপুর গেছেন, অনঙ্গমোহনের কাছে বারবেলা জানতে এসেছিলেন উনি।

বোম পড়বে নাকি কলকাতায়? গুনে বলুন দেখি। সুমিতা এল। অনঙ্গমোহন সুমিতার দিকে চেয়ে একটু যেন কপাল কুঁচকোলেন। আজ সুমিতা যেন-বা কিছুটা উগ্রা। আলুলায়িত কুন্তল, বিলোল নেত্রা, লীলায়িত গাত্রভঙ্গ, চ্যুত বসনাঞ্চল, যেন ঈষৎ ন্যুব্জ। মন্দগতি।

অনঙ্গমোহন কপাল কুঁচকেই বললেন, আমি নক্ষত্রযাজক জ্যোতিষী না, আমি অধ্যাপক। কথার ঝাঁঝটা যেন সুমিতা বুঝতে পারল। একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—না, না, এমনি বলছিলাম। শিখার বাবা উঁকি মারলেন ঘরে। বললেন, শোন সুমিতা। তা হলে ঐ কথাই রইল। যুদ্ধ চলছে। এখন দেশপ্রেমের গান। আর দেরি নয়, ধরগো তোরা হাতে হাতে খড়গ—নেক্সট ডে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুমিতা বলল—আজ তাহলে বেণীসংহার পড়া যাক।

অনঙ্গমোহন বললেন, থাক।

তা হলে মেঘদূতম্। আকাশটাও বেশ মেঘলা মেঘলা।

অনঙ্গমোহন বললেন, বৃথা বৃষ্টি সমুদ্রে চ বৃথা তৃপ্তেষু ভোজনং।

কেন এ কথা বলছেন পণ্ডিতমশাই? সুমিতা জিজ্ঞাসা করল।

অনঙ্গমোহন বললেন, মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। মানুষের বন্ধন বা মুক্তির কারণ হইল মন। তারপর অনঙ্গমোহন নিঃশব্দ, নিরুত্তাপ।

কী হল পণ্ডিতমশাই?

আইজ পড়ামু না। আস গিয়া। মন ভাল নাই।

সুমিতা সামান্যক্ষণ চুপ থেকে বলল, আপনার প্রহেলিকাটা বোধহয় হয়ে গেছে।

অনঙ্গমোহন মৃদু হাসলেন। বললেন, শুনি।

সুমিতা বলল—

কৃষ্ণমুখী।

ন মার্জারী।

দ্বি জিহ্বা ন চ সর্পিণী

যো জানতি সঃ পণ্ডিতঃ তাই তো?

অনঙ্গমোহন মাথা নাড়েন।

কলম। কলম। তাই না?

অনঙ্গমোহন হেসে ওঠেন। মনটা তরল হয়ে যায় অনঙ্গমোহনের।

—তা হলে আমিও পণ্ডিত। ঐ যে যো জানতি সঃ পণ্ডিতঃ।

—হ্যাঁ, তুমিও পণ্ডিত, দু'দিন পরে উপাধি পরীক্ষা পাস করবা। কাব্যতীর্থ হইবা...

কাব্যতীর্থ না হলে বুঝি পণ্ডিত হয় না? মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রাবৎ দেখলেও তো পণ্ডিত হয়।

—সে তো ঠিকই, পণ্ডিত তো কত রকমেই হয়। আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি। স পণ্ডিতঃ।

—এবার আমি আপনাকে একটু আত্মবৎ দেখব পণ্ডিতমশাই। সামনে শীত আসছে। আপনার কষ্ট হয় খুব। সোয়েটারটা নিতেই হবে।

—ঐ সোয়েটারটা? যেটা গতবারে বানাইয়াছিলা?

হু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে তর্ক তো মীমাংসা হইয়াই গেছে গত বছরেই। ঐ সব পরুম না আমি। একটা চাদরই যথেষ্ট আমার।

কিন্তু এখন তো গরম-জামা, সোয়েটার এইসব পণ্ডিতরাই পরছে।

ওরা পণ্ডিত নয়। অং বং করলে পণ্ডিত হয় না। তবে একটা প্রস্তাব বলি শুন। এক মূর্খ জামাইয়ের সঙ্গে এক পণ্ডিত-কন্যার বিবাহ হইছে। দ্বিরাগমনে জামাই সপত্নীক শ্বশুরালয়ে আইতাছে। জামাই বড় ভীত। মনে শঙ্কা। না জানি শ্বশুর কী কইবে, আবার কী প্রশ্ন করবে, না জানি সর্বসমক্ষে অপমানিত হইবে, এইসব ভাবতে ভাবতে জামাই শ্বশুরবাড়ি ঢুকল। ঢুইক্যা শ্বশুররে নমস্কার কইরাই ভিতরের ঘরে চৌকির তলে লুকাইল। একটু পরে শাশুড়ি তো মুড়ি-নাড়ু লইয়া জামাই খোঁজে, জামাইরে তো কুত্রাপি পায় না। তখন ভাবল, বাইরে-টাইরে গেছে বোধহয়। কিন্তু পণ্ডিত-কন্যাটি তো দেইখ্যা ফালাইছিল, তার স্বামী কোন্ চৌকির তলে ফাঁদাইছে। কন্যাটি গোপনে চৌকির তলে ঢুইক্যা কইল—শুন প্রাণনাথ, বাইরে আস। সংস্কৃত ভাষা কঠিন কী। আমরা যে রকম কথা কই, তার মইধ্যে মাঝে মাঝে অনুস্বার বসাইয়া দিও। জামাইটি নিশ্চিন্ত হইয়া কইল—অনুস্বার দিলেই যদি সংস্কৃত হয়েং তবে কেন চৌকির তলে রয়েং। এই হইল জামাইয়ের মুখনিঃসৃত প্রথম সংস্কৃত শ্লোক। হংস মিথুনের হত্যা দুঃখে যে রকমভাবে বাল্মীকির মনে প্রথম শ্লোকটির উদয় হয়েছিল? সুমিতা বলল। তখন অনঙ্গমোহন হেসে উঠলেন। এই সময় সুমিতা বলল দেখলেন আচার্যদেব, যুধিষ্ঠির কী রকম রাইট কথা বলেছিল। বক জিজ্ঞাসা করেছিল, সবচেয়ে দ্রুতগামী কী? যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, মন। কিছুক্ষণ আগেই আপনার মন খারাপ ছিল, আর এখন কেমন উৎফুল্ল।

অনঙ্গমোহন বললেন, মন বড় আশ্চর্য বস্তু। বস্তু নাকি অবস্তু কি জানি? নাকি সূক্ষ্ম জড়। পাণিনি ব্যাকরণে মন সম্পর্কিত এক কুটাভাস আছে।

নপুংসকামিতি জ্ঞাত্বা প্রিয়ায়ৈ প্রেষিতং মনঃ।

মনস্তু রমতে তত্র হতাঃ পাণিনীয়া বয়ম।

অর্থ বুঝলানি গো তুমি? মনকে ক্লীবলিঙ্গ জানিয়া স্ত্রীর নিকট পাঠাইলাম, অথচ দেখি মনটি স্ত্রীর সহিত রমণ করতাছে।

সুমিতা হাসি চাপল, হাসি চাপতে গিয়ে দেহে ঢেউ উঠল। অনঙ্গমোহন ছোট্ট এক টিপ নস্য গ্রহণ করলেন। নস্যগ্রহণের ভঙ্গিমাটাই বুঝিয়ে দেয় যে তাঁর এখন মেজাজ ভাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলু বলল—একটা গল্প বল দাদু।

অনঙ্গমোহন যেন সংবিত ফিরে পান।

বিলুর সামনে সন্ধিবৃত্তি আর অমরকোষ। পড়তেই এসেছিল বিলু, অনঙ্গমোহন তখন খবর কাগজ পড়ছিলেন। তারপরই সুমিতা এসে যাওয়ায় আর পড়ানোই হয়নি।

অনঙ্গমোহন তখন বলেন, সন্ধিবৃত্তি খোলো বিলু। কাইল কত পর্যন্ত পড়াইছিলাম? উষ্মানঃ শষসহাঃ। বিলু বলে, গল্প বলো না একটা।

অনঙ্গমোহন বলে, অসীম কোথায়?

বিলু বলে, জানি না।

ইস্কুলে যাবি না তোরা? বাজে কয়টা?

সুমিতা হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, দশটা। তবে আর গল্পের কা প্রশ্ন। বেলা হইয়া গেছে গিয়া। ইস্কুলে যাও তোমরা, ইংরাজি ইস্কুলে যাও, তবে একটা সূত্র দেখাইয়া দি, অধ্যয়নহীন দিনযাপন ঠিক নয়।

বিলু বলল, এগারোটায় তো ইস্কুল, সোয়া এগারোটায় গেলেও হয়। বল না গল্প একটা। সুমিতা তখন বলল—ঠিক আছে, আমি বলছি একটা মজার গল্প।

অনঙ্গমোহন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন। গলা চড়িয়ে ডাকতে থাকেন অসীম—অসীম। অসীম বোধহয় কাছেই ছিল। হয়তো বারান্দার দক্ষিণের জানালায়। অসীম ধেয়ে এল। করতাছিলি কী? গর্ভস্রাব?

আমি তো অঙ্ক করছিলাম। এই যে এটা পারছি না। এটা অসীমের একটা প্রিয় কায়দা অনঙ্গমোহন সংস্কৃত নিয়ে আক্রমণ করার আগেই অসীম অঙ্ক বা ইংরাজি নিয়ে আক্রমণ করে। অসীম বলে—খুব কঠিন অঙ্ক পিসামশায়। একটি পুকুরের তলার দৈর্ঘ্য ১০০ ফিট, প্রস্থ ৭০ ফিট, উপরের দৈর্ঘ্য ১৬০ ফিট, প্রস্থ ১৩০ ফিট...

এবার পুকুরটির কালি কত, এই তো, এই তো? অনঙ্গমোহন বললেন।

না কালি না, ক্ষেত্রফল।

যাহা কালি, তাহাই ক্ষেত্রফল।

আপনে এই অঙ্ক পারবেন পিসামশয়?

এ তো পুকুর কালির অঙ্ক। শুভঙ্করের আর্যা আছে।

অনঙ্গমোহন মনে করার চেষ্টা করেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুকুর কালির কথা কহি শুন সবে
দৈর্ঘ্য প্রস্থ দুই দিকে যতেক মাপিবে
একদিকে কাঁচা আরদিকে পাকা হবে...

তারপর—আরও আছে, মনে পড়ে না।

নীলকমলের কাছে পড়ার আগে পাঠশালায় বেণীমাধব মাস্টারের কাছে পড়তেন অনঙ্গমোহন। এক কড়া পোয়া গণ্ডা দুই কড়া আধ গণ্ডা। তেরিজ, শুভঙ্করের কত রকম আর্যা—জমি বিঘা যত তঙ্কা হইবেক দর, তঙ্কা প্রতি ষোল গণ্ডা কাঠা প্রতি দর। কড়িকষা, সোনাকষা, মোকর জমাবন্দির কত রকমের আর্যা, এমন আর্যা ছিল যাতে দইয়ের ভাঁড়ের আয়তন থেকে দইয়ের পরিমাণ বলে দেওয়া যেত। এর নাম ছিল দধিকষা। কায়স্থদের ছেলেরা মন দিয়ে এইসব আর্যা মুখস্থ করত। অনঙ্গমোহন শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, না। কিছুই মনে নাই। তারপর অনঙ্গমোহন বললেন, তবে কও সুমিতা, তুমি প্রস্তাব কইবা বলছিলা।

আসলে অনঙ্গমোহন অসীমকে পড়াশোনার জন্য ডাকেনি আদপেই। সুমিতার গল্পটার জন্য ডাকছিলেন। সুমিতা গল্প বলবে আর বিলু সেটা একা একা শুনে নেবে? সুমিতা গল্পটা বলার আগেই হাসতে লাগল।...সেই পণ্ডিতদের গল্প কিন্তু। একজন পণ্ডিত এক রাজবাড়িতে গেলেন। কাঁধে নিলেন ভাঙা খাটের ভাঙা পায়া, বেশ ভাল করে শালু দিয়ে মুড়িয়ে। রাজার ঘোষণা ছিল, যে রাজপণ্ডিতকে তর্কে পরাজিত করতে পারবে, তাকে প্রাইজ দেওয়া হবে। তা ঐ পণ্ডিতটি জানতেন, রাজপণ্ডিতটি হচ্ছে মূর্খ। আর দেশেও পণ্ডিত নেই, সুতরাং যস্মিন দেশে দ্রুম নাস্তি এড়ণ্ডাপি দ্রুমায়তে। ঐ পণ্ডিত রাজসভায় গেলে রাজা ঐ মোটা জিনিসটা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা কী? পণ্ডিত বললেন—ইহা খট্টাঙ্গ পুরাণ। পুরাণের চতুষ্পাদ। রাজা তো ঘাড় নাড়লেন। এবার রাজার সভাপণ্ডিত এসে প্রথমেই বললেন, গব্য গূঢ়ং। তাই শুনে তো আগন্তুক পণ্ডিতটি চিৎকার করে বললেন, আগেই গব্য গূঢ়ং? প্রথমে গোবর ছড়াং অতঃপর পাতা বিছড়াং, তার পরে তো গব্য গূঢ়ং? অনঙ্গমোহন হাসলেন না। কপাল কুঞ্চন করলেন পুনরায়। মেয়েটি বড় বাচাল। কিন্তু বুদ্ধিমতী। দুই বছর পর একজন উপাধি পরীক্ষা দেবে তাঁর টোল থেকে, সুতরাং ওকে কিছুই না বলে সন্ধিবৃত্তি টেনে নিলেন। ঐ বইটি টানতেই অসীম গাত্রোত্থান করল। বলল, খাই গিয়া, ইস্কুলে যাব। বিলু বলল, আমিও যাব। অনঙ্গমোহন বললেন একটিমাত্র সূত্র। কয়েক পলের মধ্যেই হইয়া যাইব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৭৬ www.amarboi.com ~

গিয়া। আজ বিসর্জনের সূত্র। অঃ ইতি বিসর্জনীয়ঃ। সংস্কৃত ভাষা, অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী স্বরভেদ। পূর্বদিন ঘোষ, অঘোষ, আনুনাসিক, উষ্মবর্ণ ইত্যাদির সূত্র আলোচনা করছিলাম। আইজ বিসর্জনের সূত্র। অঃ ইতি বিসর্জনীয়ঃ। বক্ষের অবশিষ্ট শ্বাসবায়ু বিসর্জিত হয় অঃ এই উচ্চারণে।

উঃ! বেদনার এই অভিব্যক্তি মনে মনে ভাবে বিলু। বিসর্জন। ঠাকুরমা। বাবা।

অনঙ্গমোহন বলেন—অঃ শব্দের অ কার কেবলমাত্র উচ্চারণের জন্য। কেবল বিসর্জনীয় স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয় না। সেহেতু অ কারের পর প্রযুক্ত হইল। ইতিঃ কুমারী স্তন যুগাকৃতির্ব্বর্ণো বিসর্জনীয় সংজ্ঞা ভবতি। কুমারীর দুইটি স্তনাগ্রভাগের ন্যায় বিন্দুরূপ বর্ণ দুইটিকে বিসর্জনীয় বলে। বোঝলা?

বিলুর কান লাল হয়ে যায়। স্তন? উরিববাবা। বাংলা ক্লাসের—বাপের আদর, মায়ের স্নেহ, প্রিয়ার হাসিমুখ বলার সময়েই গতকাল কান লাল হয়ে গিয়েছিল, তোতলাচ্ছিল বিলু। গোপেনবাবু স্যার বলেছিলেন, বেশ পেকেছিস দেখচি। 'নারীর শোভা মমতা বক্ষ আবরণী' এই বিজ্ঞাপনে কিছুটা স্তন দেখেছে, গোয়েন্দা রিপ-এর ডায়নার ছবিতে দেখেছে। কিন্তু স্তনাগ্রভাগ? বিসর্গ চিহ্নের মতো? বাথরুম থেকে স্নান সেরে দ্রুত উঠে আসা শিখার বুকে কি অস্পষ্ট বিসর্গচিহ্ন দেখেছিল বিলু?

অনঙ্গমোহন বললেন, সংস্কৃত টীকায় কদাচ অধিক ও অবান্তর কথা বলা হয় না। কেন কুমারী স্তনযুগের কথা বলা হইল? কী তার কারণ?

সুমিতার মাথা নিচু। বিলু চুপচাপ।

অনঙ্গ বলতে থাকলেন, কুমারী শব্দটি ব্যবহার না কইরা যদি কেবলমাত্র স্তনযুগাকৃতি বর্ণো লেখা হইত, তাইলে বৃদ্ধর স্তন দুইটাও বুঝাইতে পারত। তাইলে বিসর্গ অক্ষরের আকৃতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হইত না। ফোঁটা দুইটা সমান সমান হইবে। একটা বড় কিংবা একটা ছোট নয়। ফোঁটা দুইটা তলায় তলায় হইবে, ঠিক একটার তলায় আরেকটা। একটা এই পাশে একটা ঐ পাশে নয়। বুড়িদের এই রকমই স্তন। সুতরাং শুধুমাত্র স্তনযুগাকৃতির্ব্বর্ণো খাটে না। কুমারী শব্দটা উল্লেখ কইরা দিতে হয়। বোঝলা?

মেশিনের মতো দ্রুত ঘাড় নাড়ে বিলু।

যাও।

স্বপ্না আসে স্কুল থেকে। সাদা পোশাক। বুকের সামনে ঝুলছে ঝালর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলু ওর দিকে তাকাতে পারে না।

বিসর্গ চিহ্নটা শুধুই কি স্তন? আর কিছু নয়? বিসর্গ মানে তো বিসর্জন। বুকে আটকে থাকা শ্বাস বাতাস নিঃশেষ বিসর্জন। বিসর্জনের মধ্যে দুঃখ থাকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে, আর দুঃখের বিসর্গটা তো স্পষ্ট দু'ফোঁটা চোখের জল, বেদনার সব ভাষাতেই বিসর্জন।

স্কুলে যাবার সময় খালধারে, খালধারের পাশ দিয়ে রাস্তা, খালধারের পাশ দিয়ে মোটা পাইপে মাটি যাচ্ছে লবণহ্রদে। এই, এইখানেই ঠাকুরমার বিসর্জন।

বিলু তখন কত ছোট। সবে ভর্তি হয়েছে ক্লাস থ্রি-তে। বিলুর ঠাকুরমা বিলুকে কোলে নিত। বলত, মানিক আমার, কইলজা আমার। আগে গিয়ে বসত আর ঐ খালটার দিকে তাকিয়ে থাকত। বলত, দ্যাশে আমাগোর বাড়িতে সামনেই ঠিক এই রকম খাল আছিল। আমরা ঘরের কাছে নৌকায় উইঠ্যা বাপের বাড়ি নাইয়র যাইতাম, তোর দাদুর ছাত্ররা খালের জলে ছিপ ফালাইয়া জাল ফালাইয়া মাছ ধরত, আর জলের মধ্যে সাঁতার কাটত। আমার ছিল আঠারখান হাঁস। পুকুরে থাকত না অরা। দিন-রাইত থাকত খালের জলে...

আর এই খালের জন্যই বুড়ি মরল। খালের পাড় দিয়ে মোটা লোহার পাইপ সল্টলেক গেলে হবেটা কী, পাইপের ধারে কচুগাছের বড় হয়ে যাওয়া তো সল্টলেক আটকাতে পারছিল না। সুরবালা ছাত থেকে বোধহয় রোজ রোজ কচুগাছের পাতা মেলে ধরা দেখত। পাতার সবুজ দেখত আর ঐ মানকচুর ক্রমশ পুরুষ্টু হয়ে যাওয়া দেখত। উঃ, 'ক্রমশ' কথাটার মধ্যেও আবার সেই বিসর্জন। বুড়ির কি তখন তার দেশের উঠানের কোণার কচুগাছটার কথা মনে পড়ছিল, নাকি তার ছেলে জগদীশের একদিনের তরকারির খরচ বাঁচানোর প্রয়োজনের কথা ভেবেছিল। বুড়ি একদিন ভোরবেলা, খুব ভোরবেলা চুপি চুপি খালধারে নেমে গিয়েছিল। কচুটাকে তুলে নিয়েছিল।

বুড়ির মৃতদেহটা পড়েছিল জলের ধারে। কোমর পর্যন্ত জলের তলায় আর বাকিটা উপরে। একটা অপূর্ণ মানকচু মৃতদেহটার পাশে শুয়ে আছে।

সাপেই কি কেটেছিল সুরবালাকে? গঙ্গার মাটি পাইপে করে সল্টলেক গেলেও বিষাক্ত সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে ঠিক পাইপেরই তলায়।

সুরবালা জলে নেমেছিল কেন? সদ্যতোলা কচুটার কাদামাটি ধুয়ে নিতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুর আগে কচুটাকে সংসারের খাদ্যযোগ্য করে দেবে বলে? নাকি সর্পদংশনের জ্বালায় জলে নেমেছিল? জানা যায়নি।

সেই দেহটাকে মনে পড়ে বিলুর। ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া রঙ, বুকে আঁচল নেই, যে বুকের আশ্রয়ে আদরে আর আবদারে মুখ লুকোত বিলু, সেই আলুলায়িত আঁচলহারা দুই স্তন, বিসর্গচিহ্নের মতো স্পষ্টতই ঘন সংঘবদ্ধ নয়, বিসর্জন।

সুরবালার মৃত্যুর পরও পণ্ডিতি তর্ক কম হয়নি। তারাদাস স্মৃতিতীর্থ বললেন, আত্মঘাতিনী নয় তো? আত্মঘাতিনী হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অনঙ্গমোহন বলেছিলেন, আত্মহননের ইচ্ছা হলে কেউ মানকচু পরিষ্কার করতে জলে নামে না। তবে কি জলই মৃত্যুর কারণ? কামাখ্যা পুরোহিত বলেছিলেন, জল কেন? স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, সর্পাঘাতই মৃত্যুর কারণ। তারাদাস বলেছিলেন—সর্পাঘাত অনুমান মাত্র। ধূম দেখলে অগ্নির অস্তিত্ব বোঝা যায়। কিন্তু সর্প দেখা যায় নাই। মৃত্যু সত্য, কিন্তু সর্প সত্য নাও হতে পারে। মৃত্যুর কারণ যে সর্পই তার প্রমাণ কী? প্রমাণাভাবে প্রায়শ্চিত্তই বিধেয়। ভিড়ের মধ্যে কে একজন বলেছিল—পক্ষাঘাতে কেন—হার্ট অ্যাটাক হতে পারে না বুঝি?

তারাদাস বলেছিলেন, ইংরাজি হতে যাহা হার্ট অ্যাটাক, তাহাই পক্ষাঘাত।

অনঙ্গমোহন বলেছিলেন, প্রায়শ্চিত্ত অর্থ তো কিছু অর্থদণ্ড। তারাদাস বলেছিলেন, তুমি স্ত্রী বিয়োগে উন্মাদ-প্রায় হইছ অনঙ্গভাই। তাই এরকম শাস্ত্র-বিরোধী কথা বল।

অনঙ্গমোহন রাগত স্বরে বললেন, আমি স্মৃতি বিশারদ নই। আমি অধ্যাপক। তোমরাই বল, আমার করণীয় কী? তারাদাস বললেন, এই মৃত্যু যে জলের ভিতরে হয় নাই—তার প্রমাণ কী? মৃত্যুর কারণ যদি জল হয়, তার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা।

অনঙ্গমোহন বললেন, বড় ভ্যান ভ্যান করতাছ তোমরা। জলে ডুইব্যা মরলে কি জলের উপরে থাকত দেহ? চার্বাক ব্যাটা ঠিক কথা কইছে। বুদ্ধিহীনানাং জীবিকা হইল এইসব প্রেতকার্যাদি।

বাপরে। স্ত্রী বিয়োগে কম্যুনিস্ট হইয়া গেলা দেখি। মোছলমানেও প্রেতকার্য করে। তুমি যদি প্রেতকার্যাদি না করতে চাও না কর।

কী করতে হইব আমার, হেইডানি কইবা। কামাখ্যা পুরোহিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন—যাই কও অনঙ্গভাই, এইটা অপঘাত মৃত্যু সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই। পক্ষাঘাতেই হোক, জলজনিত মৃত্যুই হোক, সর্পদংশনই হোক আর খালপাড়ের ডাঙায় পতনের কারণেই হোক, তিন দিন অশৌচ, আর প্রায়শ্চিত্ত। কারণ পক্ষিমৎস্যমৃগর্মে তু দংষ্ট্রিশৃঙ্গিনখৈহর্তা...তারপর কী যেন? বাকিটা তারাদাস বলে দিলেন।

কামাখ্যা বললেন, পক্ষী, মৎস্য, দংষ্ট্রা, শৃঙ্গী বা নখী দ্বারা হত, পতন, বজ্র, অগ্নি, বিষ বা জল দ্বারা...

অনঙ্গমোহন বললেন, আমারে আর বাংলায় তর্জমা কইরা দিতে হইব না। সংস্কৃত জানি। প্রায়শ্চিত্ত করতে হইব, এইত কথা? কামাখ্যা বলেছিলেন, সবই মা কালীর ইচ্ছা।

সাত

মা কালীর কাছে মানত ছিল সুরবালার, সে অনেকদিন আগে। বিলু তখন খুব ছোট। দু'বছরের বিলুর ডিপথেরিয়া হয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল কলোনির লোকজন। মানতটা সে সময়েরই। বিলু ভাল হয়ে গেলে কালীমাকে পাঁঠা দেবে।

আজ দেব কাল দেব করে পাঁচ বছর কেটে গেল। শেষকালে সুরবালা মরিয়া।

সকালবেলা স্নান করেই পতির চরণামৃত পান করার অভ্যেস সুরবালার। একটা ছোট বাটিতে সামান্য জল, অনঙ্গমোহনের ঠ্যাংটা টেনে ঝট করে বুড়ো আঙুলটা স্পর্শ করিয়ে ঢক করে গিলে ফেলে জল। সে দিনও তাই হল। আহ্নিকে বসেছিলেন অনঙ্গমোহন, সুরবালা কোত্থেকে উদয় হয়ে ঠ্যাং টানল। ঢক করে জলটা খেয়েই কানের ফুলদুটো খুলে সামনে রাখলেন—এই দুলজোড়া বেইচ্যা পাঁঠা কিন।

ক্যান?

আমি মা কালীরে স্বপ্ন দেখছি রাইতে।

অনঙ্গমোহন আবার প্রথম থেকে শুরু করে—ওঁ প্রজাপতিঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনছেননি আমার কথা। স্বপ্ন দেখেছি। এইবারেই কালীপুজোয় সোনাচাকার মাঝের ঘরে মানতের পাঁঠা বলি দিমু।

সোনাচাকার মাঝের বাড়ি এখন আর পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী-কুমিল্লা সীমান্তের সুপারিগাছ ছাওয়া গ্রাম নয়। দমদম বিমানবন্দরের কাছে এক কাচ-কারখানার চিমনির পাশে টালির চালা আর বাঁশের বেড়ার একটি ঘর। এখানে কামাখ্যা চক্রবর্তী থাকেন। উনি সর্বানন্দ বংশীয়। সোনাচাকায় তাঁদের গ্রামের বাড়িতে পৌষ সংক্রান্তির দিন কালীপুজো হত। এখন এই মতিলাল কলোনির বাড়িতেও হয়। বিশ-পঁচিশ জন সর্বানন্দ বংশীয়রা আসেন। সর্বানন্দ বংশীয়দের বলা হয়ে থাকে সর্ববিদ্যা। সর্বানন্দ ছিলেন মেহারের এক কালীসাধক ব্রাহ্মণ। কামাখ্যা পুরোহিত নিজেকে কামাখ্যাচরণ সর্ববিদ্যা অভিহিত করে থাকেন। পৌষ সংক্রান্তির রাতে সর্বানন্দ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এই কারণে ঐ দিনই কালীপূজা হত সোনাচাকার সর্ববিদ্যাদের ঘরে। একটি কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি ছিল। মেজতরফের ঘরেই স্থাপিত ছিল ঐ কালীমূর্তি। কামাখ্যা সর্ববিদ্যা সেই কালীমূর্তি মাথায় করে বর্ডার পার করেছিলেন।

পৌষ সংক্রান্তির দিন সকালবেলা একটি পাঁঠা এবং বিলুকে নিয়ে অনঙ্গমোহন, সুরবালা এবং অঞ্জলি হাজির হয়েছিলেন গ্রাম-সোনাচাকার মেজতরফের বাড়ি। নৌকো করে যেতে হত জনাই খালের ভিতর দিয়ে। আজ সাইকেল-রিকশায় এলেন। সুরবালা ও অঞ্জলি। কোলে কালো পাঁঠা। বিলু ও অনঙ্গমোহন পদব্রজে। ষোল নম্বরের বি প্লটের সামনে খেজুরগাছে টিনের পাতে লেখা সর্ববিদ্যা কালীমন্দির।

সুরবালা সুর তুলে বললেন, ও মা, কী সুন্দর মন্দির হইয়া গেছে।

পাঁচ ইঞ্চির গাঁথনি, লাল সিমেন্টের মেঝে, এর মধ্যে লাল রঙের পাকা বেদি, বেদির ওপরে কালো পাথরের কালী।

ওমা, কী সুন্দর গাছ লাগাইছেন আশা বৌদি, কত জবা গাছ।

কামাখ্যাচরণ পরিকল্পনা করে লাগিয়েছেন সব। সর্ববিদ্যা কালীমন্দির মোটামুটি স্বয়ম্ভর। বারটা জবা গাছ আছে বাড়িতে, কয়েকটা তুলসী ঝোপ, একটা বেলগাছ, একটা আমগাছ। সুতরাং বিল্বপত্র, রক্তপুষ্প, তুলসী এবং আম্রপল্লবের ব্যাপারে এই মন্দির স্বয়ম্ভর। একটি সবৎসা গাভীও আছে। সুতরাং আসনশুদ্ধি, বেদিশুদ্ধি ইত্যাদির জন্য গোময় ও গোমূত্র সংগ্রহের কারণে বাইরের খাটালে দৌড়োদৌড়ি করতে হয় না। দুটি নারকেলের গাছও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। নারকেলের নাড়ু তো প্রায়ই লাগে।

সুরবালা গাছপালাগুলিকে দেখছিলেন। খেজুর গাছের গায়ে পাঁচটি ক্ষতচিহ্ন। পাঁচবার রস দিয়েছে এই গাছ। এখন, এই মুহূর্তে তাঁর পূর্ববাংলার ফেলে আসা ঘরের জন্য আপসোস মনে এল না তেমন, বরং শেঠবাগান কলোনির কথা মনে পড়ল, মাটির কথা মনে পড়ল। ঐখানে টিকে থাকতে পারলে হয়তো দুটো নারকেলগাছ বড় হয়ে যেত এতদিনে।

কামাখ্যাচরণের বড় ছেলে রেলে কাজ করে। বছরখানেক হল, আলাদা হয়ে রেলকোয়ার্টারে উঠে গেছে। আজ ছেলেটিও সপরিবারে আছে। কামাখ্যা পুরোহিতের ছোট ছেলেটি বেকার। বিবাহযোগ্য কন্যা আছে একটি।

আশালতা বলেন, ভালই হইছে আগেভাগে আইছ ভইন। কত কাজ। আস, কাপড় ছাড়, ঠাকুরঘরে আস।

কামাখ্যাচরণের কত শুদ্ধাচার। এনামেলের বাসন বাসায় ঢোকে নাই। পিতলের আর পাথরের থালে নৈবেদ্য। পাড়াপড়শিরা কেউ সন্দেশের বাক্স এনে দিলে ফেরত দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কারণ, মিষ্টির দোকানে সিঙাড়া, কচুরি এসব তৈরি হয়। শাস্ত্রানুসারে তণ্ডুল জাতীয় পদার্থ-মধ্যে লবণ প্রয়োগে সেই খাদ্য উচ্ছিষ্ট তুল্য হয় এবং ঐ সিঙাড়া-কচুরির স্পর্শদোষে সন্দেশাদি মিষ্টান্ন দ্রব্যও অপবিত্র হয়।

কামাখ্যাচরণ প্রকৃতই শাস্ত্রানুরাগী ব্রাহ্মণ। জগৎপতি সূর্যদেব উদিত হবার পরে যে দন্তধাবন করে, সে পাপিষ্ঠ। কামাখ্যাচরণ সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্বে শয্যা ত্যাগ করেন। নিমডালে দন্তধাবন করেন। পুকুরে অবগাহন করেন। গামছা পরিধানরত অবস্থায় পুষ্পচয়নে যান। নিজ গৃহে জবা ও টগর ভিন্ন অন্য ফুল গাছ না-থাকায় প্রতিবেশীর বাড়িতেও যেতে হয়। যেহেতু মায়ের পূজার ফুল, কেউ সরাসরি আপত্তি করে না। তবে মেঘনাস্মৃতি নামে যে ঢঙের বাড়িটা, ও বাড়ির একটা ছোঁড়া, যে নাকি আবার জেসপ কোম্পানিতে কাজ করে, একদিন বলছিল—ঠাকুরমশাই, আপনি এবার থেকে গামছার তলায় একটা আন্ডারপ্যান্ট পরে আসবেন প্লিজ। তখন বারান্দায় তার স্ত্রী হাসছিল। লজ্জাহীনা।

কলিকালের কিরূপ ধর্ম এই প্রসঙ্গে এই গামছা এবং আন্ডার-প্যান্টঘটিত গল্পটা কামাখ্যাচরণ একদিন অনঙ্গমোহনকে বলেছিলেন। অনঙ্গমোহন তখন মনে মনে ভেবেছিলেন, পণ্ডিত ও পুরোহিতের এই হল তফাত। অনঙ্গমোহন ঠাকুরমশাই নন। উনি হলেন আচার্য। পণ্ডিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামাখ্যাচরণের কালীমন্দিরের এখন বেশ মাহাত্ম্য। প্রণামী বাক্সে খারাপ টাকাপয়সা হয় না। অনেকেই অফিস যাবার সময় মন্দিরে কপাল ঠেকিয়ে যান, একটু ঘুরপথ হলেও। কলোনিতে নতুন বিয়ে হলে নববিবাহিত দম্পতি এখানে এসে কালীমাতা দর্শন করে যান। এই পাড়ার একজন লটারির টিকিট কিনে কামাখ্যাচরণকে অনুরোধ করেছিলেন, একবার মায়ের পায়ে ঠেকিয়ে দিতে। সেই ভদ্রলোক লটারির সেকেন্ড প্রাইজ পেয়ে গিয়েছিলেন। তার বাড়িটার নাম যদিও বিক্রমপুর ভবন, কিন্তু লৌকিক নাম হচ্ছে লটারি বাড়ি। উনি কালীমাকে একটি সোনার জিহ্বা দান করেছেন। ঐ লটারি বাড়ির গিন্নিও আজ পূজার দিন সকাল থেকেই রয়েছেন। তাঁরা মিত্র। কায়স্থ নৈবেদ্য স্পর্শ করতে পারবেন না। তবে কালীমায়ের পাশে বসে থাকতেও তাঁর শান্তি।

বিলু বার বার ঘুরেফিরে এসেই পাঁঠাটাকে আদর করছিল। নরম চকচকে লোম। লোমের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল বার বার। মাথায় ছোট দুটো সদ্য ওঠা শিং-এর ফুটকি। যেন বিসর্গ চিহ্ন। বিলুর জন্যই মরতে হবে একে।

কামাখ্যাচরণ পাঁঠাটাকে পরখ করলেন। পূজায় চাই নিখুঁত পাঁঠা। পাঁঠাকে খেতে দিলেন কাঁঠালপাতা, তারপর শিশি থেকে এক গণ্ডুষ জল ছড়িয়ে দিলেন পাঁঠাটির গায়ে। সেই শিশির জল, যেখানে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ইত্যাদি নদীর জল মেশানো আছে। শিশির জল শেষ হয়ে এলে আবার পুকুরের জল মিশিয়ে দেন তিনি। অনঙ্গমোহনের ছাত্র জীবন মজুমদার ব্যাপারটা শুনেছিলেন। উনি বলেছিলেন, বাঃ, এ যে হোমিওপ্যাথিক মাহাত্ম্য। যত ডাইলিউট হয় তত শক্তি বাড়ে। কামাখ্যাচরণ সকালবেলা স্নান আহ্নিকের পর যে মায়ের প্রসাদ খান সেটিও মারাত্মক। ড. মজুমদার ঐ জিনিসটির নাম দিয়েছেন মোলাসেসিয়াম। গুড় ইংরিজি মোলাসেস্। কামাখ্যা পুরোহিতের মাতৃবিয়োগ হয় অকস্মাৎ। মরণকালে উপস্থিত ছিলেন না কামাখ্যাচরণ। যজমানিতে পাশের গ্রামে গিয়েছিলেন। মাতৃবিয়োগের সংবাদ পেয়ে দ্রুত ছুটে এসেছিলেন কামাখ্যাচরণ। কাঁদলেন। তারপর এক টুকরো পাটালি গুড় মৃত মায়ের মুখের ভিতর ঠেলে দিলেন। আঙুল দিয়ে মুখের মধ্যে ঘোরাবার চেষ্টা করলেন গুড়ের টুকরোটা, তারপর আঙুল বেঁকিয়ে বার করে আনলেন। বললেন, মায়ের প্রসাদ। কণামাত্র প্রসাদ গ্রহণ করতেন স্নান আহ্নিকের পর। কিন্তু কণামাত্র হলেও তো একদিন শেষ হয়, তাই শেষ হবার আগেই তার সঙ্গে আধ সের গুড় মিশিয়ে দিয়ে কৌটোয় রেখে দিয়েছিলেন যত্ন করে। পার্টিশনের পর দরকারি জিনিসপত্রের সঙ্গে ঐ কৌটোটাও নিয়ে এসেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ কৌটোর আবার শেষ হয়ে যাবার আগেই আবার আধ সের যোগ হয়েছে, এই কয় বছরে তিনবার হয়েছে এরকম। মায়ের মুখের প্রসাদ এইভাবে কখনোই শেষ হয় না।

কামাখ্যাচরণের ছোট ছেলে মানিক পাঁঠাটাকে দেখে গেল একবার। ঘাড়টা টিপল। কালাচাঁদও দেখে গেল পাঁঠাটা। কালাচাঁদ প্রতিদিন সকালে আসে। পুজোর জোগাড়যন্ত্র করে। নারায়ণ পুজোটা কালাচাঁদই করে, আর যে দিন কামাখ্যা যজমানিতে সকাল সকাল চলে যান, কালীপুজোটাও কালাচাঁদকেই করতে হয়। কালাচাঁদ মাসিক বেতন পায়। এই কালাচাঁদকে মাইনে দিয়ে রাখবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না, যেখানে মানিকের মতো একটা গাভুর ছেলে রয়েছে। মানিক আই.কম পাস। নাইটে বি.কমও পড়েছিল। পার্ট ওয়ানটা পাস করতে পারেনি। চাকরির চেষ্টা করছে। ও যদি মন্দিরটার দিকে একটু দেখত, একটু পুজোআচ্চা পৌরোহিত্যে মন দিত, তা হলেও ওর ভবিষ্যৎটা মোটামুটি চলে যেত।

পাঁঠার গলায় জবার মালা। কালাচাঁদ পাঁঠাকে স্নান করিয়ে এনেছে, তাই গায়ের লোমে কার্পেটের মসৃণতা আর নেই, ছোট ছোট শিং দুটোয় সিঁদুরের ফোঁটা। কামাখ্যাচরণ ওঁ অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে ছাগশিশুটিকে নিরীক্ষণ করলেন, কুশোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করলেন। সুরবালা এবং অঞ্জলি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মানসিক কার? কামাখ্যাচরণ জিজ্ঞাসা করলেন। সংকল্প বাক্য কার নামে হবে? অঞ্জলি বলল, বিপ্লব ভট্টাচার্য। বিলু কি রকম অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। কামাখ্যাচরণ মন্ত্রঃপূত জল ছিটিয়ে দিলেন পাঁঠাটার গায়ে। পাঁঠাটার কানের কাছে মুখ দিয়ে বলল, ওঁ হৈং হৌং ইমং পশুং স্বর্গং প্রদর্শয় মুক্তিং নিয়োজয় স্বাহা। পাঁঠাকে নিয়ে যাওয়া হল হাড়িকাঠের দিকে। হাড়িকাঠে চাপানো হল। ঠ্যাং ধরল মানিক। কালাচাঁদের হাতে খাঁড়া। খড়্গ ওঠাল কালাচাঁদ। চারিদিকে জয় মা, কাঁসর-ঘণ্টা। ইমং ছাগপশু বহ্নি দৈবতং ভূভ্যমহং ঘাতয়িস্যে। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ। মানুষের আর্তনাদ। হায়রে...কী সর্বনাশ হল। সুরবালা কপালে করাঘাত করে মাটিতে পড়ে গেল। পাঁঠার মাথাটা শরীরেই রয়েছে। বলি হয়নি। এ কী করলে মা, মাগো, আবার খড়্গ তোলে কালাচাঁদ। হাতের শির ফুলে উঠেছে আরও, শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে খড়্গাঘাত করে কালাচাঁদ। অখণ্ডই রয়ে গেল, সুরবালা লুটোপুটি খায়। আমারে খা, মা তুই আমারে খা। আমি হতভাগিনী। আমার দান নিলি না ক্যান...অঞ্জলি গড়াচ্ছে। মানিক পাঁঠাটার পা ছেড়ে দিয়েছে। কালাচাঁদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্মাদের মতো নিজের মাথায় কিল মারতে থাকে। তখন মাথা ঠাণ্ডা রাখেন অনঙ্গমোহন। সুরবালাকে বলেন, ব্যাকুলা হয়ো না। কামাখ্যাচরণের কানে কানে কিছু বলেন। কামাখ্যাচরণ নিজে হাতে খড়্গ তুলে নেন। তারপর কি ভেবে আবার খড়্গ তুলে দেন কালাচাঁদের হাতে। নিজে পা দুটি চেপে ধরলেন। বললেন, সবাই স্থির হও। মাতৃনাম উচ্চারণ কর। জয় মা। খড়্গ নেমে আসে। এইবার শিরচ্ছিন্ন হয়। ঝটপট করতে থাকে ছাগ-কবন্ধ।

এবার ছাগরক্তের টিপ পরিয়ে দিলেন কামাখ্যাচরণ বিলুর কপালে—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রী ক্লিন্নে মদদ্রব স্বাহা। কামাখ্যা পুরোহিত বললেন, এই ছাগমুণ্ড দেবীকে উৎসর্গ করা যায় না। এটা বিঘ্ন-বলি। একটিমাত্র কোপে ছাগের শিরশ্ছেদন করতে হয়। একাধিক কোপ মানে তো জবাই, সে তো মুসলমানরা করে। বলি-বিধিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, এককোপে বলি না হলে সেই পশু উৎসর্গ করা চলে না।

নিয়মানুযায়ী সেই ছাগশিশুকে এক হাজার আট টুকরো করে হোম করা হল।

ঐ হোমে কি কালী খুশি হবেন? পাড়াপড়শিরা সন্দেহ করতে লাগল। বলিতে বিঘ্ন হলে নানা অমঙ্গল। সংসারে কারো না কারোর ক্ষতি হয়েই থাকে।

যে দেবী যত উগ্রা, যত হিংস্রা, সেই দেবীই তত জাগ্রতা। বলিতে বিঘ্ন ঘটার পর ভক্তরা সবাই একটা না একটা অমঙ্গল আশঙ্কা করছিল এবং একটা অমঙ্গল কি কামাখ্যাচরণ নিজেও চাইছিলেন না? এমন একটা অমঙ্গল যা নিজের পরিবারের মধ্যে হল না। যদি কালাচাঁদের উপর দিয়েও অমঙ্গলটা হয়ে যায়?

কিন্তু কালাচাঁদ কিছুদিনের মধ্যে পোস্ট অফিসের পিওনের চাকরি পেয়ে গেল।

প্রণামী বাক্সে টাকাপয়সা অনেক কম কম পড়তে লাগল। কালী যদি সত্যিই জাগ্রত হতেন, অ্যাদ্দিনে কাউকে খেতেন।

মিত্রগিন্নী একদিন শেষ রাতে শুনলেন, ঠাকুরবাড়িতে কান্নার রোল। ধড়মড় করে উঠে বসলেন, মা কালী কাউকে নিয়েছেন বোধহয়। তারপর বুঝলেন স্বপ্ন। সবাই ভাবল, মা-কালী নিশ্চয়ই কাউকে নেবেন। কিন্তু নেওয়া আর হচ্ছিল না। তাই হচ্ছিল না মায়ের গায়ে নতুন কোনো অলঙ্কার, নতুন সোনার চোখ, নতুন কোনো কানের কিংবা গলার অলঙ্কার। কালীর মাহাত্ম্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর থাকছিল না। মানিক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের অফিসারকে মোটা কিছু ঘুষ দেবে ভেবেছিল। কালীর ওপর ভরসা নেই।

ঐ বিঘ্ন-বলির এক বছরের মধ্যেই বিলুর ঠাকুমাকেই খেলেন কালী। ঐ খালপাড়ে। মানসিকটা ওঁরই ছিল কিনা। যেদিন সুরবালা মারা গেলেন, সেদিন ভোরবেলা পেচ্ছাপ করতে উঠে মানিক একবার নাকি মন্দিরে উঁকি দিয়েছিল এবং দেখেছিল, কালীর মুখে যেন রক্ত লেগে আছে।

আট

—এই বছর একটা দুর্গাপুজোর তন্ত্রধারী হইবা অনঙ্গ?

কামাখ্যা পুরোহিত এসে অনঙ্গমোহনকে বললেন।

—তন্ত্রধারী ক্যান?

—পূজা করতে তো পারবা না। অইভ্যাস তো নাই তোমার, সেই কারণে তন্ত্রধারী করতে কই। আমাগোর পাড়ার বারোয়ারি পূজা। দেয়-থোয় ভালই।

—তুমি কর না ক্যান?

আমিই তো করতাম। আর মানিক করত তন্ত্রধারী। এই কয় বচ্ছরে মন্দিরের কাজকর্ম বাইড়া গেছে গিয়া। মন্দিরের চূড়া করছি। দশমীর দিন মন্দিরের চূড়ায় ঘটস্থাপন করামু। বহুলোক মন্দিরে আসতাছে, খুবই জাগ্রত কালী। অখন আর বারোয়ারি-টারোয়ারি পূজা করার সময় নাই আমার। মানিকরে এবার পূজা করতে পাঠামু। তুমি শুদ্ধ উচ্চারণ কইর‍্যা মন্ত্রগুলি...

—কামাখ্যা ভাই, এসব আমার কাম নয়। তুমি তো জানোই, এইসব আমি করিনা।

—দেখ, তুমি ভ্রান্ত অহমিকা লইয়া আছ। যজমানি যদি সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ না করে তবে করবটা কে?

যজনং যাজনং চৈব
অধ্যয়নং অধ্যাপনম্
দানং প্রতিগ্রনং চৈব
ষটকর্ম ব্রাহ্মণান্বিতম্।

এই কথা তো শাস্ত্রবচন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার যেন একটু রেগে ওঠেন অনঙ্গমোহন। বলেন, এইসব অর্বাচীন শ্লোকরে শাস্ত্রবচন বানাও তোমরা, যজমানরা। প্রতিগ্রহণ যদি ব্রাহ্মণের কার্য হয়, তবে আমি অগ্রদানীর মতো প্রেতোৎসর্গ গ্রহণ করি? পিণ্ড খাই?

অঞ্জলি এগিয়ে এল। বলল, হ্যাঁ, দরকার হলেও এসব করবেন না? কেন করবেন না? সবাই তো করে। অঞ্জলির মুখের দিকে তাকালেন অনঙ্গমোহন। গলা দিয়ে নীল শিরা নেমে গিয়েছে শরীরের ভিতরে। উত্তেজিত হলে ঐ শিরা স্ফীত হয়। অনঙ্গমোহন দেখতে চেয়েছিলেন, ঐ শিরার স্ফীতি কতটুকু। কিন্তু এইমাত্র মুখের দিকে চেয়ে ওর মুখটা কী রকম অসহায় মনে হল। চোখের মণিটা যেন জ্যৈষ্ঠের জলহীন জলাশয়ের ভয়ার্ত শাপলা।

কেন যে করবে না কী করে বোঝাবেন অনঙ্গমোহন, কীভাবে বোঝাবেন?

কামাখ্যা বললেন, হেই কথাটাই তো রিয়ালাইজ করতে পারতাছে না অনঙ্গভাই। ব্রাহ্মণ সন্তান, পূজা করব। এর মধ্যে অন্যায়-বা কী?

কামাখ্যার মুখে ইংরেজি শব্দটা শুনে একটু যেন আশ্চর্য হলেন অনঙ্গমোহন। অনঙ্গমোহন লক্ষ করেছেন, কামাখ্যার পরনে ধুতিটি বেশ পাতলা। মিলের ধোলাই ধুতি। এবং চাদরটি গাঢ় রক্তবর্ণ। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা। সর্বানন্দ বংশীয়রা কখনোই তান্ত্রিকচারী ছিলেন না। সর্বানন্দের পূর্বপুরুষরা শৈব মন্ত্রানুসারী ছিলেন। সর্বানন্দের সিদ্ধিলাভের পর তার বংশধরেরা কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু বাহ্যত কেউই তান্ত্রিক আচারাদি করতেন না। রক্তবর্ণ চাদরটির দিকে তাকিয়ে রইলেন অনঙ্গমোহন।

পূজা করইন্যা লোকের কিছু অভাব আছে নি বৌমা। মেদিনীপুরের লোক ঘুইরা বেড়াইতাছে। আমি চাইছিলাম, পূজাটা আমাগ্যোর দ্যাশের মধ্যেই থাক। ভাল কেলাব। বহু টাকা চাঁদা উঠায়। বহু লোক দেখতে আসে, বহু প্রণামী পড়ে। প্রণামী-টনামী পুরোহিতই পায়। এইবার তো আরও বেশি লোক আইব। কেলাবের মাতব্বরে কইল, এ বছর ভারতমাতার পূজা হইব। অসুরের মুখ হইব আয়ুব খাঁর মতন।

অঞ্জলি বলল, বাবু আপনি কিছু একটা করুন। আমি একা আর পারছি না। গলার শির ফুলে উঠছে অঞ্জলির। ফেল করা ছাত্রের মতো মাথা নিচু করেন অনঙ্গমোহন। পাশের ঘর থেকে গান—'আর দেরি নয় ধরগো তোরা।'

অঞ্জলি চলে গেলে ফিস ফিস করে অনঙ্গমোহন বলে—বৌমার পয়সায় আমি খাই না, বৌমারটার পরি না। আমার পণ্ডিত বৃত্তি আছে। ঐ বৃত্তি বৃদ্ধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাইয়া মাসে পঞ্চাশ টাকা হইবার কথা আছে। অথচ বৌমার ধারণা যে, আমি গলগ্রহ...

কামাখ্যা পুরোহিত বলেন—সত্য কথা স্বীকার কর অনঙ্গভাই। তোমার ঐ টাকায় দুইজনের গ্রাসাচ্ছাদন হয় না।

দুইজন ক্যান?

তুমি আর অসীম...। আবার মাথা নিচু করলেন অনঙ্গমোহন।

তালে কী স্থির করলা অনঙ্গমোহন? ফাইনাল কও। পূজাটা করতাছ তো?

একটু চিন্তা করতে দাও।

চিন্তার কী আছে। পৌরোহিত্য তুমি আরও করছ। নতুন কিছু নয়।

সে তো গৃহস্থের বিপদে। এক্ষেত্রে তো এমন নয় যে, আমি ছাড়া ঐ পূজাই হইব না।

যাও, তোমরা সব যাও। নেকসট ডে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে শেখাব। বাগবাজার সার্বজনীন পূজার ফাংসনে গাইবে সব। এখন যাও।

অজিতবাবুর ছাত্রীরা এখন চলে যাবে। সুমিতা একলা থাকবে কিছুক্ষণ। স্পেশাল ক্লাস। রবিবার। ঐ ঘরের থেকে লুচি ভাজার গন্ধ আসবে এবার।

—এবার যাই অনঙ্গ। যুদ্ধের বাজার। সন্ধ্যায় সব আবার অন্ধকার।

স্বপ্না এক কাপ চা নিয়ে আসে। কামাখ্যা চায়ের কাপটা নিয়ে বলে, বাঃ, তোমার নাতনিটি তো বিবাহযোগ্য হইয়া উঠছে। মুখটা ঠিক তোমার স্ত্রীর মতো।

পাশের ঘরে এবার কোমল গা। গা-এর উপরেই পা দেবে। তারপর মা গা রে সা। তোর এবার মরাগাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী।

কামাখ্যাচরণকে বাসে তুলে দেবার জন্য অনঙ্গমোহনও সঙ্গে যাচ্ছিলেন। অনঙ্গমোহন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, কামাখ্যাভাই, আচ্ছা কইতে নি পার ঈশ্বর কিরূপ? আচমকা এই প্রশ্নে কেমন অপ্রস্তুত হয়ে যান কামাখ্যাচরণ।

—কও, ঈশ্বর কিরূপ।

—ঈশ্বর? ঈশ্বর আবার কিরূপ? ক্যান? এইসব প্রশ্ন ক্যান?

—না, জিগাই, ঈশ্বর কিরূপ।

—তেজোময়ং বিশ্বমননন্তমাদ্যং...

—সংস্কৃত-টংস্কৃত ছাড়। খোদ বাংলায় তোমার অনুভবের কথা কও।

—তেজোময় ঈশ্বর, সর্বব্যাপী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বব্যাপী হয় যদি, তবে এটা জাগ্রত আর অন্যটা নিদ্রিত, এইসব কী কইরা হয়?

—হয়। ঈশ্বর কোথাও প্রকট, কোথাও অপ্রকট।

—তুমি বিশ্বাস কর কামাখ্যাভাই, মনে মনে সত্যই বিশ্বাস কর, হাঁচা হাঁচা-ই বিশ্বাস কর যে, তোমার বাসার সর্ববিদ্যা কালী বড়ই জাগ্রত?

ইয়াতে কোনো সন্দেহ আছে নি?

তুমি বিশ্বাস কর, তোমার কালী আমার স্ত্রীরে খাইছে?

লোকের তাই ধারণা।

তোমার ধারণা কী?

আমারে জেরা কর ক্যান?

ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? সগুণ না নির্গুণ?

ঈশ্বর নির্গুণ কিন্তু গুণের আধার। ভগবান নিরাকার কিন্তু কখনো কালী রূপে, কখনো কৃষ্ণ রূপে, কখনো মহাদেব শিব রূপে প্রকট হন। আসলে সবই এক।

—সবই এক?

—এক ছাড়া কী। কিন্তু একের মধ্যেই দুই। এক প্রকাশক আমারে কইছিল, একখান বই লেইখ্যা দেন, পয়সা দিমু। একের মধ্যে দুই। ব্যাকরণ আর রচনা। ব্যাকরণ না হয় হইল, কিন্তু কী রচনা? না মহাকাশ অভিযান, চীনের বিশ্বাসঘাতকতা, ভারতের খাদ্যসমস্যা...আমি কই দরকার নাই।

—বাইচলামি করতাছি না কামাখ্যা, তর্ক করতাছি। পণ্ডিতের তর্ক, অধ্যাপকের তর্ক। চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতরা যেরূপ তর্ক করত।

—আমি তো পণ্ডিত না অনঙ্গভাই, পুরোহিত।

—পুরোহিতও পণ্ডিত হয়। তুমিও ব্যাকরণতীর্থ কামাখ্যা। আমার বাবার টোলে তুমিও এক বছর ন্যায়শাস্ত্র পড়ছিলা।

—সেই অতীতের কথা অনঙ্গভাই, দীর্ঘ অতীত।

—শুন কামাখ্যা, আইজ তোমারে ছাড়ুম না আমি। কও, ঈশ্বর এক না বহু।

—ঐ যে কইলাম, একের মধ্যে বহু। আসলে একই কিন্তু বহুরূপ।

—তাহলে নারায়ণ, গণেশ, মহাদেব, ছিন্নমস্তা, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, ওলাওঠা সবই এক?

—সবই এক। যে কালী সেই কৃষ্ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আর ওই যে সন্তোষী মাতা নামে এক দেবীর নামে চিঠি আসতাছে?

—সন্তোষী মাতা? সেইটা আবার কী?

—এক দেবী। চিঠি আসতাছে, এই দেবীর পূজা না করলে অমুক শাস্তি, আর পূজা করলে অমুক অমুক লাভ।

—সেই চিঠির কথা আমি জানি না।

—কামাখ্যা, তুমি গন্ধেশ্বরী পূজা জান?

—জানি।

—জাতাপহারিণী পূজা?

—জানি।

—হনুমান পূজা?

—সেইটা ঠিক এখনো...

—আচ্ছা কামাখ্যা, তোমার কখনো মনে হয় না, গীতার সপ্তম অধ্যায়ের অব্যাক্তং ব্যক্তি মাপন্নং শ্লোকটার কথা যেখানে বলছে—স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা ঈশ্বরের অব্যক্ত রূপ না বুইঝ্যা মানুষের আকৃতি মনে করে।

—সেইটা তো বুঝি অনঙ্গভাই, কিন্তু মানুষ তো অত কঠিন জিনিস বুঝে না, নিরাকার কল্পনা করা খুবই কঠিন, তাই একটু ইজি কইরা ভাবে।

—কিন্তু তুমি তো বুঝ যে এইটা ঠিক না। তুমি কি বুঝ না, এতগুলি দেবদেবী সবই মনুষ্য-কল্পনা? আদপে এইসব অস্তিত্বহীন। মানুষেরে প্রতারণা করা হইতাছে।

—প্রতারণা? ছি ছি? তা ক্যান। গীতাতেই কি কয় নাই, ঐ যাং ডাং তনুং ভক্তাঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছন্তি, শ্লোকে—ভক্তরা যে মূর্তিতে আমাকে পূজা করে আমি সেই মূর্তিতেই আবির্ভূত হই।

—কিন্তু তার পরবর্তী শ্লোক মনে আছে তোমার? বলা আছে, ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পূজা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাজ।

—কিন্তু এইটা তো যুগ যুগ ধইরা চলতাছে। হঠাৎ আইজ হইল কী তোমার? তুমি এইসব কইতাছ ক্যান?

—ভাবতেছি, কেবলমাত্র পয়সার জন্য, দক্ষিণার জন্য, কাপড়ের জন্য, চাউলের জন্য, ফলফলাদির জন্য আমি ভুল শিক্ষা দিমু? ভগবান তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রার উর্ধ্বে। অথচ ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠ কইরা তারে খাওয়াই। অথচ নিজেরাই ভোগ করি। দেখ আমি আহ্নিক করি। এইটা আমার জীবনাচার। বিষ্ণু পূজা, নারায়ণ পূজাও করি। এইটা আমার ব্যক্তিগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভ্যাস। কিন্তু যজমানের বাড়ি গিয়া তার মঙ্গল কামনায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করাটায় মন সায় দেয় না আমার। আমার কী ক্ষমতা আছে যে, মন্ত্রদ্বারা আবাহন কইরা ঘটের মধ্যে দেবতারে আনতে পারি। ফলফলাদি নৈবেদ্য দিয়া তারে তুষ্ট করি? তারপর তারে কই এইটা দাও, সেইটা দাও...

কথা বলতে বলতে তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন বেলগাছিয়া ব্রিজের ওপরে। তলা দিয়ে বয়ে গেছে খাল। খালের জল এখন প্রায় নেই। কামাখ্যাচরণ বললেন—উৎকট গন্ধ আসতাছে এই খালের জল হইতে। চল সামনে যাই।

অনঙ্গমোহন জলটাকে দেখেন। সত্যিই। স্রোতহীন জল। সুন্দরবনের স্টিমার আসত চার-পাঁচ বছর আগেও। লবণহ্রদের জলাভূমির গা দিয়ে এই খাল বিদ্যাধরী নদীতে গিয়ে পড়ত। এখন লবণহ্রদে মাটি পড়েছে। জলাভূমি হয়ে গেছে উঁচু ডাঙা। কালক্রমে একদিন ওখানে অট্টালিকা হবে, শহর হবে, জনপদ হবে...।

অনঙ্গমোহন বললেন—শুন কামাখ্যা, আজ এইখানে একটা সত্য কথা কই। আসলে বড় অসহায় আমরা। সংস্কৃত ভিন্ন আর কিছুই জানি না আমরা। সংস্কৃত আমাগোর বৃদ্ধা মাতা। এই মা আর আমাগরে খাওয়াইতে পরাইতে পারে না। তবু আমরা তাঁরে আঁকড়াইয়া ধইরা আছি। আমরা বস্তুবিদ্যা জানি না। তুমি পূজা পদ্ধতি জান, অঙ্গন্যাস করন্যাস জান। জলশুদ্ধি আসনশুদ্ধি জান, আর মানুষ, আমার দ্যাশের মানুষ অল্পবুদ্ধি, সেইহেতু তুমি ফর্দমালা দাও, তোমার গ্রাসাচ্ছাদন হয়। আর আমি?

অনঙ্গমোহন চুপ করে যান। কামাখ্যাও কথা বলে না। একানব্বই নম্বর বাস খালধার ছেড়ে চলে যায়। এই বাসে ওঠা হল না কামাখ্যাচরণের।

এই যে চতুষ্পাঠী কইরা মরতাছি। ক্যান? এই ছাড়া আর করবার কীই-বা আছে আমার। এখন আর জমিদারি নাই কামাখ্যা, জমি দেয় না কেউ। সরকারি সামান্য বৃত্তি, তার নাম আবার ডি.এ, ইংরাজি কথা। ডি.এ-র বাংলা অর্থ হইল দুর্মূল্যভাতা। দুর্মূল্যভাতা সর্বক্ষেত্রে মূল বেতনের সঙ্গে দেয়। আমাগর বেতন নাই, অথচ ডিএ, এই ডিএটুকু পাইতে গেলে তা চতুষ্পাঠী চালাইতেই হয়। কম কইর‍্যা পাঁচজন ছাত্র তো রাখতেই হয়। পরীক্ষায় বসাইতে হয়। অভ্যাসবশে তাই করতাছি আমি।

বাইরের ছাত্র পড়াইতে কয় অনেকে। সংস্কৃতের ছাত্র। কিন্তু ইস্কুলের ছাত্ররা আমার কাছে ক্যান আসব? ইস্কুলের বিএ পাস মাস্টার। তারা তো টিউশনি চায়। আর পরীক্ষার প্রশ্ন থাকে ইংরাজি হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর। এইসব কি আমি পারি? তবুও চেষ্টা করলে কি জুটে না? কিন্তু কি কইরা পয়সা নিয়া ছাত্র পড়াই কও? চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকরা তো পয়সা নিয়া পড়াইত না। এই যে সরকারি ডিএ রূপ সামান্য দক্ষিণা গ্রহণ করি, তাহাতে শর্ত আছে যে, আমি চতুষ্পাঠীতে সর্বক্ষণের জন্য অধ্যাপনারত আছি কি না। কও, চতুষ্পাঠী ছাড়া কুত্র গতি? আর কীই-বা করতে পারি আমি।

এই যে অধ্যাপনা করতাছি। জানি গাত্রলোম করতাছি। ছাত্রের সন্ধানে ঘুইরা ছাত্র পাই না। সুমিতার মতন ছাত্রী কালে-ভদ্রে পাই। আর শিক্ষাক্রম? সেই যে প্রাচীন পাঠ্যসূচি ছিল, শতাবধি বৎসরের, তার যে কী যৌক্তিকতা আছে সেই সম্পর্কেও প্রশ্ন জাগে আমার। আমি হিতোপদেশের কথাই কই। হিতোপদেশ তো বালকদিগের জন্য। বৃদ্ধস্য তরুণী বিষয় বালকের কাছে কেমনে ব্যাখ্যা করা যায়? বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী কি কারণে বিষতুল্য, তারপর স্থানং নাস্তি ক্ষণো নাস্তি শ্লোকে বলা হয়, নারীমাত্রেই পুরুষ পাইলে লোভী হয়। স্থান পাইলেই সঙ্গম করে। আমারে পড়াইতেই হয়। নারীগণের প্রিয় অপ্রিয় জ্ঞান নাই। গরু যেমন নতুন নতুন ঘাস খাইতে চায়, নারীও তেমন নতুন নতুন পুরুষ চায়—গাবস্তূর্ণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তে নবং নবং। কও কামাখ্যাভাই, এগুলি কি রকম কথা? আমার বৌমা যে চাকরি করে... চাকরিস্থলে কত পুরুষ...। কামাখ্যাচরণ বললেন—এগুলি ঋষিবচন। এগুলি ঠিকই কথা। এই কারণেই মহামতি মনু কইছেন—পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে পুত্রশ্চ স্থবিরে—অনঙ্গমোহন বললেন, কিন্তু মাতা স্বসা দুহিতা ন বিবিক্তাসনা ভবেৎ। এইটা আবার কী? এইসব কী? বিশ্বাসোনৈব কর্তব্য স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। সুহৃদভেদে আছে—উদ্যোগহীনা, দৈবপরবশ, সাহসহীন ও অলস লোককে লক্ষ্মী ভজনা করেন না, যেমন যুবতী স্ত্রী বৃদ্ধপতিকে আলিঙ্গন করতে পারে না—এরূপ ক্যান কামাখ্যা? পঙ্গু যেমন গিরি লঙ্ঘন করতে পারে না এই উপমা তো আরও ভাল হইত। আর হিতোপদেশের উপসংহারে কী আছে শোনবা? আশীর্বচন কইর‍্যা গুরুদেব শিষ্যগণের কইলেন, এই নীতিজ্ঞানগুলি সতত বেশ্যার মতো বক্ষে জড়াইয়া মুখ চুম্বন করতে থাকুক। নীতির্বারবিলাসিনী সততং বক্ষস্থলে সংস্থিতা...

এইসব তো শিখাইতেছি আমি। অথচ সংস্কৃত অর্থ এইসবই নয়। সংস্কৃত হীরার খনি। অঙ্কশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, বস্তুবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা কত কিছুর আকর। এইগুলি সব শেষ হইয়া যাইতেছে। আর আমি ছাত্র ধইরা ধইরা হিতোপদেশ অমরকোষ শিখাই আর তুমি গণেশরে ফল খাওয়াও। নারায়ণরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুম পাড়াও আর বাণলিঙ্গ শিবরে স্নান করাও—আর জোর কইরা বিশ্বাস কর, ঐ স্নানে লিঙ্গের শান্তি হইল। বৃহস্পতি স্মৃতির ঐ বাক্যটা মনে আছে কামাখ্যাভাই, যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানি প্রজায়তে। যুক্তিহীন গ্রহণ বর্জনে ধর্মহানি হয়।

—বৃহস্পতি স্মৃতি?—এইসব দরকার নাই অনঙ্গ। আমার ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি, স্তোত্রমালা পুরোহিতদর্পণ মনে রাখলেই চলবে। আর বিশ্বাস।

—সত্য কথাই কইল্যা কামাখ্যা, ঐ বিশ্বাস, বিশ্বাসের ভ্রম না থাকলে, খামু ক্যামনে?

—এই কূট ব্যবস্থাও তাঁরই। তাঁরই ইচ্ছা।

—যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতা
ময়ুরাশ্চিত্রিতা যেন স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি।

যিনি হাঁসেদের করেছেন সাদা, শুক পাখিদের সবুজ বানাইছেন, আর ময়ূররে করছেন নানা বর্ণে বিচিত্র, আমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা তিনিই করেন।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। সন্ধ্যা নামে। রাস্তার আলোয় কালো কালো ঠুলি। জ্বলে উঠল ঠুলি পরা আলো।

কামাখ্যাচরণ বললেন, আর দেরি নয়। দিনকাল বড় খারাপ। যুদ্ধ। অনঙ্গমোহনও বললেন, যুদ্ধ। যুদ্ধ কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই ছড়িয়ে দিলেন দীর্ঘশ্বাস। তারপর বললেন, চায়ের দোকান তো করতে পারি না কামাখ্যা, অহং বোধে লাগে, বরং পূজাই করি। কি কও? কামাখ্যা এবার যেন একটু রেগে গেলেন। রাগতস্বরে বললেন—দেখ অনঙ্গভাই, এটা আমার কোনো ঠেকা নয়। পূজা করলে তুমি যদি মনে কর, অধঃপতিত হইবা, কইর না। তোমার অভাব, অসুবিধা আমি জানি। তোমারে ভালবাসি, সেই কারণেই তোমারে কইলাম। বলেই চটির ফটাস ফটাস শব্দ করে বাসে গিয়ে বসলেন।

অনঙ্গমোহন স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরে বাস ছাড়ল। অনঙ্গমোহন তখন এগিয়ে গেলেন। কন্ডাক্টারের খড়িবেড়িয়া খড়িবেড়িয়া শব্দের চেয়েও জোরে চিৎকার করলেন—কামাখ্যা, আমি রাজি। আমি রাজি।

আর তক্ষুণি তর তর করে চোখ বেয়ে জল নামল।

গাড়িগুলোর হেডলাইটের অর্ধেক কালো। রাস্তার আলোর চোখে ঠুলি। কেমন একটা ভয় ভয় রাস্তা। লোকজন কম। পানের দোকানে রেডিওর সামনে মানুষের জটলা। কলাইকুণ্ডায় পাকিস্তান বিমান হানা দিয়েছিল। এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি বোম পড়ে, একটা, এইখানে? বোম কী শব্দ? সংস্কৃত ব্যোম শব্দাগত? ব্যোম, অর্থাৎ আকাশ। আকাশ হইতে পড়ে যাহা? নাকি ইংরাজি। ইংরাজি যদি হয়, এমনকি হইতে পারে না—সংস্কৃত ব্যোম শব্দই ইংরাজিতে বোম হইয়াছে? সংস্কৃতই তো সকল ভাষার আদি জননী। অর্বাচীন ভাষাবিদ্‌রা এটা স্বীকার করে না। ভারতীয় সেনাদের ইছোগিল খাল অতিক্রম। টালার খালপুল অতিক্রম করে ঘরমুখো হতে থাকেন অনঙ্গমোহন। আচ্ছা, ভারতীয় সৈন্য কি পূর্ব পাকিস্তান দখল করতে পারে না? পারে যদি? পারলেই কি আবার ফিরে পাবেন অনঙ্গমোহন গোবর নিকানো উঠান, কলাগাছের পাতার আন্দোলন, সুপারির সারি, চতুষ্পাঠী, চতুষ্পাঠী। ছাত্রদের জলঝাঁপ? এখন কি ওখানেও প্লাস্টিক নেই? সর্বত্রই প্লাস্টিক। এখন ওখানেও কি যন্ত্রপাতি কলকব্জা নেই। বস্তুবিদ্যা নেই? সোনাচাকা দত্তপাড়া দেবপাড়ার ছেলেরা কি মটোরবিদ্যা, হিসাবরক্ষা ছেড়ে চতুষ্পাঠীতে আসত?

বাড়ির ভিতরে ঢোকেন অনঙ্গমোহন। বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় নিষ্প্রদীপ। ইংরাজি নাম ব্ল্যাক আউট। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার। সিঁড়ির গোড়ায় কলঘরের পরিচিত পুরাতন গন্ধ। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাবেন—এ সময় 'প্লিজ আর একবার' এই বাক্য শোনেন অনঙ্গমোহন। অজিতবাবুর কণ্ঠস্বর স্পষ্টতই। 'না আর না'। চাপা নারী-কণ্ঠ। সুমিতার। অনঙ্গমোহন স্থাণুবৎ। ইঃ, জর্দার গন্ধ। সুমিতা। শাড়ির খসখস। আর চুপ করে থাকা যায় না—

অনঙ্গমোহন চিৎকার করেন—কী হইতেছেটা কী? তখনই ঝটাপট পদশব্দ। শব্দ উপরে যায়। শব্দ নিচে নামে। আঁচল ওড়ানো হাওয়া নেমে যায়। হাওয়ায় প্রসাধন-মাখা গাত্রগন্ধ।

নয়

—ও নাতনি, নাতনি গো, আমার টোলে ভর্তি হইবা?

—ধুৎ, অনঙ্গমোহনের প্রস্তাবে স্বপ্না বিব্রত। ভাবছে ঠাট্টা।

ধুত্তেরি ক্যান? তোমার নাম লিখলাম খাতার মইধ্যে। মাঝে মাঝে সময় পাইলে বইসো।

আমি তো মেয়ে। আমি আবার কী পড়ব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ওমা। বোকার মত কথা কও সোনা। মেয়েরা পড়ে না নাকি? খনা লীলাবতী, গার্গী...সুমিতা।

জ্ঞওরা সব ভাল মেয়ে দাদু, আমি বোলে ফেল করি। নিজের ইস্কুলের পরীক্ষাতেই পাস করতে পারি না...

—পারবা। এই পরীক্ষায় পাস করতে পারবা। তুমি আইজ থিকা ভরতি হইলা।

—না দাদু না, আমার স্যান্‌সকৃট ভাল লাগে না।

—ভাল লাগে না? না লাগুক গিয়া, তুই আমারে বাঁচাইবার লাইগা ভর্তি হ। তোর নাম থাক। পূজার পর পরিদর্শক আইবে। টোল পরিদর্শক। অন্তত পাঁচজন ছাত্র না দেখাইতে পারলে এই টোলের আর অনুমোদন থাকব না গো সোনা। তুই ভর্তি হ।

—স্বপ্না মাদুরের কাঠিগুলোর উপর হাত বুলোতে থাকে। অনঙ্গমোহন লাল খাতাটা বার করেন।

বড় বড় করে লেখা পূর্ণানন্দ চতুষ্পাঠী। তারপর ছোট করে—সকল বিভবসিদ্ধৈপাতু বাগদেবতা নঃ। ছাত্র তালিকা।

১। শ্রীমতী সুমিতা দত্ত। কাব্য-উপাধি পরীক্ষার্থিনী।

২। শ্রী অসীম চক্রবর্তী। ব্যাকরণের আদ্য। পরীক্ষার্থী।

৩। শ্রী বিপ্লব ভট্টাচার্য। ব্যাকরণের আদ্য।

৪। শ্রী জীবন মজুমদার। ব্যাকরণের আদ্য।

পাঁচ নম্বরে শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্যের নাম লিখলেন অনঙ্গমোহন। চোখ বুজে বিড়বিড় করলেন—ওঁ গং গণপতায় বর বরদ। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এইবার আমাকে প্রণাম কর। স্বপ্না সুন্দর করে প্রণাম করল। স্বপ্নার ফ্রকের পিঠের ছিঁড়ে যাওয়া অংশটা দেখে চোখ বুজলেন অনঙ্গমোহন। স্বপ্না প্রণাম শেষে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ইশ, কতদিন পর ভাল করে প্রণাম করলাম তোমাকে।

অনঙ্গমোহন ভাবলেন, এবার জীবন ডাক্তারকে আর একবার অনুরোধ করবেন। দু'মাস হয়ে গেল, আসছে না।

সেদিন চেম্বারে গিয়েছিলেন। জীবন ডাক্তার বলেছে—এখন দেশ বিপন্ন। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, তার উপর সীমান্তে চীনা সৈন্য সমাবেশ। এখন কি সংস্কৃত পড়ার সময়?

এখন জীবন মজুমদারের চেম্বারে গিয়ে অনঙ্গমোহন দেখলেন—একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে লেখা পোস্টার—

বোমার শব্দে যদি চমকান
ক্যাফর থার্টি তক্ষুণি খান।
আঘাত যদি পান, বোমার কারণ
সঙ্গে সঙ্গে করুন আর্ণিকা গ্রহণ
দেশ মায়ের আহ্বান
প্রতিরক্ষায় করুন দান।

অনঙ্গমোহন দরজা ঠেলে উঁকি দিলেন। জীবন ডাক্তার বললেন, বাইরে বসুন। অনঙ্গমোহন তাঁর মাথাটা বাইরে টেনে আনলেন। মাথাটা বেশ ভারী মনে হল। ঘাড়কে মনে হল গ্রীবা। একটু পরে টিং টিং। ভিতর থেকে ডাক—পণ্ডিতমশাই আসুন। টিং টিং। অনঙ্গমোহন ভিতরে গেলেন। জীবন ডাক্তার বললেন, কী ব্যাপার? অনঙ্গমোহন বললেন—তেইশ সেপ্টেম্বর সকাল হইতে পাক-ভারত যুদ্ধ বিরতি হইছে। এবার টোলে আসবা?—এখন হবে না পণ্ডিতমশাই। পাবলিকওয়ার্কে বড় জড়িয়ে গেছি। কাউকে বলবেন না। করপোরেশনে ইলেকশানে দাঁড়াতে বলছে আমাকে...আশীর্বাদ করবেন, অ্যাঁ?

অনঙ্গমোহনের উচিত, জীবন মজুমদার নামটা কেটে দেওয়া। অথচ পরিদর্শক আসবেন। পূজার পর যে কোনোদিন আসতে পারেন। কোনদিন আসবেন তা সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদে গেলে হয়তো জানতে পারবেন। সেই দিনটা অন্তত জীবন মজুমদার যদি থাকে।...পৃথকভাবে অনুরোধ করবেন অনঙ্গমোহন।

অনেকের টোলেই খাতা ভরা নাম। বেশিরভাগই কাল্পনিক নাম। পরিদর্শক যে দিন আসবেন সেদিন সব ছাত্র থাকবেই এমন কোনো কথা নেই। অনঙ্গমোহন এইসব পারবেন ন। ঐ খাতায় দশ-বারটা মিথ্যা নাম ঢুকিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

খালপাড়ে গুলি খেলারত অসীম এবং বিলুকে ডাকলেন অনঙ্গমোহন।

—শুন। কথা আছে।

—অসীম তখন বিলুকে খাটাচ্ছিল। পাঁচ এ প্যাঁচা। ছয়ে ছ্যাঁচোর।

—শুন তোমরা। কথা আছে।

ওরা খেলা থামিয়ে সামনে দাঁড়ায়।

অনঙ্গমোহন বলেন, তোমরা তো পাড়ায় পাড়ায় টো টো কইরা বেড়াও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু-চাইর জনরে বুঝাইয়া আনতে পার না?

কোথায় আনব? বিলু জিজ্ঞাসা করে।

আমার টোলে।

—একথা বলেই মরমে মরে গেলেন অনঙ্গমোহন। কথাটা এমন করে বলা হল যেন কোনো কুটনীকে বলা হচ্ছে, রাজ অন্তঃপুরের জন্য নবযৌবনা নারী সংগ্রহ করার জন্য।

—আমরা কোত্থেকে লোক ধরব?

—না ঠিক এইভাবে ধইর না আমার কথাটা। লোক ধরবা ক্যান? তোমরা কি গয়ার পাণ্ডা? আসলে আমার কওয়ার উদ্দেশ্য—অনেকে আছে সংস্কৃত শিখতে চায় কিন্তু আচার্যের সন্ধান পাইতেছে না। তাদের আচার্যের সন্ধান দিতে পার তোমরা, আমার কাছে লইয়া আসবা। বলবা, সংস্কৃত শিক্ষা করতে পয়সা লাগে না। অবৈতনিক। বোঝলা না?

ওরা ঘাড় নাড়িয়ে চলে যায়। সাতে সাত ছেলের বাপ বানাবার জন্য গুলি টিপ করে অসীম। বৌমাকেও বলবেন নাকি অনঙ্গমোহন। যশবাবু লোকটি তো ভালই। বৌমাকে যদি বলা যায় তার অফিসের কেউ সংস্কৃতপ্রেমী আছে কি না? তার কপালের কুঞ্চনকে বড় ভয় অনঙ্গমোহনের। কথাগুলিও আজকাল বড় বক্রী। শান্তস্বভাবের বৌমা চোখের সামনে ক্রমশ ক্রূরা হয়ে উঠছে। এইসব বাইরে বের হবার ফল। মনুকে যতই সমালোচনা করা হোক না, মনুর বচন মিথ্যা নয়। গৃহবধূরা বাইরে বের হলে শৃঙ্খলা থাকে না।

চার-পাঁচ বছর আগেও এরকমটা ছিল না। পাঁচ-সাতজন ছাত্র সর্বদাই থাকত। তিন-চারজন প্রতি বছরই পরীক্ষা দিত। গত বছর পরীক্ষা দেবার কেউ ছিল না বলে অসীমকে গত বছর পরীক্ষায় বসিয়েছিলেন অনঙ্গমোহন। অসীম বলেছিল—আমি তো শিওর ফেল করব পিসামশয়। অনঙ্গমোহন বলেছিলেন, হ। তুই নিশ্চিত ফেল করবি। পাস-ফেল গুরুত্বহীন। এইটা তোর আমার জীবনধারণের প্রশ্ন। তুই ফেল কইর‍্যাই আমারে বাঁচা। অসীম মুখ বুজে পরীক্ষা দিয়েছিল। চুপচাপ ফেল করে এসেছিল।

এই বছর দুইজন পরীক্ষা দেবে ভাবা গিয়েছিল। অসীমকে কিছুটা পড়িয়েছেন অনঙ্গমোহন। এ বছর আদ্য পরীক্ষা দেবার কথা। আর সুমিতা। সুমিতার কথা ছিল উপাধি পরীক্ষা দেবার।

সুমিতা আসে না।

সুমিতা আসেনি দিন দশেক হয়ে গেল। ঐ ঘটনার পর আসেনি সুমিতা।

www.amarboi.com ~

বড় লজ্জা পেয়েছে ও। অজিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন কি না সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না অনঙ্গমোহন। যেন সেই প্রবাদ বাক্যের দেখন্তির লাজ। অজিতবাবুর মোকাসিন জুতোর মসমস তো কমেনি একটুকুও। গত দিনও ঐ ঘরে 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান' হল। সুমিতা আসেনি। গত রাতে অজিতবাবুর স্ত্রীর কান্না শুনেছেন বারান্দা থেকে। অসীম ঠেলা মেরে ডেকেছিল—পিসেমশাই। ঐ শোনেন—শিখার মা কাঁদে। চাপা আওয়াজ শুনেছিলেন অনঙ্গমোহন। প্রথমে ভেবেছিলেন, দাম্পত্যশব্দ। পরেই মনে হল, কান্না চেপে রাখার প্রচেষ্টা। তারপরই অজিতবাবুর কণ্ঠ। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর জয়া, তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছু বুঝি না। তুমি যা বলবে...

ফলমূলাদি দান করিয়া বালিকাকে, রতিযোগে তরুণীকে, প্রেমবাক্য দ্বারা প্রৌঢ়াকে বশীভূত করা যায়...

শোন জয়া, বিশ্বাস কর, তোমার কাছে গোপন করার কিচ্ছুটি নেই।

কোন গোপন ব্যাপার নিয়ে এত গণ্ডগোল? যে গোপন ব্যাপার অনঙ্গমোহন দেখেছিলেন সেই ঘটনা তো কেউ জানে না। কাকপক্ষীকেও বলেননি অনঙ্গমোহন। তখন, অন্যের দাম্পত্যসংলাপ শ্রবণ করা সমীচীন নয়, এই বিবেচনায় প্রস্রাব করে আবার শুয়ে পড়েছিলেন অনঙ্গমোহন।

আজ অনেক ভাবনার পর একটা মীমাংসায় এলেন অনঙ্গমোহন। উনি নির্বিকল্প নির্বিকারভাবে অজিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—আইচ্ছা, সুমিতা আসে না কেন, কিছু জানেন?

আসে না বুঝি?

না।

আমার গানের ক্লাসেও আসেনি।

শরীর অসুস্থ হইল নাকি?

কে জানে?

ঠিকানাটা জানেন নাকি?

অজিতবাবু একটু গলার জোড় বাড়ালেন। কার ঠিকানা—সুমিতার? ঠিকানা তো নেই। ছিল, হারিয়ে-টারিয়ে গেছে। রান্নাঘরে অজিতবাবুর স্ত্রী আছেন। রান্নাঘর থেকে ঐ ঠিকানা না থাকার বাক্যরচনা কি উনি শুনতে পাবেন?

অনঙ্গমোহনের কাছেও ঠিকানা ছিল। কাব্যের আদ্য এবং মধ্য পরীক্ষা দিয়েছে। আজ চার বছর যাবৎ সংস্কৃত শিক্ষা করছে সুমিতা। পরীক্ষার সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিকানার দরকার হয়। কোথাও লেখা আছে নিশ্চয়ই। খুঁজতে থাকেন। একটা ১৯৫৭ সালের ডায়েরি ছিল, যার মধ্যে যাবতীয় ঠিকানা লেখা। হরি ঘোষ স্ট্রিটে থাকে সুমিতা, এটা জানেন অনঙ্গমোহন। কিন্তু ঐ ডায়েরিতে পেলেন না। বছর চারেক আগে একটি কাগজে একটি ছন্দোবদ্ধ ঠিকানা দিয়েছিল সুমিতা। কোনো একটা বইয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন অনঙ্গমোহন। কোন বই মনে পড়ছে না কিছুতেই। পরীক্ষার ফর্ম পূরণ তো সুমিতা নিজেই করত ইংরাজি ভাষায়। বইগুলির পৃষ্ঠা ওল্টাতে থাকেন অনঙ্গমোহন। অবশেষে শ্রীহর্ষ রচিত 'নৈষধ' চরিত বইটির মধ্যে ঠিকানাটা পেয়ে গেলেন অনঙ্গমোহন—

'আমার ঠিকানা যদি কভু চাহ কেহ
হরিঘোষ স্ট্রীটস্থ একুশ নম্বর গৃহ।'

ঠিকানা তো পাওয়া গেল। এবার প্রশ্ন সুমিতার বাড়ি যাওয়া উচিত কি না। গত চার বছরে সুমিতা কখনই তেমনভাবে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করেনি। কয়েকবার বলেছে পণ্ডিতমশাই, আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাব। আমার বোনেদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। মা খুব খুশি হবেন। সুমিতা পিতৃহীনা। তবে সম্পত্তির আয়ে তাদের চলে—এই কথা অনঙ্গমোহন জানেন।

অনঙ্গমোহন স্থির করেন সুমিতার বাড়িতেই যাবেন। বয়ঃপ্রাপ্তা নারীর কামবাসনা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর কামবাসনার দৃষ্টান্ত তো অজস্র। তবু কেন সুমিতার কথা মনে হতেই পাপিষ্ঠা শব্দটি মনে আসে? কেন স্খলিতা শব্দটি মনে আসে? পরপত্নী সম্ভোগার্থে দেবরাজ ইন্দ্রের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। শুধু ইন্দ্র কেন, বরুণ, বায়ু অনেকেই। তাদের তো পাপিষ্ঠ বলি না। ক্যান? সে দিন ঐ নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে কী হয়েছিল? কালিকা পুরাণের কপোতমুনি যেমন বলেছিলেন—সুন্দরী! তোমাকে দর্শন করিয়া অবধি তোমার সম্ভোগের নিমিত্ত কাম আমাতে সঙ্গত হইয়া নিরন্তর পীড়া দিতেছে তার উপশম কর।

তারপরই কি 'ইঃ, জর্দার গন্ধ?'

তাই কি? সুমিতা কি পড়েনি কামের বিচিত্রলীলা। হে বিশালাক্ষী, দেখ দেখ ঐ চটকপক্ষী নিজ প্রিয়ার উৎসঙ্গে থাকিয়া পুনঃ পুনঃ রমণ দ্বারা কামীদিগকে উৎকণ্ঠিত করিতেছে। ঐ দেখ মাংসস্বাদ তৃপ্ত সিংহ নিজ প্রিয়াকে পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছে এবং স্বয়ং প্রিয়া কর্তৃক লিহ্যমান হইয়া প্রীতি অনুভব করিতেছে। ঐ দেখ, মার্জারী ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া স্বীয় উদর প্রদর্শন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিতেছে আর মার্জার তাহাকে নখদন্তে দংশন করিতেছে বটে কিন্তু মার্জারীর তাহাতে সুখ জন্মিতেছে।

সুমিতা তো ত্রিংশতি বর্ষীয়া অনূঢ়া নারী।

কিন্তু সতী ধর্ম? সতী ধর্ম তো হিন্দু আদর্শ। ম্লেচ্ছ জীবনধর্মে সতীত্বের এতটা মূল্য নাই। কন্দর্প—মদন কথা পড়তে পারে, রতিবর্ণনা পড়তে পারে কিন্তু সতীত্ব ধর্ম থেকে বিচলিত হওয়া তো চলবে না। সুমিতার এটা অন্যায়।

কিন্তু আচার্য তো অভিভাবকতুল্য। শিক্ষাগুরু। পাঠ্যবিষয় ব্যতিরেকেও জীবনের সমস্ত শিক্ষাই তো আচার্যেরাই দেয়। এ স্থলে আচার্যের কর্তব্য কী?

আচার্য অনঙ্গমোহন স্থির করেন, সুমিতার বাড়িই যাবেন। ইনস্‌পেকটার আসছে সুমিতা, টোলে আস শিগগির।

অনঙ্গমোহন একটা চিঠি পেলেন খামে। ছাপা প্যাডে কামাখ্যাচরণের হস্তাক্ষর সম্বলিত চিঠি।

সর্ববিদ্যা গণনালয় ও দীনময়ী চতুষ্পাঠী।

চতুষ্পাঠী? চতুষ্পাঠী কবে করল কামাখ্যাচরণ?

কামাখ্যাচরণ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক? দীনময়ী তাঁর মায়ের নাম। মাতৃনামে চতুষ্পাঠী। ব্যাকরণতীর্থ তো আছে, চালাইতেই পারে। কিন্তু অনুমোদন? নতুন চতুষ্পাঠীর অনুমোদন তো বন্ধ আছে কিছুকাল যাবৎ। রাজদ্বারে জানাশোনা থাকলে সকলি সম্ভব। আর গণনালয়? জ্যোতিষশাস্ত্রের উপাধি তো কিছু নাই তার। তবে দেশের সত্যই তো দুর্দিন। অনায়কা বিনশ্যান্তি নস্যান্তি শিশুনায়কঃ। সুতরাং অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।

আবার পড়তে থাকেন অনঙ্গমোহন।

সর্ববিদ্যা গণনালয় ও দীনময়ী চতুষ্পাঠী।

গুপ্তপ্রেস ও বিদ্যানিধি প্রভৃতি পঞ্জিকার অনুমোদক। সিদ্ধপুরুষ সর্বানন্দ বংশীয় মহামহাধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন ন্যায়ভূষণের প্রপৌত্র শ্রীকামাখ্যাচরণ চক্রবর্তী ব্যাকরণতীর্থ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী। মতিলাল কলোনী। ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ ভগবান্নামশতক। অপ্রকাশিত গ্রন্থ স্ত্রী চরিত্র। নীতিকথা। ধ্যানমালা। সেবক—মতিলাল কলোনীর প্রসিদ্ধ সর্ববিদ্যা শ্রীশ্রীকালীমন্দির। এখানে সুলভে কোষ্ঠি, ঠিকুজি প্রস্তুত, যোটক বিচার, প্রশ্নগণনা, স্বপ্নফল বিচার, কবচ সংস্কার হইয়া থাকে। মণি ও মূল ধারণ সম্পর্কে পরামর্শদান ও গ্রহশান্তির জন্য পূজা ও স্বস্ত্যয়নাদি করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর চিঠি। সাদর সম্ভাষণমাবেদনমিদম। পূজা কমিটির সহিত সবিশেষ কথা কহিয়া রাখিয়াছি। তুমি নিশ্চিত আসিও। আমার স্বহস্ত লিখিত পাতি ছাড়াও পুরোহিত-দর্পণ মদগৃহে আছে। পঞ্চাশাবধি টাকা দক্ষিণা দিতে হইবে এই মর্মে সেক্রেটারির সহিত কথা কহিয়া রাখিয়াছি। ইতি। ত্বদেক শর্মশর্মণঃ কামাখ্যাচরণ দেবশর্মণঃ।

কামাখ্যা। তুমি জ্যোতিষও ধরলা। তুমি তো ব্যাকরণ পড়ছ। পাণিনির ঘটনা মনে নাই? তার হাতে ভাগ্যরেখাই ছিল না। জ্যোতিষী কইল পাণিনি, তোমার জীবনে কিচ্ছু হইবে না। তুমি নির্বুদ্ধি, ভাইগ্যহীন।

জ্যোতিষবিদ্যা ঠিক না বেঠিক অনঙ্গমোহন জানেন না। তবে জানেন, চাঁদে মানুষ গেছে। মঙ্গলের ছবি আসছে পৃথিবীতে। রাহু আর কেতুর অস্তিত্ব নেই। এই যে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে এত লোক মারা যাচ্ছে তাদের সবারই কি মৃত্যুযোগ এই সময়ে ছিল? সুমিতার ঘর্মাক্ত হাতে একদিন অনঙ্গমোহন লক্ষ করেছিলেন, বাল্যবৈধব্য রেখা। তবে কি ভৃগু পরাশর জৈমিনী মিথ্যা? ঋষিবচন মিথ্যা? মিথ্যা ভাবতে সংস্কারে বাধে ব্রাহ্মণসন্তান অনঙ্গমোহনের। তবে ভৃগু-পরাশর-জৈমিনী কারুর সঙ্গেই কারু মিল নেই, একথা অনঙ্গমোহন জানেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই, জ্যোতিষ বড় জটিল বস্তু। উত্তম জ্ঞান না থাকলে, অপাদান শুদ্ধি না থাকলে জ্যোতিষচর্চা করা উচিত নয়। কামাখ্যা যা করছে তা অর্থের জন্য। অর্থের জন্য এত দুঃখ।

অর্থানামর্জ্জনে দুঃখ মর্জ্জিতানাঞ্চ রক্ষণে
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং কিমর্থং দুঃখভাজনম্।

অর্থ অর্জনেও দুঃখ, অর্জিত অর্থের রক্ষণাবেক্ষণেও দুঃখ। নাশে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ।

কামাখ্যা তুমি এখন অধম। ধনলোভী। অধমা ধনমিচ্ছন্তি। মানোহি মহতাং ধনং। মানীলোকের সম্মানই ধন।

অনঙ্গ, এই যে বড় বড় কথা কও, উচ্চমার্গের চিন্তা কর, প্যাটে দিবা কী? যাবন্মুখংগতং পিণ্ডং তাবন্মধুরভাষণং। যতক্ষণ খাদ্য, ততক্ষণ মধুর মধুর কথা। সুতরাং মীমাংসা এই—ভো ভো—পাষণ্ড। তুই ছাত্রীবাড়ি যা।

ছাত্রীবাড়ি বিশাল বাড়ি। বাহির মহল—ভিতর মহল। বাহির মহলে ওয়েলকাট সেলুন প্রোঃ মধুসূদন প্রামাণিক। প্রজ্ঞা সোস্যালিস্ট পার্টির কার্যালয়, স্বস্তিকা প্রেস। প্রেসের একজনকে সুমিতা দত্তর নাম জিজ্ঞাসা করাতে বলে দিল—দোতলায়।

সরু সিঁড়ি। পলেস্তারা থেকে একটা প্রাচীন গন্ধ উঠে আসছে। কাঠের রেলিং বড় দুর্বল। কোনোমতে দোতলায় উঠলেন। দোতলার বারান্দার পাশেই বেশ কয়েকটা কয়লার ড্রাম দেখতে পেলেন অনঙ্গমোহন। আবার কয়লা। সেই কয়লার ড্রাম।

এই যে সুমিতাকে দেখেন অনঙ্গমোহন, প্রসাধনে পদ্মগন্ধা, আয়তলোচনা, শ্যামাঙ্গী, ঈষৎ ন্যুব্জ—সুরসিকা, বিদ্যাপরাত্মা, এভাবে থাকে?

লম্বা বারান্দার প্রথম ঘরে জিজ্ঞাসা করলেন অনঙ্গমোহন, সুমিতা কোন ঘরে থাকে। একজন লুঙ্গিপরা গেঞ্জি গায়ে দেওয়া লোক বেরিয়ে এল।

কোন সুমিতা? খ্যাংড়া সুমিতা না মুটকি সুমিতা?

—সুমিতা দত্ত।

—এ বাড়িতে সবাই দত্ত।

—এত ঘর প্রত্যেকেই দত্ত বংশীয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এগারো ঘর। তা আপনি কী জন্য এসেছেন বলুন ঠাকুরমশাই, বুঝে নেব। মনে হয়, আপনি ঘটক, তবে খ্যাংড়াদের ঘরে যান। পাঁচটা ছেড়ে দিয়ে। আমি আবার সিনেমার সিট দেখাই কি না, তাই ঠিকভাবে বললুম।

—আমায় দেইখ্যা ঘটক মনে হয়? আমি ঘটক? ঘটকালি করি?

ঐ হল আর কি। বামুনের তিন ফুঁ। শাঁখে ফুঁ, মানে পুজো করা বামুন, কানে ফুঁ মানে মন্তর দেয়া বামুন, আর উনুনে ফুঁ মানে রান্নার বামুন। এছাড়া চার নম্বর বামুন হল ঘটক। আপনি কোনটা?

—আমি অধ্যাপক।

—ঐ হল আর কী। তবে মনে হচ্ছে, মোটাটার ঘরেই যাবেন। এক্কেবারে কোণার ঘর। ন'কাকার মেয়ে।

অনঙ্গমোহন লম্বা বারান্দা দিয়ে সামনে এগিয়ে যান। বারান্দার লোহার রেলিং-এর উপর শুকোচ্ছে লুঙ্গি, জামা, শাড়ি, সায়া, ছোটজামা। কোথাও ঝুলছে টিয়ার খাঁচা, কোনো ঘরের সামনে তুলসীগাছ। পায়ের তলায় পাথরের মেঝে। সাদা পাথরের। পাথরের ওপর ছোপ ছোপ দাগ। একেবারে শেষ ঘরের সামনে দাঁড়ালেন অনঙ্গমোহন। দরজা বন্ধ। দরজা ধাক্কা দিতেই কর্কশ কণ্ঠে—কে র‍্যা?—শুনে আর দরজায় ধাক্কা দিলেন না অনঙ্গমোহন। একটি সতের-আঠার বছরের তরুণী দরজা খুলল। আর দরজা খুলতেই অন্য একটি বালিকা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চৌকির তলায় সেঁধিয়ে গেল। ঠিক বালিকা তো

নয়, যুবতী। যুবতীলক্ষণ সবই আছে। কোমর থেকে নিচের অংশটুকু সরু। ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে পা-টা টেনে নিয়ে চলেছে মেয়েটা।

অনঙ্গ বললেন—সুমিতার খোঁজে এসেছিলাম আমি।

ও। আপনার কাছেই বুঝি দিদি সংস্কৃত শেখে?

হ্যাঁ।

আবার কার খোঁজে এয়েচে র‍্যা? হতচ্ছাড়িটাকে চায় তাই না? বলে দে, ওকে দেবে না। নিতে হয় সেজটাকে নিক।

মেয়েটি চিৎকার করে উঠল মা, তুমি থামো।

—থামব? একটুও থামব না আমি। থ্যাটারে নাচাবে আর আমি চুপ করে থাকব? দে আমার গয়না, দে। দে আমার ঝুমকো...

মেয়েটি বলে—কিছু মনে করবেন না। মা মাঝে মাঝে এরকম করে।

অনঙ্গমোহন দেখলেন বিশাল খাট, সিংহের থাবার মতো পায়া। খাটের কোনায় বসে বিড় বিড় করে যাচ্ছেন সুমিতার মা—ঐ প্রৌঢ়া মহিলা। দেয়ালে প্রাচীন দেরাজ। বন্ধ দেয়ালঘড়ি। ফ্রেমে বাঁধানো দুখানি বিশাল ছবি প্রায় কালো হয়ে এসেছে। অনঙ্গমোহন ঐ দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে?

—আমাদের পূর্বপুরুষ। ঠাকুর্দার বাবা আর মা। ছবিদুটো এ ঘরেই রয়ে গেছে।

ঐ বংশের সবাই এখানে?

—তা কেন? দত্ত বংশ কত বড় বংশ। আমাদের জ্ঞাতিরা কেউ আছে বালিগঞ্জ, কেউ নিউ আলিপুর। সব বাড়ি করে চলে গেছে। শ্রীরামপুর-বালিতেও আছে। আমরা যারা বাড়িটাড়ি করতে পারিনি, তারাই এখানে আছি।

—সুমিতা কোথায়?

—বড় দি এখন কোথায় তা কি জানি আমি? কখন কে কোথায় যায়—আপনার কাছে যায় না?

—বহুদিন যায় না।

—যায় না বুঝি? সময় পাচ্ছে না হয়তো। কত কাজ দিদির। তিনটে-চারটে টিউশনি, গান শেখা, ভাড়া আদায়, সংস্কৃত শেখা...

—ভাড়া আদায় মানে?

জ্ঞএকতলায় ভাড়াটে আছে না? আমাদের ভাগে প্রেসটা, আর একটা ঘর। বিহারিদের ভাড়া দেওয়া আছে। এভাবেই তো চলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তোমার অন্য ভগিনীরা?

মেজদি তো নাটকটাটক করে। আমার পরের বোনটাকে দেখলেন—হাঁটতে পারে না। ছোটবেলায় পোলিও না কি হয়েছিল।

তুমি?

—আমি বিএ-তে ভর্তি হয়েছি মণীন্দ্র কলেজে।

এসব কিছুই জানতেন না অনঙ্গমোহন। এত কথা সুমিতা কিছুই বলেনি। শুধু এটুকুই জানতেন যে, সুমিতা পিতৃহীনা। জানতেন, তাদের ভাই নেই, কিন্তু তারা চার বোন। জানতেন তারা দত্তবংশীয় কায়স্থ।

—দিদি এলে কিছু বলতে হবে ঠাকুরমশাই?

অনঙ্গমোহন এ মুহূর্তে ঐ মেয়েটির ভ্রম সংশোধনের ইচ্ছা হল না।

—তোমার দিদি পড়তে যায় না। সেই কারণে চিন্তিত আছি। কইও, অবশ্য যেন যায়। এ কথা বলেই অনঙ্গমোহনের মনে হল—এই বাক্যের মধ্যে ততটা ওজন নেই। তখন বললেন—কইও ইন্সপেক্টার আইবে। টোল পরিদর্শন হইবে। তার এখন নিয়মিত আসাটা প্রয়োজন। একথা বলে আবার অনঙ্গমোহনের মনে হল—এই কথার মধ্যে ততটা টান নেই। তখন বললেন—কইও আচার্য, অর্থাৎ আমি প্রবল উৎকণ্ঠার মধ্যে আছি। সে যেন যথাশীঘ্র আমার সঙ্গে দেখা করে। আর কারোর সঙ্গে নয়, শুধু আমার সঙ্গে। বোঝলা? এই কথা বলে চলে যাচ্ছিলেন অনঙ্গমোহন। মেয়েটি সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

সিঁড়িতেই সুমিতার মুখোমুখি হলেন অনঙ্গমোহন। সুমিতা চমকে গিয়ে মাথা নিচু করে রইল। অনঙ্গমোহনও তখন স্থির। সুমিতা মুখ নিচু করে অস্ফুট স্বরে বলল—অজিতবাবুর অফিসে রিসেপশনিস্ট-এর চাকরি খালি আছে। এরপর আর কোনো শব্দ ছিল না। কোনো কথা ছিল না। অনঙ্গমোহন দেখলেন, সুমিতার গালের দুপাশে জলের রেখা। অনঙ্গমোহনের ইচ্ছা হল, সুমিতার চিবুক স্পর্শ করে বলেন—হে জল, হে চক্ষুনির্গত জল পৃথিবীর মঙ্গলকারক হও। ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যা শমনঃ সন্তুঃ নূপ্যাঃ। অনঙ্গমোহন কিছুই বললেন না। আর দাঁড়ালেন না। আস্তে আস্তে সুমিতার পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে এলেন।

রাস্তা দিয়ে একা একা হেঁটে যাচ্ছিলেন হাতিবাগানের দিকে। সুমিতা কাঁদে কেন? অনুতাপে কাঁদে। অনুতাপ তো মহতের লক্ষণ। ব্রহ্মা বলিলেন, হে ঋষিগণ। প্রকৃতি হইতে প্রথমত মহত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ মহত্ত্বকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমুদয় সৃষ্টির আদি সৃষ্টি বলিয়া কীর্তন করা যায়। ঐ মহাপ্রভাবসম্পন্ন মহত্ত্ব সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা অণিমা লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশান, অব্যয় ও জ্যোতিস্বরূপ।

পিছু ডাক শুনলেন অনঙ্গমোহন। আচার্যদেব...পিছনে সুমিতা। অনঙ্গমোহন দাঁড়ালেন।

সুমিতা এগিয়ে আসে।

—কিছু না বলে চলে যাচ্ছিলেন যে?

—বলার কীই-বা আছে।

—কিছুই বলার নেই?

অনঙ্গমোহনের যেটা বলার আছে, সেটা আসল বলা, সেই বলাটা ঝপ করে বলে ফেললেন—ইন্সপেক্টার আসতাছে। এখন কামাই কইরো না সুমিতা। রোজই আসা দরকার।

—ঠিক আছে, আসব।

—পরীক্ষা সামনে। ঠিকমতো অধ্যয়ন দরকার।

—আচ্ছা, করব।

—আচ্ছা সুমিতা, একটা কথা জিগাই, কাব্যতীর্থ হইয়া তুমি কী করবা?

—জানি না।

—তুমি তো শুধু কাব্যসুধা লাভ করবার জন্য কাব্যপাঠ করতাছ, এটাই কি সত্য?

—এটা সত্য নয়। আচার্যদেব—

—তবে?

—জানি না। আমার তো করার কিছু নেই পণ্ডিতমশাই। সবই তো দেখে গেলেন আমাদের অবস্থা। আচ্ছা কাব্যতীর্থ হয়ে একটা টোল খুলে দেখা যায় না?

—টোল খুলবা? ক্যান?

—এই ধরুন। যদি মাসে চল্লিশ, পঞ্চাশ টাকা যা পাওয়া যায়—আসলে এটা একটা কথার কথা। টোল খুলতে যাব কেন, আর টোলে পড়াবার মতো আমার যোগ্যতাই-বা কী আছে। এমনি ভাবছিলাম। আসলে অজিতবাবুর কাছে গান শিখতে যেতাম। আপনি পাশের ঘরে পড়াতেন। ভাবলাম, যাই শিখি, পয়সা যখন লাগছে নাজ্ঞতারপর উৎসাহ পেয়ে গেলাম। ভাল লাগতে লাগল। এই আর কী, আচ্ছা পণ্ডিতমশাই, কাব্যতীর্থ হয়ে গেলে স্কুলে চাকরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় না—স্কুলে?

—তা হয়তো হয়। তোমার তো বিএ ডিগ্রি আছে...আমার তো ঐসব ইংরাজি ডিগ্রি-টিগ্রি নাই। তোমার হবে।

—তাও হবে না, পণ্ডিতমশাই। ইস্কুলে তো ক্লাস এইটে নমো নমো করে একটু সংস্কৃত পড়ানো হয়, টিউশনি করছি তো, দেখছি সংস্কৃত কী পড়ানো হচ্ছে। তারপর ক্লাস নাইন থেকে তো আর সংস্কৃত নেই। শুধু যারা আর্টস পড়ে, তাদের সংস্কৃত আছে। চাকরির স্কোপ মানে সুযোগ কমে গেছে খুব।

—দেশের মহতী বিনষ্টি আশঙ্কা কইর‍্যা আমাগোর ধ্যানেশনারায়ণ, ব্যারিস্টার নির্মল দাশগুপ্ত, আইসিএস সত্যেন মোদক বহু দরবার করছিল। আমার কাছে সই চাইল অরা, সই দিলাম, মিছিল কইরা হরেন চৌধুরীর কাছে গেলাম। হরেন চৌধুরী ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। কম করি নাই।

তারপর?

—একটা কমিটি হইল। উনিশশ ষাইট সালে। সেই কমিটিতে সুনীতিবাবু, শ্রীকুমারবাবু, তারপর বৈজ্ঞানিক কি বোস যেন?

—সত্যেন বোস?

—হ হ, সত্যেন বোস, শিশির মিত্র, এছাড়া গৌরীনাথ শাস্ত্রী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত আরও সব বড় বড় লোকজন ছিলেন। সেই কমিটির অভিমত ছিল—পঞ্চম হইতে অষ্টম শ্রেণির প্রত্যেকের সংস্কৃত শিক্ষা আবশ্যিক, আর বিজ্ঞান বাণিজ্যাদি শাখা ছাড়া অন্য শাখায় এগার শ্রেণি পর্যন্ত সংস্কৃত আবশ্যিক কর। কিন্তু সেই অভিমত গ্রাহ্যই হইল না।

—এখন সাইন্সের আর কমার্সের ছেলেরা আর স্যাংস্কৃট পড়ছে না।

—শুনেছি, পাশ্চাত্যে ডাক্তারিতেও ল্যাটিন ভাষা পাঠ্য হচ্ছে, জার্মান দেশের লোক সংস্কৃত শিখতাছে। আর আমরা কেরেবাই কেরেবাই করতাছি। সব আছে। সংস্কৃত ভাষায় সব আছে। ন জানে বিদ্যতে কিং তন্ন্যার্ধূবমত্র সংস্কৃতে। সংস্কৃত ভাষা হীরার খনি। জাপানে যে অ্যাটম বোম ফেলল আমেরিকা, সেই ফর্মুলা তো শুনেছি সংস্কৃতে ছিল। এক সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান সাহেব সংস্কৃত মন্থন কইর‍্যা উদ্ধার করেছিলেন।

সুমিতা ছদ্ম অবাক হল। বলল—তাই নাকি?

—এই যে নামীদামী বিলাতি ঔষধ। সব ফর্মুলা আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আছে।

—ও।

—এই যে যুদ্ধ হইল। প্যাটন ট্যাঙ্ক। মিগবিমান, মর্টার। কিছুই নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়। বিমান তো রঘুবংশম্-এ দেখেছই। অগ্নিবাণ, জলবাণ, সর্পবাণ এইসব রামায়ণ-মহাভারতেই আছে।

—তাই তো...

—আসলে এইসব আর কেউ চিন্তাই করে না। সংস্কৃতের ওপর অবহেলায় দেশের যে কী ক্ষতি হইতেছে...কী নাই সংস্কৃত ভাষায়? ধ্বনির্বিজ্ঞান, ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, অঙ্কশাস্ত্র..শ্রীধরাচার্যের নাম শুনছ তোমরা?

—না পণ্ডিতমশাই।

অঙ্কবিদ্। শ্রীধরাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত। এই যে ইনজিনিয়ার ইনজিনিয়ার কও তোমরা—সংস্কৃতে ইনজিনিয়ারিংও পড়ানো হইত। বিশ্বকর্মা কত বড় ইনজিনিয়ার। আমি বিশ্বকর্মাকে স্বর্গস্থিত দেবতা মনে করি না। স্বর্গনামক স্থানটি সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। বিশ্বকর্মা মানুষ। আর ময়দানব? তার মতো ইনজিনিয়ার আছে কে? ময়দানব ইচ্ছা করলে এরকম দশটা হাওড়ার পুল বানাইতে পারত। ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানব কী করছিল শুনবা?

—কী পণ্ডিতমশাই?

—অগ্নির অনুরোধে অর্জুন খাণ্ডব বন দহন করলেন। ঐ বনে থাকত এক দানব, তার নাম ময়। ময় আর্তনাদ কইরা কয়—রক্ষা কর হে ধনঞ্জয়। অর্জুন তারে বাঁচাইবার চেষ্টা করতেই কৃষ্ণ বিরত করলেন। কৃষ্ণ কইলেন, তোমার প্রাণের বিনিময়ে অর্জুনরে কী দিবা কও। ময় কইল—আমি কী দিমু? আমি স্থাপত্যবিদ্যা ছাড়া আর তো কিছুই জানি না, তখন শ্রীকৃষ্ণ কইলেন—তবে হে ময়, তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে নির্মাণ কর এমন এক মনোহরপুরী যার তুলনা পৃথিবীতে নাই।

—এসব কি সত্যি কথা পণ্ডিতমশাই?

ময়দানবের এই গল্পটা সত্য কি না জানি না। তবে ইন্দ্রপ্রস্থ যে সত্য তাতে সন্দেহ কী! আর ময়দানবও সত্য। ময়দানব ছিলেন রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর পিতা। রাবণের লঙ্কাপুরী তো ময়দানবেরই করা।

—কিন্তু পণ্ডিতমশাই, কাগজে পড়লাম, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন এঁরা বলছেন, রামায়ণের লঙ্কা মানে সিংহল নয়, তারপর পুষ্পকরথ কবি-কল্পনা। লঙ্কাপুরীর বর্ণনায় সত্যের চেয়ে কল্পনা বেশি।

—তাঁদের মাথা খারাপ হইয়া গেছে গিয়া। তাঁরা তো পাশ্চাত্য-ঘেঁষা লোক। তাঁরা কী জানেন? এইসব কুক্কুট মাংসভুক আধুনিক সংস্কৃত-জানা গবেষকরা কোন্ দিন কইবে ভাস্করাচার্য মিথ্যা, আর্যভট্ট মিথ্যা, চরক-পতঞ্জলি

মিথ্যা। শল্যচিকিৎসা মিথ্যা। গণেশের যে হাতির মাথা, এটা একটা কঠিন শল্যচিকিৎসা নয়?

—আর্যভট্ট-চরক-পতঞ্জলির সঙ্গে ঐ গণেশের ব্যাপারটা মিলিয়ে নিচ্ছেন পণ্ডিতমশাই?

—ক্যান? দোষটা কী তাতে? সবই তো প্রাচীন ভারতের ব্যাপার। এই যে নারদ যে ঢেঁকির উপর শূন্যমার্গে বিচরণ করত, সেইটা কী? হেইডা তো রকেট। কাগজে রকেটের ছবি দেখি না? অ্যাক্কারে ঢেঁকির মতন। ইংরাজি পড়া আধুনিক পণ্ডিতরা কইবে নারদ মিথ্যা। তাইলে রাম মিথ্যা, কৃষ্ণ মিথ্যা, বাণভট্ট মিথ্যা, কালিদাস মিথ্যা...

আপেল মিথ্যা, নেশপাতি মিথ্যা, আঙুর মিথ্যা...ফলের দোকানগুলি অতিক্রম করছিলেন অনঙ্গমোহন। এই যে থরে-বিথরে সজ্জিত সুমিষ্ট ফলাদি তাহা টুলোপণ্ডিতের ভোগের নিমিত্ত নহে। পুনঃ পুনঃ উল্লম্ফন করিয়াও শৃগাল যখন উচ্চে সন্নিবিষ্ট দ্রাক্ষাফলগুলি স্পর্শ করিতে অপারগ হইল তখন শৃগাল সিদ্ধান্ত করিল যে...

—এখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন পণ্ডিতমশাই?

—না, এমনই।

—কটা আঙুর খাবেন, পণ্ডিতমশাই?

—নাঃ। আঙুর এখন টক।

—দিই না কিছুটা।

নাঃ, দরকার নাই। তুমি বরং আমার চতুষ্পাঠীতে নিয়মিত আসো। ইন্সপেক্টার আসতাছে।

এবারকার পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে বাঙালিদের জয়জয়কার। মেজর জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী। এয়ার ভাইসমার্শাল রঞ্জন দত্ত। ছয়টি প্যাটন ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছেন একা মেজর ভাস্কর রায়। কাশ্মীর যুদ্ধে অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়েছেন অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

যুদ্ধে নেমে পড়েছে অসীম চক্রবর্তী। বিপ্লব ভট্টাচার্য। ছাত্রধরার যুদ্ধ। অসীম ইস্কুলের গেটের ধারে পোস্টার সেঁটে দিয়েছে আঠা দিয়ে—বিনা পয়সায় সংস্কৃত শিক্ষা। সংস্কৃত শিখিয়া উপাধি লাভ করা যায়। যোগাযোগ করুন পণ্ডিত অনঙ্গমোহন ভট্টাচার্য, ঠিকানা...

বিলু বাবলুদাকে বলল বাবলুদা, বিকম পাস করে অফিসে চাকরি পেয়েছে। অনেক পড়ে। ঘরে অনেক বই। রাষ্ট্র ও বিপ্লব, ভোলগা থেকে

গঙ্গা, কী করিতে হইবে, পদাতিক, ছাড়পত্র, ঘুম নেই, আরও কত কী। বিলু বলল—দাদুর কাছে সংস্কৃত পড়ো না, বাবলুদা। বাবলু বলল—ধুস্। পাড়ার অভয়দা সাহিত্যিক। 'গলিত হৃদয়' নামে বই আছে। ওয়াল ম্যাগাজিনের সম্পাদক। হাতে সবসময় বই থাকে। অভয়দাকেও বলল বিলু। অভয়দা বলল, সংস্কৃত তো খুব ভাল জিনিস। তবে এখন তো টাইম নেই। 'দুঃস্বপ্নের কাল' নামে একটা যুগান্তকারী উপন্যাস শুরু করেছি। ওটা আগে শেষ হোক।

ন্যাড়াদা বাগবাজারের মোড়ে ফুটপাতে চায়ের দোকান দিয়েছে। বিলুকে দেখে ন্যাড়াদা বলল, আরে বিলু যে, বহুদিন পর। কী খবরটবর বল। কালির বড়ি ঝাড়ছিস না আর?

বিলু লজ্জা পেল। সেই কবেকার কথা মনে রেখে দিয়েছে ন্যাড়াদা।

বিলু বলল, কী যে বল ন্যাড়াদা। এসব মনে রেখে দিয়েছ?

—খারাপ জিনিসগুলো কিন্তু মনেই থেকে যায়। আমি যা যা খারাপ কাজ করেছি, ভুলিনি।

—এখন আর খারাপ কাজ কর না?

—চেষ্টা করি যাতে না করতে হয়।

—একটা ভাল কাজ করবে? উপকার?

—কী উপকার? তোর?

—হ্যাঁ। মানে আমার দাদুর। আমার দাদুর টোলের মেম্বার হবে? মানে ছাত্র? আমিও হয়েছি। কঠিন কিছু নয়। পরীক্ষায় বসবে। দাদুই ইম্পর্টেন বলে দেবে। পয়সা লাগে না।

—মাগ্না?

—হ্যাঁ।

—তাতে তোর দাদুর লাভ?

—লাভ মানে গভমেন্ট থেকে একটা টাকা পায় দাদু।

অসীমের ইস্কুল থেকে কয়েকজন ছাত্র এল।

বলছে, পণ্ডিত স্যার কোন্ ঘরে থাকে?

শিখার বাবা বললেন, পণ্ডিত স্যার? পণ্ডিত আবার স্যার হলেন কবে থেকে?

ছেলেরা বলল—অনঙ্গমোহন ভট্টাচার্য...

এসব শুনে অনঙ্গমোহন এগিয়ে এলেন। বেশ পুলকিত হলেন। চারজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্র। আহা। বাতাপি। বাতাপি।

একটি ছেলে বলল—আপনি নাকি স্যার বিনে পয়সায় সংস্কৃতের টিউশনি করবেন, সেইজন্য এলাম। অনঙ্গমোহন বললেন—বিনা পয়সায় টিউশনি ক্যান? একটি ছেলে বলল—হয় না? অনেকে পুণ্য করার জন্য ফিরিতে কাপড় দেয়, কম্বল দেয়, দরিদ্রনারায়ণ ভোজন হয়...

অন্য একটা ছেলে বলল—আমাদের কুশারীবাবু স্যার যেমন ভাল ছেলেদের ফিরিতে পড়ায়—সেরকম আপনিও সংস্কৃত ফিরিতে পড়াবেন শুনলাম...

অনঙ্গমোহন তখন বুঝিয়ে দেন ব্যাপারটা। স্কুলের সংস্কৃত আর টোলের সংস্কৃত পাঠের মধ্যে প্রচুর তফাত। তবে এটাও বললেন—টোলে ভর্তি হয়ে যদি আদ্য পরীক্ষা দেবে বলে কথা দেয় তারা, উনি বিনা দক্ষিণায় ব্যাকরণ কৌমুদী বুঝিয়ে দেবেন।

—পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী, লট, লোট, অনুজ্ঞা—এসব হেভি কঠিন। বুঝিয়ে দেবেন?

—দেব।

—ট্রানস্লেশন?

—বাংলা থেকে সংস্কৃতে করিয়ে দেব।

—ঠিক আছে, তাহলে পড়ব।

তখন টোলের পাঠ্যবইগুলি দেখান অনঙ্গমোহন।

সন্ধিবৃত্তি, অমরকোষ, মিত্রলাভ।—

ও বাব্বা, হেভি কঠিন। এসব পারব না।

অসীমদের স্কুলের বিমলেন্দুবাবু একদিন হাজির হয়েছিলেন। অনঙ্গমোহনের সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিলেন। 'বাংলা পড়াই, বিএ-তে স্যাংস্কৃট ছিল। এম এ ইন-বেঙ্গলি'। অনঙ্গমোহন কোথায় বসাবেন ভেবে পান না। ঘরে এক্ষুণি বৌমা ঢুকবে। দরজা বন্ধ করে কাপড় ছাড়বে। আপিস যাবার কাপড় পরবে। ঘরের সামনের বারান্দাটায় টুকরোটুকু, যা অনঙ্গমোহন এবং অসীম ভোগ করে থাকে, যে বারান্দায় কোনো চৌকি নেই, চেয়ার নেই, সেই বারান্দাতেই মাদুর পেতে দিলেন। বললেন—বসুন, একটু অসুবিধে হবে আর কী। 'না না, অসুবিধা কী, অসুবিধা কী?' এই বলে কোঁচা সামলে মাদুরেই বসলেন।

অনঙ্গমোহনও বসলেন। একটু দূরে। মুখে সামান্য সামান্য হাসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লজ্জাজনিত এক ধরনের হাসি হয়। কিছুটা বিনয়। লজ্জা দদাতি বিনয়ং। কী হেতু, এই দীন গৃহে আগমন?

হেতুটা অবশ্য অনঙ্গমোহন আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। এ সবই অসীমের ক্রিয়াকাণ্ড। গুরুর প্রতি অসীমের অনুরাগ সত্যই অতুলনীয়।

—ঐ, একটা পোস্টার দেখলুম কিনা, সংস্কৃত শেখাচ্ছেন আপনি। টোল আছে আপনার, তাই না?

—যথার্থই অনুমান আপনার।

—তা আপনার টোলটা কোথায়?

—এই এখানেই।

—এখানেই মানে?

—এই আমার টোল, এই আমার বাসস্থান।

—আচ্ছা আজকাল টোলে গভর্মেন্ট ডিএ কীরকম দিচ্ছে?

—যৎসামান্য। কায়ক্লেশে একজনের খাই-খরচও হয় না। যা বাজার, চাল দেড় টাকা। মুগডাল পাঁচসিকা...

—ঐ যা হয়। যা আসে বুঝলেন। আমি ভাবছি একটা কাব্যতীর্থ করে নিয়ে একটা টোল খুলে দেব। একটা পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে দেবেন তো পণ্ডিতমশাই—আমি আসব মাঝে মাঝে। বিএ-তে স্যাংস্কৃট ছিল। কী কী বার ক্লাস নেন?

অনঙ্গমোহন কিছুক্ষণ স্থাণুবৎ ছিলেন। তারপর বললেন, আপনার আসার দরকার নেই।

—কেন?

—সরকারি পণ্ডিতবৃত্তি আপনি পাইবেন না। শুধু মিছা আইস্যা ফল কী?

—কেন, পাব না কেন?

—ঐ বৃত্তির জন্য অঙ্গীকারপত্রে লিখতে হয় যে, আমি সর্বসময়ের অধ্যাপক। আমার আর অন্য আয় নাই, অন্য কিছু করি না।

বিলু ওদের ফার্স্ট বয়কে প্রায় ফিট করে ফেলেছিল, কিন্তু অল্পের জন্য হল না।

হেডস্যার এসে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা যে প্রেয়ার কর, কী প্রেয়ার কর?

ওরা প্রেয়ার করে—হে তবোবান সনা দেবী হে তব পশোবিতা। শ্বেত রবার দ্বারা নিত্যাঃ শ্বেত লংকা ভূষিতা...। বহুদিন ধরেই চলে আসছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলুও তাই করত। অল্প কিছুদিন হল, বিলু আবিষ্কার করেছে, ওরা ভুল বলছে। এটা সংস্কৃত নয়।

ফার্স্ট বয়কেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন হেড স্যার? ফার্স্টবয় বলল—হে তপোবান সনা দেবী তারপর একে একে ছ'জন পারল না। বিলুকে জিজ্ঞাসা করতেই বিলু বলে দিল—শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেত পুষ্পোপশোভিতা। শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা। ভীষণ খুশি হলেন হেড স্যার। বললেন, ভেরি গুড। বললেন, বোর্ডে লিখে দাও বিপ্লব, সবাই লিখে নেবে। লাস্ট বেঞ্চিতে বসা বিলুর সে কী রেলা। ফার্স্ট বয় জিজ্ঞাসা করেছিল, কী করে রে বিপ্লব? বিলু ওর দাদুর কথা বলেছিল। তারপর লাইনে এনে ফেলেছিল। ও ঠিক করেছিল ছুটির পরই বিলুর সঙ্গে যাবে। টোলে ভর্তি হবে।

ছুটির পর ফার্স্টবয়কে সঙ্গে করে নিতে চাইল বিলু। ফার্স্টবয় তখন এলো না। বলল, প্রেয়ারটা তো লিখেই নিয়েছি। ফালতু ফালতু টোলে ভর্তি হয়ে কী লাভ? টাইম লস। বরং অংক করলে কাজ দেবে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই অনঙ্গমোহনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল বিলু, খুশি খুশি ভাব।

...রাজা শালিবাহন ছিলেন মূর্খ। রাজা তার এক নবপরিণীতা রাণীর সঙ্গে জলকেলি করতাছিলেন...

দাদু কাউকে ফিট করেছে নির্ঘাত। বিলু জানে, এটা হল প্রথম দিনের লেসন। বিলু দেখল, ন্যাড়াদা বসে আছে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে। সুমিতাদিও রয়েছে।

তারপর রাজা তো রানীর গায়ে জল ছিটাইতে শুরু করলেন। রানী বলতেছেন, মোদকং দে হি। অর্থাৎ মা উদকং দেহি। জল দিও না। আর মূর্খ রাজা করল কি একটা মোয়া আইন্যা রানীর হাতে দিয়া কয়—মোদক খাও। রানীর তখন হায় হায়। রাজারে খুব অপমান করল।

তারপর রাজা ভাবল, এভাবে তো চলে না। এবার লিখাপড় শিখন লাগে। রাজা তখন পণ্ডিত সর্ব্ববর্মাচার্য্যেরে ডাইকা আনলেন। কইলেন, আমারে তাড়াতাড়ি ব্যাকরণ শিখাও। তখন সর্ব্ববর্মাচার্য্য একটা সহজ ব্যাকরণ রচনা করলেন। সেই ব্যাকরণের নাম কাতন্ত্র বা কলাপ।

সুমিতা বলল—এই গল্পটা যতবার শুনি পণ্ডিতমশাই, ততবার ভাল লাগে।

অনঙ্গমোহন বললেন, সংস্কৃত ভাষা বড় মনোহর। হীরার খনি। সুমিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? আপনি কলাপ বা কাতন্ত্র কেন পড়ান? পাণিনি পড়ান না কেন?

অনঙ্গমোহন বললেন, কাতন্ত্রের মধ্যেই পিছনের পুকুরের শাপলা, নোনাফলের গাছ। বাড়ির উঠান। বাবা যে কলাপ ব্যাকরণই পড়াইতেন।

বিলুকে দেখে অনঙ্গমোহন বলেন—অসীম্যাটা কই রে? বোধহয় সাহেবদের লগে খেলতাছে। ধইরা লইয়া আয় তো।

অসীম বাবলুদাদের ঘরেই ছিল। জ্ঞান শুনছিল। বাবলুদা বলছিল, রাশিয়ায় গরিব বড়লোক সব সমান। বিলু ভাবত গ্যাস। আজকাল অনেকের কাছেই শুনছে এইসব। হেমন্ত বসুর বক্তৃতা হল সেদিন, এই কথাই তো বললেন উনি। তা অসীমকে নিয়ে এল বিলু।

অনঙ্গমোহন স্বপ্নারও হাত ধরে টেনে আনলেন। বসালেন। প্রত্যেকের মাথায় চাঁটি মেরে গুনতে লাগলেন—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। স্বপ্না বলল—উঃ! দাদু লাগে। অনঙ্গমোহন বললেন—এই আমার পাঁচ। হাতের পাঁচ। আসুক তো দেখি ইনেস্‌পেক্টার।

অনঙ্গমোহন প্রায় বালকের মতন। পাঁচজন ছাত্রকে একসঙ্গে পেলেন দীর্ঘদিন পর।

হাততালি দিতে গিয়েও সামলে নিলেন। হঠাৎ সুমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন—তাইলে?

পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠী তাইলে ঠিকঠাক চলতাছে, কি কও?

এবার পঞ্জিকার ভিতর থেকে কি একটা বার করতে গিয়েও বার করলেন না। বেশ চোখ নাচিয়ে বললেন—কও তো দেখি কী? কে পারে :

অপদো দূরগামী চ
সাক্ষরো ন চ পণ্ডিতঃ
অমুখঃ স্ফুটবক্তাচ
যো জানাতি স পণ্ডিতঃ

সুমিতা অনুবাদ করতে লাগল—

পা নেই কিন্তু দূরে যায়
অক্ষর জানে কিন্তু পণ্ডিত নয়
মুখ নেই কথা বলে
যে জানে সে পণ্ডিত।

সবাই কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভাবছিল, এমন সময় স্বপ্নাই চেঁচিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠল—চিঠি চিঠি, ঠিক কিনা?

একদম ঠিক। অনঙ্গমোহন ওর পিঠ চাপড়ালেন। তারপর বললেন—এই হইল সেই চিঠি—বলে পঞ্জিকার ভিতর থেকে বের করলেন একটা খাকি রঙের খাম। বললেন—সরকারি চিঠি। জানতে চায়, আমার টোলের ছাত্রসংখ্যা কত। নাম পাঠাও। ইনেস্‌পেক্টার আইস্যা মিলাইবে। দিয়া দেই পাঁচখানা নাম। আমার আর অসুবিধা কী? সবার নামই তো জানি। তোমার নামটা কী লিখি।

ন্যাড়াদা বলল, স্বপন সরকার।

স্বপ্নভঙ্গ কইরো না কিন্তু। আসবা ঠিকমতো। কর কী?

—বললুম না, দোকান। চায়ের দোকান।

—দোকান? তবে অধ্যয়ন করতে আসবা কেমনে?

—কেন? দুপুরে তো দোকান লাগাই না।

—তা সংস্কৃত পরীক্ষাটা দিবা তো? পয়সা লাগে না—

—এসেছি যখন দেবো ঠিকই।

—তা সংস্কৃত শিখতে আসছ ক্যান? কাব্যতীর্থ হইয়া টোল দিতে চাও নাকি?

—মানে?

জ্ঞতাইলে ঠিক আছে।

জ্ঞআসলে কি, ভাবলাম চান্স যখন পেয়েছি সংস্কৃতটা শিখি। কলেজে তো পড়তে পারিনি। রোজগারের ধান্ধায় নেমে গেছি...

বয়স? বয়সটা লিখন লাগে তো...অনঙ্গমোহন বললেন।

লিখুন সাতাশ।

এবার অনঙ্গমোহন নিশ্চিন্ত হয়ে নামটা ঢুকিয়ে রাখলেন পঞ্জিকার ভিতর। বাঃ। আইচ্ছা, এই শ্লোকটার অর্থ কও তো দেখি, কে পারে?

গোমাংসং পতিতং দৃষ্টা
খণ্ডং খণ্ডং মহীতলে
শিবা কাকা ন গৃহ্নন্তি
গৃহ্নন্তি পণ্ডিতা জনাঃ—

গোমাংস পইড়া আছে। কাকেও নেয় না, শৃগালেও খায় না, পণ্ডিতরা কুড়াইয়া লয়।

সুমিতা হেসে উঠল। বলল, এটা আগেও কতবার বলেছেন পণ্ডিতমশাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে গোমাংস সন্ধি হয়েছে। গোম অর্থ পৃথিবী। পৃথিবীর অংশ। মানে নারায়ণশিলা।

সুমিতা খুব হাসছে। সারা শরীরে ঢেউ।

ঢ-অং। শিখার মা বেশ জোরেই বলেছিল। অনঙ্গমোহন শুনল। ইতোমধ্যে শিখার মা দু'একবার উঁকি দিয়ে গেছে। অনঙ্গমোহন তা লক্ষ করেছেন। সুমিতা প্রতিক্রিয়াহীন। সে এসব গ্রাহ্যেই আনে না।

সুমিতা এবং ন্যাড়াকে বিদায় করে অনঙ্গমোহন যখন উঠে আসছিলেন, তখন ঠিক সিঁড়ির মুখটাতেই শিখার মার মুখোমুখি হলেন। পণ্ডিতমশাই, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

গলায় বেশ ঝাঁঝ।

ঘরে নিয়ে গেল শিখার মা। বলল—শিখা বিজু—তোরা একটু ও-ঘরে যা।

ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল শিখার মা। খাটের ওপর টানটান চাদর পাতা। চেয়ার দুটিও বোধহয় নতুন। এই চেয়ারটায় বসুন। বসলেন। গদি কী পেলব। ঘরে ঘি-এর গন্ধ। হালুয়া খাচ্ছিল কন্যা দুটি। কণা কণা পড়ে আছে।

—দেখুন পণ্ডিতমশাই, আপনার ঐ সুমিতা কিন্তু ব্যাড ক্যারেকটার।

ঘরে ডাকার কারণ যে এটা হতে পারে, পূর্বাহ্নেই আঁচ করেছিলেন অনঙ্গমোহন। তবু তিনি শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে রইলেন।

—দেখুন, মেয়েরা বড় হয়েছে আমার। ঐ পাজি মেয়েটিকে আপনি আসতে নিষেধ করে দিন। গান শিখতে আর আসে না। আমি বলে দিয়েছি। আপনার কাছেও যেন না আসে।

—কেন, বিষয়টা কী?

জ্ঞসে অনেক কথা। আপনি আমার বাবার মতো। সব বলা যায় না। ঐ মেয়েটা আমার কর্তার মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে। এর থেকে যা বোঝার বুঝে নিন।

—কিন্তু তালি কি এক হাতে বাজে মা?

—ঐ মেয়েটাই বদ। পরশু দিনও ট্রাম ডিপোর কাছে দাঁড়িয়েছিল—ওঁর আসার টাইমে। ব্যাটাছেলেদের তো একটু ইয়ে হবেই কিন্তু ঐ মেয়েটা তাই বলে তক্‌কে তক্‌কে থাকবে?

—কিন্তু সুমিতা যে আমার ছাত্রী। উপাধি পরীক্ষা দেবে।

—আপনার পায়ে পড়ি পণ্ডিতমশাই। আপনি নিষেধ করে দিন এখন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা বরানগরে জমি কিনেছি, বাড়ি করে উঠে যাব, তারপর না হয়...

—সে তো বহুকালের ব্যাপার, কিন্তু ওর তো সামনেই পরীক্ষা।

—অ্যাদ্দিনে বাড়ি হয়ে যেত পণ্ডিতমশাই। উপাধি কি কম পায়? ও যে টাকাপয়সা কী করে কে জানে। আপনি ওকে ছাড়িয়ে দিন। কেন মিছিমিছি পড়ান, ও কি পয়সা দেয়? খেতে পায় না অথচ সাজগোজের বহর কি।

—সুমিতার খুব মেধা। পরীক্ষায় ভাল ফল করবে।

—ওসব কিছু জানি না পণ্ডিতমশাই। আমি আপনার মেয়ের মতো। এই আপনার পায়ে ধরছি। আপনি শুধু...

দশ

কাপড়ের থলিতে গুছিয়ে নিলেন কাপড়, উত্তরীয়, গামছা, নামাবলী। একটি যত্নে রাখা আতস কাচ রাখলেন কাগজ মুড়ে। ছোট অক্ষর পড়তে সুবিধা হয় এতে। রুমালে বাঁধলেন পাঁচটা টাকা। দুর্গাপূজা বলে কথা, পাঁচ দিন থাকতে হবে। একবার জীবন ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। ক'দিন বেশ কাশি। কাশতে গেলে মন্ত্রের উচ্চারণ ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। আবার টাকার জন্য হাতড়াতে থাকেন।

জীবন গর্ভস্রাব। টোলেও আসে না। আসবেও না। ওর কাছে যাবার দরকার কী? হাতিবাগানে গেলে হয় না? কবিরাজরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করেন না। কবিরাজি ওষুধের তো আবার অনুপান লাগে। কে বানাবে অনুপান? দরকার নাই। আর্দ্রক চর্বণ করবেন বরং। চললেন অনঙ্গমোহন। অসীমকে সঙ্গে নেবার কথা ভেবেছিলেন একবার। শেষ পর্যন্ত কিছু বলেননি। কিশোর বালক, প্রতিমা দেখুক। মণ্ডপের আলোকনৃত্য দেখুক, কুড়মুড় ভাজা খাক।

কামাখ্যা পুরোহিতের বাড়ির উঠানে এখন আর শুধু জবা-তুলসী নয়, রজনীগন্ধা জুঁই। জুঁইলতা দেয়াল বেয়ে উপরে উঠেছে। ছাত আর টালির নয়। পাকা। বারান্দায় কয়েকটি চেয়ার এবং লম্বা বেঞ্চি।

মানিক এসে নমস্কার করল। কামাখ্যাচরণের ছেলে। ধুতি আর শার্ট পরা। হাতে ঘড়ি। ভাল আছেন তো জ্যাঠা? সিগারেটের গন্ধ পেলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনঙ্গমোহন।

কামাখ্যা কই?

বাবা তো মন্দিরে। আসুন।

কালীর মাথায় লাল ঝালর। পাথরের বেদি। দেয়ালে ঘড়ি। বেলা একটা। দেয়ালে ওঁ-এর মধ্যে কামাখ্যাচরণের বাঁধানো ছবি। গর্ভগৃহের সামনে একটু বারান্দা মতন। সেখানে ভক্ত পরিবৃত কামাখ্যাচরণ।

—বিশ্বাস রাখ। বলছি তো হবে।

—ঠিক হবে তো ঠাকুরমশাই।

—মাকে বল। ভক্তি ভাবে বল, হবে। মায়ের নির্মাল্য কবচে ভরে ধারণ কর।

—আমার কন্যার বিবাহের ব্যাপারে আপনি একটি কবচ ধারণের কথা বলেছিলেন সেটা...

—হবে। সেটা হবে। পরে হবে। একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এখন আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী। আস, আস অনঙ্গমোহন।

অনঙ্গমোহন জরদগব। এগিয়ে যান। এগিয়ে যান। কামাখ্যাচরণ উঠে দাঁড়ান। কামাখ্যাচরণের নামাবলীটি সিল্কের। কাঁধের দু'পাশ সমানভাবে ঝুলে পড়েছে। চৈতন্যদেবের ছবিতে যেমন ঝোলে। দু'হাত দু'পাশে ছড়ালেন। আলিঙ্গন মুদ্রা। যেন শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে রায় রামানন্দের মিলন। অনঙ্গমোহন একটু কুণ্ঠিত হলেন।

কামাখ্যাচরণের সঙ্গে ঘরে গেলেন অনঙ্গমোহন। একটা পাতা-পোড়া গন্ধ পাচ্ছিলেন অনঙ্গমোহন। ঐ পোড়া গন্ধটা হৃদয় নিংড়ে নিল অনঙ্গমোহনের। ঐ পোড়া গন্ধে হা হা করে উঠল বুক। খা খা মাঠের মধ্যে যেন একাকী অনাথ বালকের কল্পদ্রুম ছায়া। জলের মধ্যে কমলে কামিনী। অনঙ্গমোহন কামাখ্যাচরণের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন, পাতুড়ির গন্ধ না? কামাখ্যাচরণ ঠোঁট উল্টে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে তিনি জানেন না। পাতুড়ি সম্পর্কে তিনি নৈর্ব্যক্তিক। পাতুড়ি মায়া মাত্র। কিছু না।

সিমেন্টের মেঝেতে গোবর ছোঁয়ানো হল। কামাখ্যা খেতে বসলেন। ধোঁয়া ওঠা ভাতের পাশে অনঙ্গমোহন দেখলেন, পাতুড়ির শরীর। বোয়াল মাছের পাতুড়ি। কতদিন খাননি। কতদিন। তুমি খাইয়া আইলা ক্যান অনঙ্গ? এখানেই খাইতে পারতা।

কামাখ্যা কেন বলল না আগে দ্বিপ্রহর ভোজনের কথা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনঙ্গমোহন দেখল, বোয়ালের রুপোলি চামড়া সর্ষেবাটায় কেমন মাখামাখি হয়ে বলছে যে, এ পৃথিবী মায়া নয়। মোহময়। হাল্কা ধোঁয়া। ধোঁয়ার গন্ধ আসে, পাতুড়ির।

অর্ধভোজনই হোক তবে।

আশালতা বলল—মাছপাতুড়ি রাত্রের জন্য রাইখ্যা দিতেছি কিছুটা। অনঙ্গমোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, রাত্রে খাইবেন।

ওরা কি বুঝে ফেলেছে নাকি? পাতুড়ির দিকে দৃষ্টিটা কি লোভীর মতো ছিল? অনঙ্গমোহন দূরে সরে যান। বলল—না, না, রাত্রে তো ফলাহার। আমার বুঝি বোধন করতে হইব না? আশালতা বলেন, বোধন তো মানিকই করব। আপনের অসুবিধা কী? আপনে ভাতই খাইবেন। মাছ তুইল্যা রাখলাম।

কামাখ্যা...

কামাখ্যা তো ভোজন করছেন। ভোজনের সময় বাক্যালাপ নিষেধ। মানিক পূজা করবে। মানিক পূজা করবে আর অনঙ্গমোহন তন্ত্রধারী করবে। মানিক হোতা। অনঙ্গ সহকারী। কামাখ্যা, তুমি কঠিন হিসাব জান কামাখ্যা।

আছিল দেউল এক বিচিত্র গঠন
ক্রোধে জলে তুলে ফেলে পবননন্দন
অর্ধেক পঙ্কেতে আর তেহাই সলিলে
দশম ভাগের ভাগ শেওলার দলে
করহ সুবোধ শিশু দেউল প্রমাণ
উপরে এগার হাত দেখ বিদ্যমান।

দেবী দুর্গার আবরণ উন্মোচন করলেন ছবি বিশ্বাস। অসুরের মুখটা ঠিক আয়ুব খাঁর মতো। অতিথি হয়ে এসেছেন নগেনবাবু। বহুদিন পরে নগেনকে দেখলেন অনঙ্গমোহন? নগেন ভোটেও দাঁড়িয়েছিলেন। এখন বিখ্যাত লোক। অনঙ্গমোহনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। সবার কথা জিজ্ঞেস করলেন...। সঙ্গে উঠে বক্তৃতা করলেন...সুতরাং বন্ধুগণ, এই শক্তিরূপিণী বরাভয়প্রদয়নী দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা জানাই যে...আমাদের এমন শক্তি দেও যেন পাকিস্তান তেরিবেরি করলে এমন শিক্ষানি দিতে পারি য্যান এ্যাক্কারে...

পরিশেষে সভাপতি, কেশব মিশ্র চণ্ডী থেকে কিছুটা পাঠ করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামাখ্যাচরণ অনঙ্গমোহনের কানে কানে বললেন—এই যে উনিই এখন টোলের ইনেস্‌পেক্টার। এ পাড়ায় নতুন বাড়ি করেছেন...

টোল পরিদর্শক? অনঙ্গমোহন বৃক্ষের বিশ্বরূপ দেখছেন।

কামাখ্যাচরণের ঘরে সমবেত হল সব। সামান্য চা-মিষ্টি খেয়ে যাবার অনুরোধ।

বারান্দার শেষ দিকে পার্টিশন করা। ঐখানে দীননাথ চতুষ্পাঠী, ঐ ঘরে বসল সব। দীননাথ চতুষ্পাঠীর অনুমোদন রহস্য পরিষ্কার হল।

কামাখ্যাচরণ অনঙ্গমোহনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

অনঙ্গমোহন বললেন, আমারও একটি চতুষ্পাঠী আছে। কথাটা বলেই অনঙ্গমোহন মনে মনে ঐ বাক্যটির টীকা তৈরি করতে থাকেন। এই বাক্যবন্ধনীর মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন সংকোচ রয়েছে সেটা উপলব্ধি করলেন। একটি 'আজ্ঞে' শব্দ এখানে উহ্য আছে, কিন্তু ব্যঞ্জনাটি রয়ে গেছে। 'আমারও'—এই শব্দটির প্রয়োগে দীননাথ চতুষ্পাঠীকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হল। ব্যঞ্জনার্থে হল দীননাথ চতুষ্পাঠীই, অর্থাৎ কামাখ্যাচরণই হল প্রধান এবং অনঙ্গমোহনের চতুষ্পাঠী অপ্রধান।

কোন অঞ্চলে আপনারটি?

বাগবাজার।

চন্দননগরের বাগবাজার—

চতুষ্পাঠীর নাম কি?

পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠী...

আগামী সপ্তাহেই যাব ভেবেছিলাম তো। ছাত্র কটি?

ছাত্র তিন আর ছাত্রী দুই।

ছাত্রী? আপনি তো ভাগ্যবান আচার্য। উপাধির ক্যানডিডেট আছে?

আমার ছাত্রীটি উপাধি দেবে।

এমন সময় রসগোল্লার প্লেট আসে। কেশব মিশ্র বলেন, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্। যাহাতে অমৃত নাই তাহা লইয়া কী করিব? এ স্থলে অমৃত অর্থে চা বুঝতে হবে।

কেশব মিশ্র বললেন, তা আপনার উপাধি পরীক্ষার্থিনীর বয়স কত?

—ত্রিশোর্ধ্ব।

তবে তো পয়সা পয়সা।

পয়সা? পয়সার সঙ্গে কী সম্পর্ক?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেশব শাস্ত্রী তখন নটের মতো চক্ষু এবং অঙ্গ সঞ্চালন করে বলতে লাগলেন—

বদরী শত মূল্যেন
সহস্র মূল্যেন দাড়িকম্বম
বিল্বফল লক্ষ মূল্যেন
অলাবু পয়সা পয়সা...

এই আদি রস অনঙ্গমোহনের ভাল লাগল না। একশত মুদ্রায় কুল ক্রয় করা যায়। সহস্র মুদ্রায় ডালিম ফল। বেল লক্ষ টাকা। কিন্তু লাউ? পয়সা পয়সা। কেশববাবু কুল ডালিম আর বেলের আয়তন দেখাচ্ছিলেন তাঁর হাতের আঙুলে।

—তা আপনার ছাত্রীটি কি বিবাহিতা?

—না। যদি সন্ধানে পাত্র থাকে বড় উপকৃত হই।

—আমার শ্যালক চল্লিশোর্ধ্ব। রাইটার্সে কাজ করে। সম্প্রতি একটি জুয়েলারি দোকানে বসছে। গ্রহশান্তির জন্য পাথর ইত্যাদির ব্যবসা করছে। আয় ভাল। একজন বয়স্কা কুমারীর খোঁজে আছি। সংস্কৃতজ্ঞা হলে তো আরও ভাল।

—কিন্তু আমার ছাত্রী তো ব্রাহ্মণ কন্যা নয়।

—তা অ্যাদ্দিন বে-থা হয়নি কেন? নগেন জিজ্ঞাসা করলেন।

মেয়েটি পিতৃহীনা। উদ্যোগের অভাব। বর্তমানে আমার ছাত্রী যে কালে, অভিভাবকত্বের দায় তো আমারও আছে, না কি কন? নগেন বললেন, আমার ছোটভাইয়ের বৌটা মরে গেছে বছর দুই হল। বাচ্চাকাচ্চা হয়নি তো। কন্ট্রাক্টরি করচে খুচখাচ। আয় মন্দ না। বাঙুর অ্যাভিনিউতে বাড়ি করছে। আর এই যুদ্ধের মওকায় ইস্ট পাকিস্তান বর্ডারে রাস্তা তৈরির একটা কাজ পেয়েছে। ভাল কাজ। দেখুন না, যদি হয়।

বিবাহের পর সংস্কৃত পড়ার অনুমতি দিবেন তো?

সবাই হেসে উঠল। অনঙ্গমোহন বুঝতে পারলেন না, এই বাক্যটির মধ্যে হাস্যরসের অস্তিত্ব কোথায় আছে।

নগেন বললেন—আরে ওসব পরের কথা। বিয়ে তো আগে হোক। একশো কথা না হলে কি বিয়ে হয়? রাশিচক্র নিয়ে যাবেন একদিন।

এদিকে শাস্ত্রীমশাই উঠছেন। তাড়াতাড়ি অনঙ্গমোহন বললেন, টোলের নিয়ম সম্পর্কে দু'একটা কথা জিজ্ঞাস্য ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরে ধুর। টোলস্য নিয়ম নাস্তি। কী বলেন? কামাখ্যাচরণ হাসেন।

অনঙ্গমোহন বলেন—যদি এমন হয় যে পাঁচজন ছাত্র হইল না তখন...

আরে মশাই, হইল না তো হইল না। খাতার মধ্যে হলেই হবে। খাতা ঠিক রাখবেন। অ্যাবসেন্ট প্রেজেন্ট রাখবেন। উপস্থিত আর অনুপস্থিত। ভাবটা এই, যে রোজ টোল বসে।

তাইলে, শাস্ত্রীমশয়, কবে নাগাদ আমার চতুষ্পাঠীতে আপনার পদধূলি পড়বে?

হবে খন। গত আট বছর কোনো টোল ইনস্‌পেকশন হয়নি। এখন গভর্মেন্টের টনক নড়েছে। তা আপনার অসুবিধা হবে না কিছু। পরিচিত লোক যখন...

সাদা চাদর পাতা খাটে পাশাপাশি শুয়েছিলেন কামাখ্যাচরণ আর অনঙ্গমোহন। শেফালিকা ফুল ফুটে আছে উঠানে। সুগন্ধ আসছে। 'বোল রাধা বোল' বাজছে বার বার ঐ বারোয়ারি পূজার মাইকে। রাত, তাই আওয়াজটা কমিয়েছে। কামাখ্যাচরণ বললেন, বুঝলা অনঙ্গভাই। আমি তো আছিই। সর্বক্ষণ আছি। তোমার কোনো অসুবিধা হইব না। আর একটা কথা। তোমারে পুরোহিত না কইরা তন্ত্রধার করায় তোমার মনে কোনো ক্ষোভ আছে নাকি? না না, ক্ষোভের কোনো কারণ নাই। তন্ত্রধারেরই তো বেশি সম্মান। তন্ত্রধার হইল গিয়া রেলের গার্ড, আর পুরোহিত তো ড্রাইভার। বুঝলা না? গার্ডই তো আসল। আর আমি তো তোমার পিছে আছিই।

অনঙ্গমোহন কোনো কথা বলেন না। শেফালির গন্ধ ও হিন্দি গান ভেসে আসে। অনঙ্গমোহন ভগ্নদেউলের মতো পড়ে আছেন।

কামাখ্যা, তুমি আর পুরোহিত না এখন। তুমি অধ্যাপক। তোমার চতুষ্পাঠী আছে। তাছাড়া তুমি সাধক। তুমি এক জাগ্রত দেবী কালীর উপাসনা কর। আমার স্ত্রীর ঐ মরণ, ঐ নিষ্ঠুর মরণ, তোমার কালীরে জীবন দিছে এই কি উপলব্ধি কর? এই বোধ তোমাকে কি পীড়া দেয়? তোমার পুরুষকার আহত হয়? আর তুমি বুঝি আমার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়া তোমার ঐ ক্ষতের মধ্যে পুলটিস মার।

কামাখ্যা আবার বলল—মানিক আর চাকরি-বাকরি পাইব না। খাইব কী? অরে কাম শিখাইতে চাই। আমিও দেখাইতে পারতাম। তোমারে ডাকলাম য্যান তুমিও কিছু পাও। তোমারে কম দিমু না কিছু। আধাআধি ভাগ কইরা দিমু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করলেন অনঙ্গমোহন। কাপড়ের থলেটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে অনঙ্গমোহন বললেন, আমি চললাম। এইসব পারুম না আমি। তখন উঠান জুড়ে শেফালিকা ফুল।

এগার

বাড়ির সামনে লোকজনের জটলা। একটা অমঙ্গল আশঙ্কা করলেন অনঙ্গমোহন। একটু থমকে দাঁড়ালেন। জেলেপাড়ার বস্তিবাসিনী এক রমণী পার্শ্ববর্তিনীকে জানাল—এই যে, এই এর ছাত্রীর সঙ্গে শিখার বাপ নষ্ট। সমবেত মানুষের দিকে অস্থির দৃষ্টির জিজ্ঞাসা অনঙ্গমোহনের। তেলেভাজাওলা খগেন বলল—সুইসাইড কেস। 'সুইসাইড' কথাটা শোনা। আগেও শুনেছেন। মৃত্যুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এই সুইসাইড শব্দ। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যান অনঙ্গমোহন। ঘরের মধ্যে অঞ্জলিকে দেখতে পেয়ে একটি স্বস্তিশ্বাস ছাড়লেন।

অনঙ্গমোহন কী প্রশ্ন করবেন ঠিক করতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অঞ্জলি বলল, বাবা!

এই শব্দটা উচ্চারণ করে অঞ্জলিও দাঁড়িয়ে রইল। বোধ হয় বলতে চাইছে, আপনি দুর্গাপূজা না করে চলে এলেন কেন?

অঞ্জলি বলল, আপনি ঐ সুমিতাকে আর পড়াবেন না।

ও।

শিখার মা গায়ে আগুন দিয়েছে।

অ্যাঁ?

আর জি কর-এ নিয়ে গেছে।

ও।

রাত বারোটায়।

জীবিত?

এখনও বেঁচে আছে।

আরও কিছু জানবার ছিল অনঙ্গমোহনের কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না। স্বপ্নার দিকে তাকাল অনঙ্গমোহন। স্বপ্না মাথা নিচু করে ঘর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে গেল।

অনঙ্গমোহন আবার নিঃশব্দ হলেন। অনেক প্রশ্ন তোলপাড়। দোষারোপটা সুমিতার ওপর কেন? স্বপ্না, তার নিজের পৌত্রী, কেন কোনো কথা না বলে চলে যায়? কেন এই অগ্নিদাহের ঘটনায় অনঙ্গমোহনের নিজেকে শঙ্কিত এবং কুণ্ঠিত লাগে? অঞ্জলি চাল ধুতে যায়। চালের কণাগুলির দিকে তাকাতে পারেন না অনঙ্গমোহন। চালের প্রতিটি কণার দিকে তাকাতেও তাঁর লজ্জা। চালের দাম বাড়ছে। দিনে দিনে বাড়ছে। এই অন্ন ধ্বংস ছাড়া তাঁর কোনো অবদান নেই। ঘাড়টা সামান্য বেঁকিয়ে অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, পুজোয় আবার যাচ্ছেন তো? চাল নিইনি কিন্তু।

অনঙ্গমোহন এবার ঘর থেকে বের হলেন। অজিতবাবুদের ঘরের সামনের পর্দাটা ঝুলছে। ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখলেন, শিখা উপুড় হয়ে কাঁদছে। পাশে বসে আছে স্বপ্না। পিঠে হাত বুলোচ্ছে।

রাস্তায় নেমেই ভাবলেন, কোথায় যাবেন? এক্ষেত্রে 'যাওয়া' শব্দের 'অর্থ-ব্যঞ্জনা' হল পালানো। কোথায় পালাবেন। খালের জলরে খালের জল তুই যাস কৈ? খালের রুগ্‌ণ স্রোতে হা-হুতাশ। এই খাল একদিন বিদ্যাধরী নদীতে গঙ্গার জল বয়ে নিয়ে যেত।

অনঙ্গমোহন কোথায় যাবেন? খালপাড় দিয়ে হেঁটে, ধীরে হেঁটে, গঙ্গার ধারে যান। সুমিতা যদি কুলটাই হয় অনঙ্গমোহনের কী কর্তব্য? কুলটা কি সুছাত্রী হয় না? বারাঙ্গনাগণও শিক্ষাগুরুর কাছে বিদ্যাভ্যাস করতো। অনঙ্গমোহন পায়ে পায়ে গঙ্গার দিকে যান। মোটা লাল নলের ভিতর দিয়ে মাটি যাচ্ছে লবণহ্রদে। ছোট প্যান্ট পরা ফিরিঙ্গি পুরুষরা কাজ করছে। গঙ্গার ধারে আসেন। আহ্নিকটা সেরে নেন তারপর জলমহিমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। জাহ্নবী-গঙ্গে। নরক নিবারণী জাহ্নবী গঙ্গে, কলুষ বিনাশিনী মহিমোত্তুঙ্গে। তুমি নরক নিবারণ কর। কত তোমার মহিমা, হে জাহ্নবী। আচার্য শঙ্করাচার্য বলেছেন—তুমিই নরক নিবারণী। পাপনাশিনী। পাপনাশন এতটাই সহজ প্রক্রিয়া হে শঙ্করাচার্য। তুমি না অদ্বৈতবাদী? তবে আমি যাই কই? জীবন হইতে পলাইয়া ধর্মে যাই, আবার ধর্ম হইতে পলাইয়া জীবনে আসি। তবে আমি কী তা করতাম, কী তা করতাম রে? গঙ্গার পাশ দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। রেললাইন রেললাইন, তুই যাস কই? রোগা রেললাইনে এখন হা-হুতাশ। খিদিরপুরের বন্দর থেকে চিৎপুর ইয়ার্ডের দিকে চলে যে সম্ভার বোঝাই সালঙ্কারা মালগাড়ি। বন্দর শ্রীহীন এখন। লাইনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাঁকে দূর্বাঘাস। অনঙ্গ কোন দিকে যাবেন ঠিক করতে পারেন না।

সুমিতার কাছেই কি যাওয়া কর্তব্য এখন, না কি হাসপাতালে, নাকি এখনি দ্রুত ধাবমান হওয়া উচিত মতিলাল কলোনির সেই দুর্গামণ্ডপে যেখানে অসুর আয়ুব খাঁ-র মতো মুখ নিয়ে কৃপা ভিক্ষা করছে, অনঙ্গমোহনও বলছেন, মা মাগো, আমি ধর্মহীন, ক্ষমা কর। তারপর নাটকের প্রম্পটারের মতো পুরোহিত দর্পণ হাতে নিয়ে ঘড়ি-পরা মানিককে বলবেন—এইবার ফট্ মন্ত্রে ভূত্যপসারণ কর, এই মন্ত্রে দশ দিক বন্ধ কর। এই মন্ত্রে দেবীকে মোদক পিষ্টকাদি নিবেদন কর। তারপর রজত মূল্যং তাম্রং দক্ষিণামহং দদে।

ইহাই ধর্ম?

কিন্তু অনঙ্গমোহন নাস্তিক নন। ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরের স্বরূপ কী অনঙ্গমোহন জানেন না। অনঙ্গমোহন হিন্দু। অনঙ্গমোহন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণাচার অনঙ্গমোহন পালন করেন কিন্তু ব্রাহ্মণাচারের সবটা ধর্মের সঙ্গে মেলাতে পারেন কই? আবার ধর্মেরও সবটা মেলে না জীবনের সঙ্গে।

রেললাইন যেখানে বেঁকে গেছে চিৎপুর ইয়ার্ডের দিকে। ঐখানে পোড়া কয়লার পাহাড়। বহুদিন ধরে ডাঁই হয়ে আছে। ঐ পোড়া পাহাড়ের সানুদেশে বিক্ষিপ্ত গর্ত। অভাবী মানুষেরা শাবল দিয়ে তৈরি করেছে এই গুহাকন্দর। পোড়া কয়লার ভিতর থেকে বেছে বেছে বার করেছে অপ্রজ্বলিত আর অর্ধপ্রজ্বলিত কয়লা। কয়লাই অগ্নি। অগ্নি সর্বভুক, ক্ষুধাও অগ্নি। ক্ষুধা সর্বভুক। তবে অনঙ্গমোহন, তুমিও তোমার ক্ষুধার নিমিত্তে ধর্ম খাও, তত্ত্ব খাও, যুক্তি খাও। পার না?

পোড়া কয়লার পাহাড়ের সানুদেশে একটা গুহা কন্দরের সামনে দাঁড়িয়ে যান অনঙ্গমোহন। আদি ঋষিরা পর্বতগুহায় ধ্যানমগ্ন হতেন। গুহার ভিতর থেকে দৈববাণীর মতো ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর। আর পুঁটকী মেরো না গো ভগবান। গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক অমৃতের পুত্র। কৃষ্ণ অঙ্গার চূর্ণ মণ্ডিত দেহ। হাতে দুটি মাত্র কয়লার টুকরো। ঈশ্বরের কাছে তার আবেদন। সে তো ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে, ঈশ্বরকে মঙ্গলময় জেনেই তার কাছে এই আর্তি জানাচ্ছে। সেই অমৃতের পুত্র বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে যায়। ঐ কয়লাচোর লোকটাকে প্রকৃত ধার্মিক মনে হয় অনঙ্গমোহনের। তবে অনঙ্গমোহনও ধার্মিক। ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখেই তিনি এ যজমানি কর্ম থেকে বিরত আছেন। ঐ ক্ষুধাপীড়িত লোকটির বাক্যের সংস্কৃত ব্যঞ্জনার্থ পেয়ে যায় বৃহস্পতির স্মৃতিতে। 'যুক্তিহীন বিচারেন ধর্মহানি প্রজায়তে।' যুক্তি হীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়মানুসার হলেও ধর্মহানি হয়। সুতরাং দেবী পূজা থেকে পালিয়ে আসাতে ধর্মহানি হয়নি। এই সিদ্ধান্তে এসে তাঁর মন শান্ত ও স্থির হয় এবং তখনই প্রকৃতপক্ষে অজিতবাবুর স্ত্রীর জন্য উদ্বিগ্ন হন। দ্রুত হাসপাতালের দিকে যেতে থাকেন।

আর জি কর হাসপাতালের সামনেই অজিতবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলেন। অনঙ্গমোহন জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছে জয়া?

খুব একটা পোড়েনি। গায়ে তাপ লাগতেই কাপড় খুলে ফেলেছিল ভয়ে।

এমন একটা করল কেন?

কথায় বলে না, স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, সামান্য ব্যাপার। কিছু না—ঐ সুমিতা...

কথা কেড়ে নিয়ে অনঙ্গমোহন বলে উঠলেন, আপনি ঐ কন্যাটিকে চাকরির প্রলোভন দেখাইয়া ভোগ করার চেষ্টা করবেন না। বলেই পিছন ঘুরলেন।

দ্রুত পৌঁছে গেলেন সুমিতার বাড়িতে। প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ওঠেন—বারান্দা দিয়ে কোণার ঘরে চলে গেলেন, ডাকলেন, সুমিতা, যেন কণ্ঠ নয়, নাভিমূল থেকে বেরিয়ে এল ঐ শব্দ।

পণ্ডিতমশাই? আপনি? বড় আন্তরিক কণ্ঠস্বর সুমিতার। আসুন। ভিতরে আসুন। অনঙ্গমোহন ঘরে ঢুকে দেখলেন, মেঝেতে মাদুর পাতা রয়েছে। খাতা খোলা। ছড়ানো কয়েকটি সংস্কৃত বই। বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ কৌমুদী, তার পাশে ডক্টর কৃষ্ণগোপাল শাস্ত্রী, এম এ পি আর এস, পি এইচ ডি, এফ আর এ এস (লন্ডন) স্মৃতি মীমাংসাতীর্থ বিদ্যাবাচস্পতি কর্তৃক বিরচিত নবরূপে ব্যাকরণ কৌমুদী, শ্রীগুরুপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ব্যাকরণ তীর্থ বিদ্যারত্ন প্রণীত পাণিনি সূত্রম্ এবং একটা খোলা পাতা।

অনঙ্গমোহন যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। দাবদগ্ধ অনঙ্গমোহন যেন দেখতে পেলেন, শীতল সরোবর। বললেন, ল্যাখাপড়া করতাছিলা? বাঃ।

অনঙ্গমোহন মাদুরের ওপর বসেন।

খাতাটা দেখেন।

দিবা শব্দ (স্ত্রী লিঙ্গ)।

দ্যৌঃ দিবৌ দিবঃ

দিবম, দ্যাম দিবৌ দিবঃ

দিবা দ্যুভ্যাম দ্যুভিঃ...

~ www.amarboi.com ~

পাতা উল্টে দেন অনঙ্গমোহন। অনুশীলনী—পাঁচ।

অনুবাদ কর। দশরথ ধর্মপথে স্বর্গে গিয়াছেন। মহান ব্যক্তিরা বিপদে অধীর নয়। বিদ্বান সর্বত্র সম্মান পায়, ঘৃত দ্বারা আগুন বাড়ে।

এই সব কী সুমিতা?

সুমিতা তাড়াতাড়ি বইখাতা বন্ধ করে দিল, এই একটা বাজে ব্যাপার। একটা ব্যাকরণ বই লিখছি।

তুমি লিখছ ব্যাকরণ বই?

আমি লিখছি মানে—আমার নাম থাকবে না। এক পণ্ডিত গোস্বামী এম এ ব্যাকরণতীর্থ তাঁর একটা নাম থাকবে। কয়েকটি বই নিয়ে, এই বই থেকে এটা, ঐ বই থেকে ওটা মিলিয়ে লিখে দিচ্ছি। পাবলিশার এরকমই বলেছে। অনঙ্গমোহন খাতাটা উল্টে দিলেন।

'সরল ব্যাকরণ কৌমুদী।'

কিছু টাকা দিচ্ছে পাবলিশার। যা পাওয়া যায়।

গর্ভস্রাব।

এই শব্দটি অত্যন্ত তীব্র গালাগালি—সুমিতা জানে।

সুমিতা চুপ করে যায়। এই গালাগালির লক্ষ্যবস্তুটি কে? সুমিতা না পাবলিশার? কত টাকা দক্ষিণা দিবে ঐ গর্ভস্রাব?

একশো মতো দেবে বলেছে।

একশো? একশো টাকা অর্থ এই বাজারে দুই মণ চাল। একশো টাকা অর্থ আড়াই মণ ডাল। একশো টাকা অর্থ দুই মাসের জীবনধারণ। ব্যাকরণ তো অনঙ্গমোহনও লিখতে পারেন। ঐ বন্ধ করা খাতার দিকে তাকিয়ে রইলেন অনঙ্গমোহন। ঐ দৃষ্টিতে কাতরতা ছিল। ঐ দৃষ্টির গভীরে নিহিত অর্থ কী সুমিতা বুঝতে পারল? সুমিতা বলল, আপনি হলে আরও ভাল লিখতে পারতেন...

অনঙ্গমোহন বলেই ফেললেন, ঐ প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করা যায় না?

সুমিতা ফুল্লকুসুমের মতো উদ্ভাসিত হয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে—আপনিই করুন না এটা।

—না, এটা তোমার। তুমিই কর এটা, একবার আমাকে দেখাইয়া নিও।

অনঙ্গমোহন ভাবলেন কথাটা পাড়বেন। আসল কথাটা। যে কারণে আসা। গতকাল কী করছিলা তুমি? কী করছিলা কথাটির কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই। তবে কী বলবেন? গতকাল অজিতবাবুর সঙ্গে তুমি কী করছিলা কথাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি এরকমভাবে বলবেন, নাকি—সত্য বল, সত্য বল সুমিতা, অজিতবাবুর কাছে তুমি কী চাও? অনঙ্গমোহন বললেন—সুমিতা? রঘুবংশম শেষ করছ তো? সুমিতা বলল, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঊনবিংশ সর্গটি ছাড়া।

পঞ্চদশ সর্গে রামচন্দ্রের শম্বুক শূদ্র বধটা ঠিক কেমন যেন লাগল। শূদ্র হয়ে তপস্যা করছিল বলে রামচন্দ্র তাকে মেরে ফেললেন। এর কি অন্য ব্যাখ্যা আছে?

অনঙ্গমোহন বললেন, জানি না।

সুমিতা বল। সত্য কথা বল, তুমি অজিতবাবুর কাছে কেন যাও? শুধুই কি একটি চাকরির প্রত্যাশা? নাকি তুমি কামতাড়িতা? বল, সত্য বল।

কিন্তু অনঙ্গমোহন বললেন, সুমিতা, রঘুবংশের উপমা বিষয়ে বিশদ পড়বা। উপমাগুলি রত্নবিশেষ। তুলনাহীন। বিশেষত ঊনবিংশ সর্গ। ঊনবিংশ সর্গ পড়াননি অনঙ্গমোহন।

ঊনবিংশ সর্গে সম্ভোগ বিলাস। কুমুদবন যেমন সারারাত চন্দ্রকিরণে প্রস্ফুটিত থাকে, তেমনি সমস্ত রজনী রমণীসংসর্গে রত থাকতেন রাজা। রমণীসকলের সারা দেহে বসন্তের পুষ্পসজ্জার মতোই সজ্জিত থাকত সম্ভোগচিহ্ন। জলকেলিরত পীনস্তনী রমণীরা এখন উচ্ছল। সেইহেতু ছোট ছোট ঘূর্ণির সৃষ্টি হচ্ছে জলে। জলের এই ঘূর্ণি রমণীদের নাভি সৌন্দর্যের উপমান। অঙ্গনাদের নিতম্বের সিক্ত বসন এখন সংলগ্ন হয়ে আছে। রাজার রোমশ বক্ষ দর্শন করে অঙ্গনারা অনঙ্গতাড়িতা হলেন।

সুমিতা, হায়রে সুমিতা, অনূঢ়া বাঙালি-বালা তুমি বল, বল—কী কারণে...

অনঙ্গমোহন স্থির দৃষ্টিতে সুমিতার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তন্বী, শ্যাম, শিখর দশনা, শ্রমভারে ঈষৎ ন্যুব্জা...

অনঙ্গমোহন অকস্মাৎ বললেন—সুমিতা, তোর বিবাহ দিব। বিবাহ দেব। বিবাহ দিমু আমি।

সুমিতা সলাজ হেসে বলল, যাঃ।

এই যাঃ শব্দটি বিলাপধ্বনির মতো মনে হল অনঙ্গমোহনের। একটি সূক্ষ্ম আর্তনাদ। বয়ো গতে কিং বনিতা বিলাপং...

তারপর বললেন—সুমিতা, পাপিষ্ঠা, তুই আর যাস না। ঐ বাড়ি যাইস নারে মাইয়া, কাম নাই। আমি তোর কাছে আইস্যা—আইস্যা...

উঠে দাঁড়ালেন অনঙ্গমোহন। ঘুরে দাঁড়ালেন। নিভন্ত চিতায় শেষ জল দিয়ে আর পিছন তাকায় না যেমন, তেমনই অনঙ্গমোহন বললেন, কাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিখার মা আগুন দিছে গায়ে। শুধু তোর জন্য...পাপিষ্ঠা...

এই কথাটি বলেই অনঙ্গমোহন নেমে আসেন, পেছনে তাকান না।

বার

অনঙ্গমোহন বাজার থেকে ফিরে এসে দেখলেন, কেশব শাস্ত্রীমশাই বসে রয়েছেন।

পরিদর্শকরা তো এরকমভাবে হঠাৎই আসেন। সামনের মাদুরে অসীম এবং বিলু বসে আছে। কি জিজ্ঞাসা করেছে কে জানে? অনঙ্গমোহন লজ্জিত হয়ে বাজারের থলে সমেত হাতজোড় করে নমস্কার করলেন।

—আরে দেড়ঘণ্টা বসে আছি, অ্যাতক্ষণ কী বাজার করলেন, অ্যাঁ? বাজারে তো কোনো দ্রব্য স্পর্শ করা যায় না। গতকাল দেখি, কাঁচকলা তিরিশ পয়সা জোড়া। হেতু জানেন?

—না।

কালকের খবর কাগজে লিখেছে, কোনো এক ভোজনসভায় মন্ত্রীরা কাঁচকলার তিন পদ খেয়েছেন। কাঁচকলার সেদ্ধ, কাঁচকলার কালিয়া, আর কাঁচকলার কোপ্তা। হয়ে গেল তিরিশ পয়সা জোড়া। শুধু কাঁচকলা নয়, প্রতিটি জিনিসের দামই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বাজার করা এখন বিড়ম্বনা বিশেষ। আলু ষাট পয়সা। উচ্ছে এক টাকা। মাছে তো হাতই দেওয়া যায় না।

আজ অনঙ্গমোহনের এতটা দেরি প্রকৃতপক্ষে মাছেরই জন্য। ট্যাংরা মাছ উঠেছিল। পুজোর পর ট্যাংরা মাছের গায়ে লাবণ্য আসে। লাবণ্যসুষমাময় ট্যাংরা মাছগুলিকে জলকেলিরত দেখতে পেয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন অনঙ্গমোহন। দাম জিজ্ঞাসা করতে ভয় পেলেন। তবু জিজ্ঞাসা করলেন। জানলেন, চার টাকা। দেখলেন কয়েকটা মাছ তার মধ্যে পঞ্চত্ব পেয়েছে। অনঙ্গমোহন জিজ্ঞাসা করলেন, মরাগুলি? মরাগুলো তিন টাকা করেই দিন। মরা মাছগুলো বেছে রেখেছিলেন অনঙ্গমোহন। সদ্যমৃত মাছ। আর মাছ তো মেরেই খেতে হয়। অনঙ্গমোহন দেখেছিলেন, আরও বেশ কয়েকটি মাছ বেশ মুমূর্ষু। একটু অপেক্ষা করলেই মরছে এবং মরার সঙ্গে সঙ্গেই তিন টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিলো হয়ে যাচ্ছে। মাছগুলো অনঙ্গমোহনের ইচ্ছায় মরছিল না। ওরা যতক্ষণ পারছিল, বেঁচে থাকছিল। মাছগুলি মরতে দেরি করছিল।

অনঙ্গমোহন কালান্তক যমের মতোই দাঁড়িয়েছিলেন ঐ মাছ বাজারের চাতালে। একটি করে মাছ মরছিল আর অনঙ্গমোহন সেই মৃতদেহটি ছিনিয়ে নিচ্ছিলেন। অনঙ্গমোহন মনে মনে মাছেদের মৃত্যুকামনা করছিলেন, কিন্তু মাছগুলো মরতে চাইছিল না। এইভাবেই দেরি হয়ে গেল অনঙ্গমোহনের।

কেশব শাস্ত্রী বললেন—খাতাপত্র দিন। চাকরি বাঁচাই।

অনঙ্গমোহন খাতাগুলি দিলেন।

—মোটে পাঁচটা স্টুডেন্ট। আরও বাড়ান। আরও তিন-চারটে নাম ঢুকিয়ে দিন।

—আর যে ছাত্র নাই আমার।

—ঢুকিয়ে রাখুন না, তাতে আপনারও সুবিধা হয়, আমারও হয়। নাম বলুন, আমিই লিখে রাখি।

—ঐ একটা নাম লিখতে হয় না? জীবন মজুমদার। সে কিছুদিন পড়ছিল।

—পড়েছিল কি পড়েনি এসব ভাবলে চলবে না। যে কোনো নাম ঢুকিয়ে দিন। মনে করুন, গজপতি তলাপাত্র। তারপর কয়েকদিন প্রেজেন্ট দেখিয়ে পরীক্ষার আগে আগে অ্যাবসেন্ট করিয়ে দিন। পরীক্ষা দিতে পারেনি। ছাত্র বেশি থাকলে টোলের মেনটেনেন্সের জন্য একটা এককালীন ভাতা পাবেন।

—এটা তো তঞ্চকতা হয়।

—তঞ্চকতা কী আবার! সরকারের টাকা সব্বাই লুটেপুটে নিচ্ছে, আর পণ্ডিত নিলেই দোষ? পণ্ডিতরা হল সবচেয়ে নেগলেকটেড কমিউনিটি। এরা আইন জানে না। আইনের ঘোরপ্যাঁচ জানে না। সুতরাং আমি যতক্ষণ পারি, যতটা পারি সাহায্য করি। আমি এ জন্য কোনো উৎকোচ গ্রহণ করি না। আরও দুটো নাম যোগ করে রাখবেন। আপনার ছাত্রীরা কোথায়?

—একটি তো হরি ঘোষ স্ট্রিটে থাকে। সেই উপাধি দিবে এবার। আর অন্যটি ইস্কুলে গেছে। আমার নাতনি।

—ও। নাতনিকেও টোলের ছাত্রী বানিয়ে দিয়েছেন, তাহলে আর এতক্ষণ নাটক করছিলেন কেন পণ্ডিতমশাই? আপনার অন্য দুটি ছাত্রের মধ্যে একটি হল আপনার নাতি অন্যটি শ্যালকপুত্র। সবই তো স্বজন। আরও দুটো নাম যোগ করুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আপনার ধারণা ঠিক নয় শাস্ত্রীমশাই। আমার টোলে যারা আছে, তাঁরা প্রকৃতই ছাত্র। আর অসীম শ্যালকপুত্র হলেও ছাত্র। আবাসিক ছাত্র। গুরুকুলে যেমন হইত।

—কেশব শাস্ত্রী হাসলেন। তা বেশ। তা বেশ।

অনঙ্গমোহন অঞ্জলিকে চা করতে বলে অসীমকে আট আনা পয়সা দিয়ে পাঠালেন মিষ্টি আনতে। এখন ছানার তৈরি মিষ্টি পাওয়া যায় না। মিষ্টান্ন নিয়ন্ত্রণ আইন নামে একটা আইন তৈরি হয়েছে। সেই আইনের ফলে ছানার মিষ্টি তৈরি করা বেআইনি হয়ে গেছে। গজা, লাড্ডু, অমৃতি এইসব বিক্রি হয় এখন।

কেশব শাস্ত্রী বললেন—সবই সই করে দিলাম। লিখে দিলাম—অহো চতুষ্পাঠী মিমামবলোক্য নিতরাম আহ্লাদিতেহস্মি। বিহগানাং কুজনবৎ ছাত্রানাং রবাঃ শ্রায়ন্তে। আরও লিখলাম—আচার্যশ্চ স্বয়ং তত্ত্বাবধানং করোতি। আর কী লিখব বলুন। আমি কোনো উৎকোচ গ্রহণ করি না। বলতে পারেন, এটা একটা ব্রাহ্মণসেবা। ব্রাহ্মণসেবাই তো ধর্ম, না কি বলেন?

কী বলবেন অনঙ্গমোহন? সেবা যে ধর্ম এটা তো সর্বজনগ্রাহ্য কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণ সেবাই যে ধর্ম, একথায় হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন কী করে?

কেশব শাস্ত্রীমশাইয়ের বক্তৃতা থামে না। বলেন, সরকার তো পণ্ডিতদের সাহায্য দিচ্ছে। ভাল ছাত্রদের স্কলারশিপও দিচ্ছে। শুনেছি নাকি, রেডিওতে দিনে দুবার করে সংস্কৃতে খবর পড়া হবে। আরে কার জন্য খবর হবে, কে শুনবে খবর? জল শুকিয়ে গেলে আর সেতু বেঁধে লাভ কী? পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধনে? এই যে রাষ্ট্রভাষা হিন্দি করে দিল, কেন? সংস্কৃতই তো করতে পারত।

অসীম চা নিয়ে এল, বিলু মিষ্টি। পাথরের গ্লাসে চা, পাথরবাটিতে মিষ্টি। অনঙ্গমোহন পুলকিত হলেন। অঞ্জলির বুদ্ধিমত্তা দেখে মাঝে মাঝে চমৎকৃত হন অনঙ্গমোহন। কেশব শাস্ত্রীমশাইও পুলকিত হলেন। চামৃত এসে গেছে? বেশ। আর মিষ্টি দেখেই বললেন, এ যে দেখি প্রফুল্লভোগ। রাঙা আলুর পান্তুয়া না? বিলু বলল, হ্যাঁ স্যার। দোকানদার বলল, প্রফুল্লভোগ নিয়ে যাও, কাঁচকলা রাঙাআলু মিশিয়ে তৈরি।

কেশব শাস্ত্রী মশাইকে রাস্তায় নেমে এগিয়ে দিলেন অনঙ্গমোহন। নেতাজি সংঘের সামনে সাঁটা খবর কাগজে দেখলেন রাশিফল। প্রত্যাশিত ফল লাভ ও মনোবাঞ্ছা পূরণ। অর্থাগম। বেশ মিলে গেল। কে বলে রাশিফল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেলে না?

মনে বেশ সুখ ছিল অনঙ্গমোহনের। তাই খাওয়া-দাওয়ার পর জনৈক ধীরানন্দ রায়ের চিঠির প্রতিবাদে একটি প্রতিবাদপত্র লিখতে বসলেন। ধীরানন্দবাবু লিখছেন, বর্তমানে বাংলা ভাষার বানানের সংস্কার করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বাংলা ভাষা একটি স্বাধীন ভাষা। সংস্কৃতের পুচ্ছধারী হইয়া চলিলে বাংলা ভাষার স্বাধীন বিকাশ সম্ভব হইবে না।

এই মুহূর্তে আমার কতগুলি প্রস্তাব আছে।

১। ঙ স্থলে ং ব্যবহার : যথা বাংলা।

২। বর্ণের পূর্বে যুক্ত 'ঞ'র স্থলে ন এবং পর প্রযুক্ত 'ঞ'র স্থলে গা ব্যবহার যথা অনজন, অগগ্যান।

৩। ঊ, ঋ, ঌ, ঐ, ঔ, ঙ, ঞ, ণ, স, ষ, য, ক্ষ বর্ণগুলিকে বাদ দেওয়া।

৪। ঐ স্থলে ওই, উ স্থলে অউ, ক্ষ স্থলে কখ...

এ তো সম্পূর্ণ অরাজকতা আহ্বান করছেন ধীরানন্দবাবু। আর বসুমতীর মতো কাগজ এই চিঠি ছাপল কী করে?

অনঙ্গমোহন লিখতে শুরু করলেন—সম্পাদক সমীপেষু, গত সতেরই নভেম্বর ১৯৬৫ তারিখে জনৈক ধীরানন্দ রায়ের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত চিঠিখানি পড়িয়া যারপরনাই আশ্চার্যান্বিত হইলাম। সন্তানের মুখাবয়ব তাঁহার মাতার অনুরূপ হইবে তাহাতে আশ্চর্য কী? বরং না হওয়াই আশ্চর্যের। তদ্রূপ, সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী। সুতরাং সংস্কৃতের অনুরূপ বর্ণমালাই থাকিবে। সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বাবলম্বী হয় কিন্তু পূর্ণ বয়সের পূর্বেই যদি উচ্ছৃঙ্খল হয় তবে তাহা নিন্দনীয়। ধীরানন্দ রায় বাংলাভাষাকে উচ্ছৃঙ্খল হইবার কুপরামর্শ দিতেছেন...

শ্লথচরণে অঞ্জলি অসময়ে বাড়ি আসে। ঘরে ঢুকেই স্বপ্নাকে জড়িয়ে ধরে। তারপরই বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। হতচকিত ঘাবড়ে যাওয়া স্বপ্না ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারে না। কেবলই জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে মা?

অঞ্জলি কান্নাগলায় বলে—আমাদের কী হইবরে স্বপ্না...

বারান্দা পেরিয়ে দরজার চৌকাঠের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে পরিতোষ যশ। বিহ্বল অনঙ্গমোহন তার কাছে জিজ্ঞাসা নিয়ে দাঁড়ান।

সেই সময় অঞ্জলি বলে, আমার আর চাকরি নাইরে স্বপ্না...

পরিতোষ যশ ধীরে ধীরে বলল—লক আউট। আজ সকাল বেলা থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনেই অঞ্জলি অজ্ঞান হয়ে গেছিল।

কারখানা বন্ধ হয়ে গেল কেন, হঠাৎ? অনঙ্গমোহন জিজ্ঞাসা করলেন।

হঠাৎ নয়। আরও আগেই হয়তো বন্ধ করে দিতে হত কিন্তু সরকারের ঐ আইনটা পেয়ে গিয়ে...

কী আইন?

মিষ্টান্ন নিয়ন্ত্রণ আইন। রসগোল্লা, সন্দেশ, যত সব ছানার মিষ্টি—সবই বেআইনি হয়ে গেল কিনা, আমাদের কোম্পানি তো টিন তৈরি করে। বড় বড় মিষ্টি কোম্পানিগুলো রসগোল্লার টিন নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তাতেই মালিক মওকা পেয়ে বন্ধ করে দিয়েছে।

—আর খুলবে না?

—জানি না।

এই 'জানি না' কথাটা শুনেই অঞ্জলির কান্নার শব্দ বেড়ে গেল। তখন পরিতোষ যশ ঘরের ভিতরে ঢুকল।

চৌকিটার সামনে গেল। অঞ্জলির মাথায় হাত দিল। বলল—অ্যাই, চোখ মোছ, চোখ মোছ।

—কারখানা আর সত্যি সত্যি খুলবে না পরিতোষবাবু?

—আরে খুলবে খুলবে। ইউনিয়ন কি এমনি এমনি ছেড়ে দেবে নাকি?

—যদি না খোলে?

—ধুর, অত চিন্তার কী?

গলার স্বর গাঢ় আর ঘন করে পরিতোষ যশ এবার বলল—আর আমি তো আছি। অনঙ্গমোহনের সারা শরীর ঝিনঝিন করে উঠল। অনঙ্গমোহন বলতে পারলেন না আরে তুমি কেন, আমিই তো আছি। আমি তো মৃত নয়। আমি, পণ্ডিত নীলকমল ভট্টাচার্যের পুত্র অনঙ্গমোহন। আমাকে অবলম্বন কর। একথা অনঙ্গমোহন বলতে পারেন না। কারণ, অনঙ্গমোহন সংস্কৃত ভাষা ছাড়া আর অন্য কোনো কিছু জানেন না। আর সংস্কৃত ভাষার কোনো বিনিময় মূল্য নেই। সংস্কৃতভাষা অনঙ্গমোহনের মতোই অসহায়। স্বপ্না, তোমার মাকে ওঠাও। একটু দুধ খেতে দাও।

দুধ! আড়চোখে স্বপ্না চাইল ওর দাদুর দিকে।

অনঙ্গমোহন লজ্জা পেলেন। একপো দুধ রাখা হয়। চায়ের জন্য সামান্য রেখে বাকিটা সকালে খেয়ে নিয়েছেন অনঙ্গমোহন। রোজই খান। সামান্য একটু দুধ না হলে চলে না। অনঙ্গমোহন বললেন, ঈশ্বর, আমারে মরণ দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরণ।

আপনি কেন মরবেন! বরং আমার মরে যাওয়া উচিত। আপনি বেঁচে থাকুন। অনঙ্গমোহন জানেন, এটা ব্যাজস্তুতি। আপনি বেঁচে থাকুন এর অর্থ আপনি মরুন। কিন্তু মৃত্যু তো ইচ্ছাধীন নয়। অঞ্জলি বলল—আপনি আর আপনার অসীম থাকেন এখানে, বরং আমি আমার ছেলেমেয়ে দুইটারে লইয়া ভিখারি হইয়া যাই। অনঙ্গমোহন রিপু বশবর্তী হন। শরীরের ভিতরে বুজকুড়ি কাটে দ্বিতীয় রিপু ক্রোধ। চোখ থেকে বের হয় ব্রহ্ম তেজ। যেদিকে দৃষ্টি দেবেন সেই দিক ভস্ম হয়ে যাবে। পশ্চিমে দৃষ্টি দিলেন। ঐ স্থানে সাড়ে সাত টাকায় কেনা হলক কাঠের বইয়ের তাক। ঐখানে জ্বলতে লাগল কাব্য কামধেনু শতশ্লোকচন্দ্রিকা, মুগ্ধবোধম। পশ্চিমে দৃষ্টি হানলেন অনঙ্গমোহন, তক্তপোশের তলায় ধূলিধূসরিত কিরাতার্জুনীয় পুড়ে যায়। হা ভারবি হা ভারবি। পুড়ে যায় ফ্যাকাশে মলাটে মোড়া বাসবদত্তা। ভস্ম হয়ে গেল জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কৃত টীকা সম্বলিত নৈষধচরিত। ঐ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন যেন খাণ্ডব দহনে সর্বস্ব হারানো উদ্ভ্রান্ত কিরাতপুত্র। উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটতে থাকেন অনঙ্গমোহন। অকালবর্ষণ হয়ে গেছে একটু আগে। পিচপথ সিক্ত। আকাশে মেঘ। যাও মেঘ, তুমি নীলকমলের কাছে যাও, তারে কও, বাগবাজারের খালপাড়ে খাড়াইয়া খাড়াইয়া তোমার পুত অনঙ্গমোহন কান্দে। তারে কও, অনঙ্গমোহন আজ পরাজিত। তারে কও, তোমার শব্দবন্ধ মিথ্যা। মিথ্যা কলাপ পাণিনি। মনু সংহিতা মিথ্যা। মিথ্যা পরাশর। নৈষধের পদলালিতা মিথ্যা। মিথ্যা যমক অনুপ্রাস। সমাস কী কাজে লাগে? ব্যুৎপত্তি, সন্ধি? এরে দিয়া জুটে না পচা পুঁটি মাছ। টুলা পণ্ডিতের সন্তান না হইতাম যদি, জিলাপি বানাইতে পারতাম যদি, ফুলুরি, বেগুনি, যদি রিকশাচালক হইতাম, গলায় গামছা, সাংখ্য না পড়তাম যদি, যদি না পড়তাম জৈমিনি সংহিতা, পূর্ব মীমাংসা, ঘটের মধ্যে, তিন আনার ঘটের মধ্যে যদি আবাহন করতে পারতাম ঐরাবত সমেত ইন্দ্রদেব, যদি হ্রীং মন্ত্রে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম মৃন্ময় পুত্তলের, যদি হাতে সাজি আর ফুল লইয়া দোকানে দোকানে ফুল ছিটাইতে পারতাম, দোকান মালিকের কপালে পরাইয়া দিতে পারতাম যদি দশনয়ার চন্দন তিলক, টাকার ড্রয়ারে যদি ছিটাইতে পারতাম গঙ্গাজল, বিন্দু, কুট্টনী হইতাম যদি, যদি হইতাম বেশ্যার দালাল, উঃ, কলের মিস্ত্রিও যদি হইতাম...

হে মেঘ, হে বাগবাজারের মেঘ আমার উপায় বল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনঙ্গমোহন একা একা হাঁটেন।

বেসন মাখছে তেলেভাজাওলা, লোহার কারখানায় ঘড় ঘড় শব্দে ফুটো হয়ে যাচ্ছে লোহা, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিস, পানের দোকানে খেলার রিলে হচ্ছে। পৃথিবীটা কী সুন্দর, সংস্কৃত ভাষা ছাড়াই চলে যাচ্ছে। নিজেকে অনাবশ্যক মনে হয়। আবর্জনা মনে হয়। রাস্তার লঘু আর বিক্ষিপ্ত বাতাসে উচ্ছিষ্ট শালপাতার ছ্যাঁচড়ানির মতো অনঙ্গমোহন হাঁটতে থাকেন।

হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যান হরি ঘোষ স্ট্রিটে। অনঙ্গমোহনের টায়ার চটির মৃদু শব্দও চিনে গেছে সুমিতা। এগিয়ে এসে বলবে এসেছেন? আশায় ছিলাম আসবেন। মন বলছিল।

অনঙ্গমোহন বলবেন, বাঃ। বেশ আলঙ্কারিত বাক্য ব্যবহার করতাছ তো...বেশ।

এখন কালিদাসের কাব্যে শ্লেষ ও যমকের ব্যবহার দেব। এখানেই অনঙ্গমোহনের আশ্রয়। এখানেই আনন্দ। আঃ, আনন্দ। মহর্ষি ভৃগু। তুমি ঠিক কথা, রাইট কথাই বলেছিলে। আনন্দোব্রহ্ম। আনন্দই ব্রহ্ম।

AMARBOI.COM

তের

উদ্দালক বলিলেন হে পুত্র, শ্রবণ কর। মনের তত্ত্ব বুঝাইতেছি। দুগ্ধ মন্থনে দুগ্ধের সারাংশ উপরে ভাসমান হয়, তাহাই নবনী। আমরা যে অন্ন খাই, তাহারই সূক্ষ্ম সারাংশ উপরে উঠে এবং তদ্দারাই মন পুষ্ট হয়। এইরূপেই জলের সারাংশ দ্বারা বাক্য পুষ্ট হয়। হে বৎস, আমাদের মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাক্য তেজোময়।

শ্বেতকেতু বলিলেন, ভগবন, বুঝিতে পারিলাম না। পুনর্বার বলুন। তখন ঋষি আদেশ করিলেন পুত্র, অদ্য হইতে পঞ্চদশ দিন উপবাস কর। কেবল জলপান করিও, কারণ জল প্রাণময়। শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। পঞ্চদশ দিবস গত হইল। শ্বেতকেতু শুষ্ক শীর্ণ হইলেন, বর্ণ কালিমাময় হইল। কিন্তু পিতা তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিবেন এই আনন্দে সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া রহিলেন। ষোড়শ দিবসে শ্বেতকেতু পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, পিতঃ আমি আসিয়াছি। উদ্দালক আদেশ করিলেন, হ্যাঁ বৎস, ঋক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যজুঃ সাম আবৃত্তি কর। শ্বেতকেতু পিতার আদেশ শুনিয়া সমস্ত স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এ কি বিস্মরণ। কিছুই বলিতে পারিলেন না। অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া শ্বেতকেতু কহিলেন, ভগবন, কিছুই তো মনে পড়িতেছে না। পুত্রের এই অবস্থা দেখিয়া ঋষি কহিলেন—বৎস, কাতর হইও না। যাও, ভোজন কর। ভেজনান্তে সবই স্মরণ হইল—শ্বেতকেতু চিন্তান্বিত হইলেন। মন কি জড়? মন কি জড় অন্নের অংশ দ্বারা রচিত হয়?...

—আর নেই। ছান্দোগ্য উপনিষদের বঙ্গানুবাদ। এখন ঠোঙা।

কিছুটা খই খেয়েছিলেন অনঙ্গমোহন। শুকনো খই। গোপনে। ক্ষুধায়। গোপন ক্ষুধায়। সন্তর্পণে ঠোঙাটির ভাঁজ খুললেন অনঙ্গমোহন। সাবধানে। ভাঁজ-বিনষ্ট ঠোঙাটিকে দেখলেন। ঠোঙার ভাঁজগুলি দেখলেন। মন দিয়ে দেখলেন। অন্ন মনোময়।

বাড়ি ফিরেই প্রথমে একটা পুরনো পঞ্জিকা হাতড়ে নিলেন। শক্ত করে ধরলেন, ছিঁড়ে ফেললেন বুধ রাজা, শনি মন্ত্রী, ছিঁড়ে ফেললেন রাশিফল। অতিবৃহৎ প্রকাণ্ড লাল মূলা ছিঁড়ে ফেললেন। ছিঁড়ে ফেললেন শুভদিনের নির্ঘণ্ট। অনঙ্গমোহন যেন বাজারের মুরগিওলা। পালক ছিঁড়বার মতো পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে ফেললেন। এবার বের করে আনলেন কাব্যচন্দ্রহার। ছিঁড়ছেন। শ্লেষ-যমক উৎপ্রেক্ষা ছিঁড়ছেন...একজন নররাক্ষস যেন। বিলু ঘরে ঢুকেই দেখতে পায় এ দৃশ্য। ঝাঁপিয়ে পড়ে, অনঙ্গমোহনের হাত থেকে কেড়ে নেয় কাব্য চন্দ্রহার। বলে এসব কী করছ, দাদু? অনঙ্গমোহন বলেন, এইসব বই-পুস্তক ছিন্ন কইরা ঠোঙা বানামু। বিলু দু'হাত বিস্তার করে। জলের তোড়ের সামনে পাহাড়ের মতো। বিলুর বাড়ানো হাতে প্রবল নিষেধ। এসব কী করছ দাদু? অনঙ্গমোহন ছর ছর করে কেঁদে ফেলেন। বিলুকে জড়িয়ে ধরেন। বিলুকে তখন ছত্রছায়া মনে হয়। বিলুর গায়ে লেপ্টে থাকেন। বিলু বলেছিল, ঠোঙা যদি বানাতেই হয়, বাইরে থেকে কাগজ নিয়ে আসব। এসব বই ছিঁড়ছ কেন দাদু। অঞ্জলিও কোমরে কাপড় গুঁজে নেয় তখন। একটা একটা করে ছেঁড়া পাতাগুলি কুড়িয়ে দেয়। স্বপ্না পৃষ্ঠা মিলিয়ে ছেঁড়া পৃষ্ঠাগুলো ঠিক করে গুছিয়ে রাখে। অঞ্জলি বলে, পরে সেলাই করে দেব। অনঙ্গমোহনের তখন মনে হয় এই পৃথিবী খুব একটা খারাপ জায়গা নয়।

এবার পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠীতে ঠোঙা তৈরি হতে লাগল নিয়মিত। প্রথম দিকে ঠোঙাগুলোর সাইজ ঠিক ছিল না। বেঁকাতেড়া হয়ে যাচ্ছিল। কাটার মধ্যে গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল, এ ব্যাপারে ঠিকমত ট্রেনিং দিল ন্যাড়া, ওরফে

~ www.amarboi.com ~

স্বপন সরকার। ন্যাড়া বলেছিল, জীবনে অনেকরকম করেছি। বাজি, পুতুল, ফুলুরি, পাঁপড়, ঠোঙা। তবে ঠোঙা হল জাপানি শিল্প। জাপানি শিল্প ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে দিয়েছিল ন্যাড়া। জাপানে নাকি ফ্যামিলির সবাই একসঙ্গে বসে ঘড়ি, রেডিওর পার্টস ফিটিং করে, ঠোঙাও সেরকম। একা হয় না। একজন কেটে দেবে, সেকেন্ডজন আঠা লাগাবে, থার্ডজন ভাঁজ করবে। এই ঠোঙা তৈরির কর্মশালা পরিবারের সবাইকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে, একসঙ্গে হেসে ওঠে, একসঙ্গে চিন্তা করে। স্বপ্না হয়তো বলল, জানো মা, একভাবে রান্না করা যায় তাতে তেল অনেক কম লাগে। রেডিওতে মহিলামহলে শুনেছি। প্রথমে তরকারি সাঁতলাতে হয় না। আগে সেদ্ধ করে নিয়ে পরে তেলে ফোড়ন-টোড়ন মশলাটশলা দিয়ে ঐ সেদ্ধ তরকারিটা ঢেলে দিতে হয়। অনঙ্গমোহন হয়তো বললেন—ঐ তরকারির প্রয়োজন কী। ডাইলের মধ্যে তরকারি দিয়া দাও, ব্যাস। তৈলের দরকার নাই। তৈল খাওয়া ভাল নয়। পিত্তচড়া হয়। স্বপ্না হয়তো বললো—মা, একটা নতুন খাবার খেলাম। আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে দার্জিলিং থেকে এনেছে। সাদা সাদা। চাউচাউ না কি বেশ নাম। লম্বা লম্বা কেঁচোর মতো দেখতে। অ্যাঁ মা...অঞ্জলি মুখ বিকৃতি করে। অনঙ্গমোহনের বেশ লাগে।

চাকরিটা হারাবার পর, এখন অঞ্জলির মধ্যে যেন প্রাণ এসেছে—অনঙ্গমোহনের মনে হয়। আগে ছিল যেন কাষ্ঠপুত্তলি। হাসত না, রাগত না। এখন অঞ্জলির মুখের হাসি দেখতে পেলে অনঙ্গমোহন খুশি হন। ঠোঙা বানাতে বানাতে হয়তো বিলু বলল—এই ঠোঙাটার কী রাশি বলত মা? অঞ্জলি বলল—তোর দাদুকে জিজ্ঞাসা কর। বিলু বলল—বলতে পারলে না তো, এটা বিরাশি। এই দেখ না লেখা আছে পৃষ্ঠা বিরাশি।

অঞ্জলি বলে, এই ঠোঙারও একটা রাশি নক্ষত্র আছে, কন বাবা? এরও একটা ভাগ্য আছে। কে বলতে পারে, এটা কিসের ঠোঙা হইব? ডাইলের, বিস্কুটের না চানাচুরের। কেউ হয়তো ঠোঙাটারে যত্ন কইরা রাইখ্যা দিব। কখন কি কাজে লাগে এইসব চিন্তা কইরা। কেউ হয়তো ফালাইয়া দিল, কেউ ফুঁ দিয়া ফাটাইল। অঞ্জলি হাসছে। ওর হাসিকে অম্লান করে রাখতে সাধ যায় অনঙ্গমোহনের, অনঙ্গমোহন গল্প বলেন—সেই এক আছিল জামাই। নোয়া জামাই। জামাই তো বিয়া কইচ্ছে পণ্ডিতের মাইয়া। জামাই উচ্চবংশ। কিন্তু লেহাপড়া জানে না। মূর্খ। বিয়ার পর জামাই গেছে শ্বশুরালয়ে। জামাই জানে, শ্বশুরবাড়ি হইল পণ্ডিতবাড়ি। অনেক পুঁথি পুস্তক আছে। জামাই কইল্ল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী, একখান বই নিয়া মুখের সামনে রাখছে।

শ্বশুর একটু পরে গিয়ে দ্যাখে, জামাই কাঁদতেছে। জামাইয়ের সামনে মহাভারতের স্ত্রীপর্ব খোলা—

সহস্র বীরের দেহ গড়াগড়ি যায়,
ঘরের রমণীবালা করে হায় হায়।

শ্বশুর ভাবল, আহারে, জামাইয়ের কী নরম মন, শ্বশুর জামাইয়ের পিঠে হাত দিয়া কয়—কাইন্দো না, কাইন্দো না, জন্মিলে মরিতে হয়। মরণের পর আবার জন্ম হয়। কাইন্দো না। বাসাংসি জীর্নানি যথা বিহায়—গীতার ঐ শ্লোকটি স্মরণ কর।

জামাই কইল, শ্বশুরমশয়, আমি আমার ছোটবেলার কথা স্মরণ করি। তখন বইতে কত বড় বড় অ দেখেছি, কত বড় বড় আ, এই অ্যাত বড় বড় ক খ আছিল—এখন অক্ষরগুলি খাইতে না পাইয়া কত ছোট ছোট হইয়া গেছে গিয়া। এই অক্ষরগুলির দুঃখে আমার চোখে জল আসে।

হো হো করে হেসে ওঠে অঞ্জলি, হেসে ওঠে সবাই, শীত-শেষের শীর্ণডালে যেমন হেসে ওঠে পলাশ মঞ্জরী।

ন্যাড়া মাঝে মাঝে দুপুরের দিকে আসে। এই চা বিক্রেতার উৎসাহ দেখে অবাক হন অনঙ্গমোহন। হিতোপদেশের অনেকটাই শেষ করে এনেছে এই স্বপন সরকার। মানুষের উপর আস্থা জাগে। এই ছেলেটির জ্ঞানলাভের তৃষ্ণা আছে। আকাঙ্ক্ষা আছে। ছেলেটি একদিন বলেছে—পণ্ডিতমশাই, আপনাকে দেখে আমার ভুল ভেঙেছে। আগে জানতাম, নামাবলী জড়ানো টিকিওলা ব্রাহ্মণ মানেই অং বং করে দক্ষিণা চায়। আপনি আলাদা। আপনি অন্য একটা লড়াই করছেন। আপনাকে দেখে আমার শ্রদ্ধা হয়।

ঠোঙা তৈরির সময় আগে কর্মশালার দরজা বন্ধ রাখা হত। এখন খোলাই থাকে। অজিতবাবু উঁকি মারলেন। বললেন—কাল ওঁকে নিয়ে আসছি।

অঞ্জলি ঘোমটা উঠিয়ে দিয়ে বলল—তাই? ভাল কথা। দিদি ছাড়া বাড়িটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল।

শিখার মা হাসপাতালে ছিল বেশ কিছুদিন। অঞ্জলি কয়েকদিন দেখে এসেছে। অনঙ্গমোহনও গেছেন। নাকের ভিতর দিয়ে নল, হাতের চামড়া কুঁকড়ে গেছে। মরাল গ্রীবায় কদাকার ক্ষত। অগ্নি কি নৃশংস। যেদিন প্রথম কথা বলতে পারল, অনঙ্গমোহন সামনে ছিলেন, জয়া বলেছিল, তা হলে বেঁচে গেলাম। ও হাসতে চেষ্টা করছিল। শিখার মা আসবে শুনে অঞ্জলি প্রকৃতই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুশি হল যেন। আঙুলের আঠা মাথার চুলে ঘসে নিয়ে বলল—ঘর-দুয়ার যা হইয়া রইছে।

বিক্রির ব্যাপারটা অসীম আর বিলু করে। ঠোঙার ব্যাগ হাতে অনঙ্গমোহনকে দোকানে দোকানে যেতে হয় না। আজ অনঙ্গমোহনের মনে হল, এটা অভিভাবকসুলভ কাজ নয়। প্রথমত ঠোঙা তৈরির কারণে ওদের লেখাপড়ার সময় অনেকটাই নষ্ট হচ্ছে, তার উপর বিক্রির জন্যও ওদের সময় ব্যয় হয়। অনঙ্গমোহন ভাবেন, সংস্কার বিসর্জন দিয়ে তাঁরও উচিত, রাস্তায় নেমে যাওয়া। কিন্তু পণ্ডিত অনঙ্গমোহন সেটা পারেন না। উনি জানেন, সামাজিক সম্মান অর্থনির্ভর। বিদ্বান সর্বত্র পূজাতে এখন ভুল। উত্তমা মানমিচ্ছন্তি ধনমিচ্ছন্তি অধমা—একটা মিছে কথা মনে হয়। আসলে এটা একটা সংস্কার। কুলগত সংস্কার। অনঙ্গমোহন কিছু ঠোঙা সরিয়ে রাখেন। ব্যাগে ভরে নেন।

জয় মা বলে বেরিয়ে পড়েন অনঙ্গমোহন। খগেনের দোকানের সামনে দাঁড়ান। খগেন মুড়ি-তেলেভাজা বিক্রি করে। খগেন বলল, কী খবর ঠাকুরমশাই? অনঙ্গমোহন বলেন, ভালই তো। তাঁর কাঁধের সাইড ব্যাগ চাদরে আড়াল করে বলেন, তুমি ভাল আছ তো? খগেন বলে আজ্ঞে, আপনার আশীর্বাদে। অনঙ্গমোহন বলেন, ব্যবসা কেমন চলছে। আজ্ঞে, আপনার আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে। অনঙ্গমোহন চলে যান। ফটিকের দোকানের দিকে যান। অনঙ্গমোহন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে নেন—এই দোকান থেকে অন্তত পালাবেন না। মনে মনে সংলাপ স্থির করেন।

—কী ফটিক। কুশল তো? ত, শুন, দরকারি কথা আছে। আমার তো তৈল, গুড় আর শুকনা লঙ্কা বাবদ কিছু বাকি আছে, সেই পয়সাটা লও।

—দিন, দিয়ে দিন।

—পয়সায় দিমু না। কিছু ঠোঙা আছে। হিসাব কইরা কিছু ঠোঙা লইয়া লও।

—সে কী ঠাকুরমশাই! আপনি ঠোঙা বানাচ্ছেন?

—হ। দিবানিদ্রাটা বড় খারাপ। বায়ুচড়া হয়। দ্বিপ্রহরে করিটা কী? তাই, আলস্য না কইরা ঠোঙা বানাইলাম। ক্ষতি কী?

তা বেশ, তা বেশ, মাঝে মাঝে দিয়ে যাবেন।

ফটিকের দোকানের সামনে দাঁড়ালেন অনঙ্গমোহন। বহুদিন ধরে দেখছেন ফটিককে। ফটিক দত্ত। গন্ধবণিক তপ্তকাঞ্চনের মতো রঙ। কিছুদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরে বেশ মোটা হয়ে চলেছে ফটিক। অনঙ্গমোহন শুরু করেন—

—কী ফটিক কুশল তো?

—আর কুশল। বেচাকেনা নেই...

—শুন ফটিক, দরকারি কথা আছে।

—কী বলুন।

—তোমার বাবার লগে আমার খুবই সদ্ভাব ছিল।

—হ্যাঁ, তা তো ছিল।

—তোমার বাবা খুবই পুণ্যবান লোক ছিলেন।

—কিছু নেবেন?

—না, কইতাছিলাম কি যে—আচ্ছা ধারবাকি এখন কত আছে?

—আর তো কিছু বাকি নেই, অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে, আপনার নাতি এসে কিছু ঠোঙা বিক্রি করে গেল—তা এখন ঠোঙা বিক্রি করছেন ঠাকুরমশাই? বামুন হয়ে ঠোঙা বেচতে হচ্ছে, ঘোর কলি পড়েছে। শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে, কলিতে বামুনরা শূদ্রের কাজ করবে, মুনিঋষিরা যা বলেছে সব অক্ষরে অক্ষরে ফলছে। কলিতে মেয়েছেলে ঘরে থাকবে না, চোর-জোচ্চরদের শাসন করার কেউ থাকবে না, রাজা হবে চোর, বলুন ঠাকুরমশাই, সব মিলে যাচ্ছে কিনা...কলিতে আরও কি হবে শুনবেন...

অনঙ্গমোহনের ওখানে দাঁড়িয়ে ফটিকের মুখে শাস্ত্রকথা ভাল লাগছিল না। বিরামের দোকানে যান অনঙ্গমোহন। কোনো ভণিতা ছাড়াই সোজাসুজি বিরাম ঘোষকে বলে ফেলেন, কিছু ঠোঙা আছে, ঠোঙা। নেবা? বিরাম ঘোষ মুগের লাড্ডু পাকাচ্ছিল। মুখই তুলল না। লাড্ডু পাকাতে পাকাতেই বলল, আর ঠোঙা। শালার বিক্রি নেই মোটে। নুন কে চুন বানিয়ে দিয়েছে প্রফুল্ল সেন। বোঁদে বেচতে আর কটা ঠোঙা লাগে? জানেন না এখন মিষ্টান্ন নিয়ন্ত্রণ।

অনঙ্গমোহন এবার বাজারের দিকে যান। ব্যাগের থেকে বার করেন এক বান্ডিল ঠোঙা। হাতের মুঠিতে ধরে থাকেন। এইবার প্রকৃত ক্যানভাসার। চাঁদিপুর ঘাটের রাঙাজবা সিঁদুর বিক্রেতার মতো হাত উঁচু করে ধরেন অনঙ্গমোহন কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ। বাজারের মুখে একজন ফলওয়ালা। আপেল, আঙুর, কমলালেবু, অনঙ্গমোহন বলেন, এই যে ভাল ঠোঙা, খুব ভাল ঠোঙা আছে। তারপরই ক্যানভাসারের কণ্ঠ ও ভঙ্গিমা রাখতে পারেন না আর। কোমল কণ্ঠে বলেন, নেবা? নেবা ভাই কটা ঠোঙা? ফলওয়ালা উঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়াল। দু'হাত জোড়া করল, নারায়ণের সামনে গরুড় যেমন। বলল, আরে, পণ্ডিতজি, আপ? ঠোঙা বেচছেন?

—কেন? আমাকে চেন নাকি?

—হ্যাঁ, তো, জরুর চিনি, আপনি তো রোজ সুবা সুবা গঙ্গামাই যান, আমি ভি যাই। কোতো স্তব করেন, পূজা ভি করেন—আমি আপনার কাছে কী করে ঠোঙা লিব? আপনি আট আনা এমনি নিয়ে যান। ব্রাহ্মণ মহাত্মাকে দান করা তো বহুত পুন্ কী কাজ।

অনঙ্গমোহন বলেন, না ভাই, দান চাই না, ঠোঙা কটা যদি দয়া কইরা নাও...

আরে ঠোঙা কেন বেচবেন, আপনি ব্রামভন আছেন না? পইসা জরুরত আছে তো হামি বেবস্থা করিয়ে দিব। সোকাল বেলা কটা মন্ত্র পড়িয়ে দিবেন, বহুত আদমি পইসা দিবে।

অনঙ্গমোহন ঠোঙা ঢুকিয়ে ফেলেন ব্যাগে। ভাবলেন, এভাবে হবে না। অন্যপাড়ায় যেতে হবে তাঁকে। তোরঙ্গ খুলে জামাটা বার করে নিতে হবে। পণ্ডিতের পক্ষে ঠোঙা বিক্রি করাও কঠিন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন অনঙ্গমোহন, এমন সময় সামনের একটা ওষুধের দোকান থেকে একজন ভদ্রলোককে বের হতে দেখলেন অনঙ্গমোহন। তার হাতে কাগজের ঠোঙা নয়। ঠোঙাটি এমন, ভিতরের বস্তু দেখা যায়। বিলুর উপনয়নে এরকম দু'একটা ঠোঙা দেখেছিলেন। পলিথিন ব্যাগ। ঠোঙার শত্রুকে দেখলেন অনঙ্গমোহন। অনঙ্গমোহন তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন। কলিতেও যদি ব্রহ্মতেজ থাকত, তবে ঐ দৃষ্টিতে জন্ম হয়ে যেত কলির পলিথিন।

চোদ্দ

আজ দুপুরবেলাটা কোথায় যেন গিয়েছে অঞ্জলি। গায়ে পশমের লাল চাদরটা জড়িয়েছে। বিধবার গায়ে ঐ লাল রঙ ভাল লাগছিল না অনঙ্গমোহনের। তাঁর পূর্বপুরুষের কোনো বিধবাই এভাবে লাল জিনিস পরেনি।

তাঁর পূর্বপুরুষের কোনো মহিলাই কি চাকরি করতে বেরিয়েছিল কোনোদিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঞ্জলি যখন বেরিয়ে গেল, তার আঁচল-বাতাসে সুগন্ধ পেয়েছিলেন অনঙ্গমোহন। প্রসাধনের। যাবার সময় কিচ্ছু বলে গেল না অঞ্জলি।

কোথায় যাচ্ছে কী বৃত্তান্ত কিছুই জিজ্ঞাসা করেননি অনঙ্গমোহন। প্রশ্ন করার জন্য যে জোরটুকু থাকা দরকার, সেটাও তাঁর নেই। আজ সকালেই অঞ্জলি বলে দিয়েছে—বড় বড় কথা বলবেন না বাবা। আপনার স্বার্থের জন্য আমাকে বাইরে পাঠিয়েছেন। তাতেও হল না, আমাকে রাঁধুনির কাজ করতে পাঠিয়েছেন...

অজিতবাবুর ঘরে অঞ্জলি এখন রান্না করে। অঞ্জলি স্ব-ইচ্ছায় গেছে। জয়া হাসপাতাল থেকে ফেরার পর ওর পক্ষে রান্না করা সম্ভব হচ্ছিল না। অজিতবাবু একজন রাঁধুনির সন্ধানে ছিল। অঞ্জলি তো তখন নিজেই বলল...

অঞ্জলি বলে দিয়েছে—কাল থেকে অসীমের ভাত রান্না করতে পারবে না। অঞ্জলি কোথাও যাবার সময় অনঙ্গমোহনকে বলে যায়। আজ কিছুই বলেনি।

যশবাবু এসেছিলেন গতকাল। যশবাবু তো জানেন না যে, অঞ্জলি এখন রাঁধুনি। যশবাবু এসে প্রণাম করেছিলেন অনঙ্গমোহনকে। অনঙ্গমোহন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, চাকরিস্থলের খবর কী। যশবাবু বলেছিল, চেষ্টা চলছে। মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। আসলে মালিক টিনের কারবার গুটিয়ে দিতে চাইছে। টিন আর তেমন চলছে না, এখন প্লাস্টিক। প্লাস্টিকের যুগ। যশবাবুর গলার স্বর শুনে অঞ্জলি হাত মুছতে মুছতে এল। ওরা কথা বলল রাস্তায় গিয়ে। বিলু বলেছিল, যশবাবু হল মালিকের এক নম্বরের চামচে। অনঙ্গমোহন বুঝে নিয়েছিল 'চামচে' শব্দটির আলঙ্কারিক প্রয়োগ।

স্বপ্নাও নেই এখন। অঞ্জলি বের হবার পর স্বপ্নাও বের হয়েছে ঘর থেকে। 'দাদু, বন্ধুর বাড়ি থেকে একটু আসছি। আজ তুমি ভাত নিয়ে খেয়ো।' এই বলে স্বপ্নাও বেরিয়েছে। বাইরের পৌষের রোদ যেন জরির ঝালর। বাইরের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন অনঙ্গমোহন। ভাবেন, সুমিতার বাড়ি একবার যেতে পারলে ভাল হত। ওর বিবাহটা স্থির করতে পারেননি অনঙ্গমোহন। নগেনের ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহটা শেষপর্যন্ত হয়ে উঠল না। ঠিকুজি মেলেনি। নাড়িবেধ যোগ।

সুমিতার কথা ভাবতে ভাবতেই প্রকাশকটি এল। পুরন্দর গোস্বামী। দি আইডিয়াল পাবলিশার্স-এর মালিক। এসে বললেন—কী স্যার, স্ক্রিপ্ট রেডি তো?

—পাণ্ডুলিপি তৈরিই আছে। অনঙ্গমোহন খাবার কথা ভুলে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই প্রকাশকটিকে সুমিতাই পাঠিয়েছিল কিছুদিন আগে। সুমিতা এঁরই কাজ করছিল। পুরন্দরবাবু বলেছিলেন—আপনি হলেন কোয়ালিফাইড সংস্কৃত—। আপনি কেন টেক্সট বই লিখবেন? আপনাকে দিয়ে অরিজিনাল কাজ করাব। অনুবাদের কাজ। আপনি ভাল করে কয়েকটা অনুবাদ করে দিন তো—যেমন ধরুন, শৃঙ্গাররসাষ্টক, রতিমঞ্জরী, শৃঙ্গার তিলক, পুষ্পবাণ বিলাস কিংবা ধরুন চৌরপঞ্চাশিকা। খাবে ভাল। স্যাংস্কৃটের মার্কেট এখন হায় হায়। বুঝলেন না। যেসব বই কিছুটা খাবে, ঐ সব কিছু করব। বেশ ভাল করে কভার করে বাজারে ছাড়বো। চৌরপঞ্চাশিকা দিয়েই শুরু করুন।

অনঙ্গমোহন চৌরপঞ্চাশিকার অনুবাদটি নিয়ে আসেন।

পুরন্দর গোস্বামী বলেন—নিন, পড়ুন তো দেখি।

অনঙ্গমোহন পদ্মাসনে বসেন। পড়তে থাকেন—আজও তাহাকে স্মরণে আসিতেছে সেই শশীবেদনা নবযৌবনা গৌরকান্তি সুন্দরীকে। আমি তাহাকে শৈত্যদান করিতে পারি। আজও যদি তাহাকে আর একবার প্রাপ্ত হই। সেই পদ্মালোচনা পীনস্তনীকে, তাহাকে আলিঙ্গন করতঃ মধুকর সদৃশ তার সুধা পান করি। তার সম্ভোগ ক্লান্ত দেহের উপর এলায়িত চূর্ণকুন্তলরাজি স্মরণ করিতেছি...

—আরে না না—এভাবে হবে না পণ্ডিতমশাই। আমরা আক্ষরিক অনুবাদ চাইছি না। ভাবানুবাদ চাইছি। দেখুন, আমি স্যাংস্কৃট জানি না, তবে গোস্বামী বংশের ছেলে। রসটস বুঝি। বিশেষত, বুঝলেন কিনা, আদি রস। এভাবে করুন, চলতি ভাষায়, যেমন ধরুন, আঃ, আজও তাকে মনে পড়ে মদন জ্বালায় জ্বলছে ঐ নবযৌবনা পীনস্তনী সুন্দরী। আমি এখনো তার মদন জ্বালাকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারি। আজও তাকে আর একবার যদি পাই সে আয়তনয়না, পীনস্তন ভারে ন্যুব্জ দেহলতা, তাকে আমার দুই বাহুর আলিঙ্গনে রেখে উন্মত্তের মতো তার মুখসুধা পান করি, যেমন মধুকর ফুলের মধু চুষে খায়। আজও তাকে মনে পড়ে, সম্ভোগের পর তার এলিয়ে পড়া চুলগুলি...। এরকম করুন।

অনঙ্গমোহন বললেন—মূল রচনায় তো ঐরকম নাই, অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদাম গৌরীং...

—আরে রাখুন তো গৌরীং। আপনি ভাবানুবাদ করুন। এখনকার পাঠকের যা ভাব, সেই ভাবে। মহাকাল প্রকাশনী নিষিদ্ধ গ্রন্থমালা সিরিজে এইসব স্যাংস্কৃট ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমরাও ভাবছি, শৃঙ্গার সিরিজ বার করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনঙ্গমোহন বললেন—আমি পারতাম না।

ঐ ভদ্রলোকটি চলে গেলে অনঙ্গমোহনের খিদে লাগে ফের। আজ খাবেন না, খিদে পেলেও খাবেন না। আজ উপবাস। কাল থেকে স্বপাকী হবেন। হাঁড়িকড়াই কিনে নিজে রান্না করে খাবেন।

তারপরই ভাবেন, নিজে একা স্বপাক আহার করলে সমস্যা মিটছে কোথায়? অসীম? অসীমকে নিয়েই তো সমস্যা।

তবে অসীমও অনঙ্গমোহনের সঙ্গেই খাক। তখন বিলু যদি বলে, দাদু, আমিও তোমার দলে?

সংসার এভাবে বাড়ালে চলবে না। অনঙ্গমোহন বলবেন, দাদু তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে খাও। আমাগোরে নিয়াই যত্ত ঝামেলা, আমি আর অসীম আলাদা খামু।

তবে তো আলাদা হাঁড়ি-কড়াই পাক-পাত্র চাই, শিশি-বোতল চাই, কৌটাকৌটি চাই, উনুন চাই। কেরোসিন স্টোভে রাঁধলে হয় না?

স্টোভ কই?

একটা কিনলে হয় না?

টাকা? স্টোভ, হাঁড়ি, কড়াই...বহু টাকা...

পাক করব কোথায়?

কেন, বারান্দায়?

—টোল বসবে কোথায়?

তবে অসীম তুই যা। তোরে বাড়ি পাঠাইয়া দি। আমি তোরে রাখতে পারলাম না আর।

বড় বেশি বয়সে বিবাহ করেছিলেন অসীমের বাবা, বোবাঠাকুর। বোবাঠাকুরের অন্য একটা নাম আছে। হরিদাস। সেই নাম এখন লোকে জানে না। বোবাঠাকুর নামেই তাঁর পরিচিতি। বোবা বলতে যা বোঝায়, উনি ঠিক তাই নন। উনি শুনতে পান। মুখ থেকে আওয়াজও বের হয়। এগার বছর বয়সে উপনয়ন হয়েছিল এবং তাঁর বাবার সঙ্গে থেকে যাজকবৃত্তিও করছিলেন পূর্ব বাংলায়। যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যামন্ত্র পড়ে না—সে শূদ্র সমান। তাঁর হাতের অন্ন বিষ্ঠা তুল্য—একথা শাস্ত্রে লেখা আছে, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ পূজাকালে মুখ থেকে গোঁ গোঁ ভিন্ন অন্য শব্দ উৎপাদন করতে পারে না তার সম্পর্কে কী বিধান হবে তা কোনো সংহিতায় লেখা নেই। তবে মনঃ শব্দজাত মন্ত্র মনে মনেই পড়া যায় এরকম ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তা হরিদাস যাজকবৃত্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে গিয়ে বোবাঠাকুর হলেন। কিন্তু বোবার পক্ষে পাত্রী জোটানো কষ্টকর। বোবাঠাকুরের বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অনঙ্গমোহনের স্ত্রী সুরবালা প্রায়শই ক্যাটক্যাট করতে থাকেন।

তুমি থাকতে দাদার আমার বিয়া হইল না। দাদারে বুড়া বয়সে কে দেখব? অনঙ্গমোহন সচেষ্ট হলেন, তাঁরই এক দূর সম্পর্কের দুঃস্থ জ্ঞাতি ভাইঝির সঙ্গে বিবাহের বন্দোবস্ত করলেন।

প্রথম সন্তান হবার বেশ কয়েক বছর পর এপার বাংলায় এসে অসীমের জন্ম। বোবাঠাকুরের বয়স তখন পঞ্চাশের উপর। অসীমের জন্মের পর অনঙ্গমোহন গিয়েছিলেন অশোকনগরে। বোবাঠাকুর নানারকম শব্দ করে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। অনঙ্গমোহন বুঝতে পারছিলেন না। বোবাঠাকুরের স্ত্রী আসলে অনঙ্গমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্রী হলেও বিবাহের পর শালাবৌ। ও বলল—আর বল কেন, বুড়া বয়সে...

আরে বুড়া তো কি, শ্যালক আমার রসবান পুরুষ।

বোবাঠাকুর আবার দ্বিগুণ শব্দে গোঁ গোঁ করতে থাকেন।

বোবাঠাকুরের স্ত্রী বলেন—বাচ্চাটারে কে দেখবে, কে মানুষ করবে—

অনঙ্গমোহন বুকে চাপড় মেরে বলেছিলেন—সোহমস্মি...

তারপর ঐ দেড় মাসের বাচ্চাটার কাছে মুখ নিয়ে অনঙ্গমোহন বলেছিলেন—ওরে পরাইন্যারে পরাইন্যা, আমার কইলজা, তুই তোর বাপের ন, তুই আঁয়ার।

অসীমের আট-নয় বছর বয়স হলে বোবাঠাকুর অনঙ্গমোহনের সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন নানা ইঙ্গিতে। অনঙ্গমোহন অসীমকে নিয়ে এসেছিলেন, উপনয়ন দিয়েছিলেন। এইভাবে অসীম গুরুগৃহে এল। পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠীর আবাসিক ছাত্র।

অনঙ্গমোহন থালা চাপা দেওয়া ভাতের দিকে একবার তাকালেন। না, ঐ ভাত কিছুতেই খাবেন না। আজ উপবাসে থাকবেন।

থালাটা একবার উঠিয়ে পদ কী আছে দেখতে ইচ্ছে হল। থালাটা ওঠালেই গরম মশলার ঘ্রাণ। সে কী, মোচাঘন্টা কেন? মোচা তো আনেননি অনঙ্গমোহন। একে তো শীতকালে মোচার দাম বেশি, তার উপর তেল লাগে বেশি। ইচ্ছে থাকলেও মোচা আনতে পারেন না অনঙ্গমোহন। মোচা কী করে এল? অনঙ্গমোহন মোচা খেতে ভালবাসেন অঞ্জলি জানে। অঞ্জলি কি অজিতবাবুর ঘর থেকে চুরি করেছে? নাকি, এটা অঞ্জলি চেয়ে এনেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার শ্বশুরমশাই মোচাঘন্ট খুব ভালবাসে, একটু নিই?—জয়া তখন কি বলেছে, একটু কেন, নাও, নাও, বেশি করে নাও...অঞ্জলি ওর নিজের ভাগেরটা না খেয়ে শ্বশুরের জন্য রেখে দিয়েছে।

হঠাৎ অঞ্জলির উপর কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠেন মনে মনে। মেয়েটা সত্যিই কী পরিশ্রমটাই না করছে। ভোরে উঠে অজিতবাবুর ঘরের রান্নাবান্না মিটিয়ে নিজের ঘরের রান্নাবান্না। তারপর ঠোঙা তৈরি। ঘর-গৃহস্থালির যাবতীয় কাজকর্ম।

জয়া যেদিন ফিরল হাসপাতাল থেকে, ঘোমটায় মুখ ঢেকে ফিরল। আগুনে তার মুখ বিকৃতি ঘটেনি। তবু কেন সে অবগুণ্ঠনাবৃত ছিল? মৃত্যু থেকে বেঁচে আসার লজ্জা? শিখা আর বিজুকে দু'হাতে জড়িয়ে কাঁদল কিছুক্ষণ, তারপর অঞ্জলিকে ডেকে নিল। অঞ্জলির সঙ্গে কতই না ঝগড়া করেছে জয়া, কিন্তু সেদিন অঞ্জলির সঙ্গে কী আশ্চর্য সখী ব্যবহার।

এক মুহূর্তের দুর্বলতায় গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল জয়া। ঠিক যে কী কারণ, সুমিতার সঙ্গে অজিতবাবুর যে ঠিক কী সম্পর্ক ছিল, অনঙ্গমোহন জানেন না। সুমিতাকেও কখনো জিজ্ঞাসা করেননি তিনি। তবে সুমিতা কথা রেখেছে। সুমিতাকে বলেছিলেন—আর যেও না ও বাড়ি। সুমিতা আসেনি আর।

অসীম আর বিলুর কাছে অনঙ্গমোহন শুনেছিলেন—সেদিন রাত্রের অজিতবাবুর ঘরে কথা কাটাকাটি। অজিতবাবু বলেছিল, যা করছি বেশ করছি, হাজারবার করব। শিখার মা বলেছিল—এটাই তোমার শেষ কথা? অজিতবাবু বলেছিল—হ্যাঁ।

তারপর সেই রাত্রেই বিশ্রী ঘটনা।

মোচার ঘন্টটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন অনঙ্গমোহন। একবার কি চাখবেন? একটু? কেউ জানবে না। অঞ্জলি, স্বপ্না, কেউ না। ওরা এসে দেখবে, বুড়োর এতই রাগ যে মোচার ঘন্টটাও খায়নি।

ঠং করে ঢাকনাটা ফেলে দেন অনঙ্গমোহন। ব্রাহ্মণের এই লোভ হীনতার লক্ষণ।

অনঙ্গমোহন আবার ঢাকনাটা ওঠান। ছোট্ট বাটি। বাটির মধ্যে মোচার ঘন্ট। কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই। হাতার দাগ নেই, হাল্কা তৈলাক্ত সর পড়েছে। আর কেউ খায়নি এই মোচাঘন্ট। অনঙ্গমোহনের জন্য যে থালাটি, বাটিটা সেখানেই বসানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর আগেও অসীমের ব্যাপার নিয়ে কলহ হয়েছে। অসীমকে দিয়ে আসতেও উদ্যত হয়েছিলেন। অঞ্জলি শেষ সময় বলেছে—না থাক। আপনার কষ্ট হবে। অঞ্জলির কঠিন আবরণের মধ্যে একটা নরম মন আছে। নারিকেলের ভিতরে যেমন স্নিগ্ধ জল থাকে।

অনঙ্গমোহন ঢাকনাটা খুলে নেন আবার, থালাটা টেনে নেন। জল গড়িয়ে নেন। প্রথমে ডাল, তারপর বাঁধাকপি এবং শেষকালে মোচার ঘন্টের বাটি ভোজন পাত্রের সংলগ্ন করে নেন। তারপরই হাতে জল নিয়ে ওঁ নাগায় নমঃ ওঁ কূর্মায় নমঃ ওঁ কৃকরায় নমঃ, ওঁ দেবদত্তায় নমঃ, ওঁ ধনঞ্জায় নমঃ করলেন। ভোজন করলেন। তারপর ঐ উচ্ছিষ্ট থালা-বাসনগুলি নিয়ে চললেন কলতলায়। কোনোদিন করেননি এরকম, নিজের বাসন কখনো মাজেননি আগে। অনঙ্গমোহন বাসন মাজতে বসলেন। বাসন মাজার কোনো মন্ত্র নেই, কোনো স্তোত্র কিংবা ধ্যান নেই। অনঙ্গমোহনের মনে হল, এটাও এক ধরনের পূজা। অনঙ্গমোহন আবার উপরে উঠে আসেন। হাঁড়ি, কড়াই, ফেন গালার পাত্র, সবগুলো নিয়ে যান নিচের কলতলায়। ছাই মাখান হাঁড়িতে। হাঁড়িতে মমতা মাখান। ঠাণ্ডা জলে হাত কন কন করে। প্রাণে বড় তৃপ্তি হয়।

AMARBOI.COM

পনের

অনঙ্গমোহনের মন ভাল নেই। ক'দিন ধরে বড় একটা কথা বলছেন না। অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করেছিল, কি হইছে বাবা আপনার? মনটন ভাল নাই দেখি? অনঙ্গমোহন বললেন, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অকস্মাৎ মৃত্যু প্রাণে য্যান শেল বিন্ধাইয়া দিল।

অঞ্জলি জানে, এটাই একমাত্র মন খারাপের কারণ নয়। মন খারাপের আসল কারণ অন্যত্র। অসীম চলে যাবে।

বিলু বলল—দাদু, এরকম চুপচাপ বসে আছ কেন কাল থেকে। অসীম বরং এখানেই থাক। ওর বাবা নিতে এলে বলে দিও, যাবে না।

অনঙ্গমোহন বলেন—খবর শুনছস, সকালের স্থানীয় খবর? আবার রেশনে চালের দাম বাড়তাছে? অষ্টাশি পয়সার চাল একটাকা দশ পয়সা? অসীম অনঙ্গমোহনের ধারে-কাছে আসছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনঙ্গমোহনও অসীমকে দেখে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছেন চোখ।

অসীম আর বিলু, দুজনেই ক্লাস এইটে উঠেছে এবার। সংস্কৃতে বিলু পেয়েছে ৫৯ আর অসীম ৬৮। ৬৮ নম্বরের দিকে চেয়ে চোখে জল এসে গিয়েছিল অনঙ্গমোহনের। অঙ্ক, ইংরাজি এইসব নম্বরের দিকে দৃকপাত করেননি অনঙ্গমোহন।

এবার স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা হবার পরই অনঙ্গমোহন হরিদাসকে চিঠি লিখলেন—ভাই হরিদাস, বড় কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করিতেছি। সংসারে আমি এবং আমার চতুষ্পাঠী আবর্জনাস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে, তুমি আসিয়া অসীমকে লইয়া যাও।

আদ্য পরীক্ষা আবার পিছিয়ে গেছে। সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ কখনোই এই পরীক্ষা ঠিক ঠিক সময় নেয় না। কোনো কোনো বছর তো পরীক্ষা হয়ই না। অনঙ্গমোহন লিখেছিলেন—অসীমকে ঐ অঞ্চলের ইস্কুলে ভর্তি করিয়া দিও, আদ্যপরীক্ষা শুরু হইবার কিছুদিন পূর্বে পাঠাইয়া দিও। কবে পরীক্ষা হইবে জানাইয়া দিব। তুমি অসীমকে সংস্কৃত পড়িবার জন্য ক্রমাগত উৎসাহ দিবে। গোবরডাঙায় শ্রী চপলাকান্ত কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ আছেন, আমার সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু। তাঁহার একটি চতুষ্পাঠী আছে। তথায় 'মধ্য' পড়িতে সবিশেষ বলিবে। আমার জীবিতকালে যদি শুনিতে পাই, অসীম উপাধি পাইয়াছে, তবে আমার সুখের সীমা থাকিবে না...

বোবাঠাকুর এলেন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ। কালচে চাদর। এই শীতে বার করার পর আর কাচা হয়নি। গলায় মাফলার। পায়ের গোড়ালির সামনে যে দাগটা ছিল, কিছুটা বেড়েছে। সঙ্গে এনেছেন একটা লাউ। পাঁচ-ছ'সের ওজন হবে। আর এনেছেন মানকচুর অর্ধেক। হাঁপাচ্ছেন বোবাঠাকুর। লাউটা দেখিয়ে বাঁ-হাত আর ডান হাতের আঙুলগুলো বেকিয়ে ধরলেন, তারপর নাড়ালেন যেন কিলবিল করছে।

ইচা মাছ? অনঙ্গমোহন বললেন।

বোবাঠাকুর ঘাড় নাড়লেন। ঠিক ঠিক। মানে চিংড়ি মাছ দিয়ে লাউ।

মানকচুটা রেখে বোবাঠাকুর মশলা পেশার অভিনয় করে দেখালেন।

অনঙ্গমোহন বুঝলেন, মানকচু বাটা।

এত ভারী জিনিস এতদূর থিক্যা বহন কইর‍্যা আনলা ক্যান কও তো?

হাসলেন বোবাঠাকুর।

বোবাঠাকুরের বড় ছেলেটা একটু হাবাগোবা ধরনের। এক পানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোকান করে দিয়েছিলেন কষ্টেসৃষ্টে। চালাতে পারেনি ছেলেটা। এখন গরুটরু পুষে তার দুধ বিক্রি করে কোনোমতে চলছে। বোবাঠাকুরের যজমানির আয় আর নেই। ভেবেছিলেন, অসীমটা এখান থেকে মানুষ হয়ে ফিরবে।

অনঙ্গমোহন বললেন—আছ কেমন? বোবাঠাকুরের গোঁ গোঁ শব্দে অনঙ্গমোহন বুঝলেন বোবাঠাকুর ভাল নেই।

অনঙ্গমোহন বললেন—অসীম এবার তোমাগর কাছেই যাউক। মায়ের পোলা মায়ের কাছে ফিরুক।

বোবাঠাকুর ঘাড়ও নাড়লেন না, মুখ দিয়ে শব্দও করলেন না।

অনঙ্গমোহন বললেন—আর একটা কথা কই হরিদাস, অসীম্যা বড় অবাইধ্য হইছে আইজকাল। খালপাড়ের সাহেবগুলিরে ইট মেলা মারছে। সাহেবরা হইল গিয়া সাহেবের বাইচ্যা। ছাড়ব ক্যান, পুলিশে খবর দিছে। কখন যে ধইরা লয় ঠিক নাই।

বোবাঠাকুর মৃদু মৃদু মাথা নাড়েন। অঞ্জলি এসে পায়ের দাদের খয়েরি দাগে আলতো আঙুল ছুঁইয়ে প্রণাম করল। অঞ্জলি আজ খুব সংক্ষেপে ও-ঘরের কাজ সেরে সকাল সকাল চলে এসেছে। এখন এঘরের রান্না। শিখাকে ওর মামারা নিয়ে গেছে। অঞ্জলি এঘরে আজ কয়েকটা পদ বেশি রান্না করেছে। অসীম যা যা খেতে ভালবাসে। বাজারে যাবার সময় বলে দিয়েছে, বুড়ো দেখে সিম আনবেন। অসীম সিমের বিচি ভালবাসে। বিট আনবেন বিট। অসীম যদিও মাংসের হাড় চিবোতে ভীষণ ভালবাসে, কিন্তু মাংসের কথা বলেনি অঞ্জলি।

ওরা খেতে বসেছিল। বোবাঠাকুর খেতে বসার আগেই বুড়ো আঙুল আর দাঁতমাজার আঙুল দুটো একত্র করে ঘষতে লাগলেন। তখন অনঙ্গমোহন অসীমের দিকে তাকিয়ে বললেন—সৈন্ধবানয়। বিলু বুঝতে পারল এখনও পড়াচ্ছেন দাদু। অমরকোষ হল শব্দ সংকলন গ্রন্থ। শব্দের অর্থ বলা আছে। সৈন্ধব শব্দের নানা অর্থ হয়। অনঙ্গমোহন বলেছিলেন সৈন্ধব শব্দের অর্থ লবণ এবং অশ্ব দুই হয়। যখন কোনো যোদ্ধা বলেন—সৈন্ধব আনয় তখন কি তাহাকে লবণ আইন্যা দিবে? না অশ্ব আইন্যা দিবে? নিশ্চয় অশ্ব আইন্যা দিবে, আবার ভোজনকালে যদি কেহ বলে, সৈন্ধব আনয় তখন কি তাহাকে অশ্ব আইন্যা দিবে? উঁ-হু। লবণ আইন্যা দিবে। স্থান কাল পাত্র অনুসারে একই শব্দের বহু অর্থ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসীম লবণের পাত্রটা আনতে ওঠে না। অনঙ্গমোহন ভাবলেন, এটা অসীমের অভিমান। বিলুই এনেছিল। আসলে অসীম তো জানে, ওর বাবা এক্ষুণি নুন আর তরকারির খেলা শুরু করে দেবে। আর ঐ খেলা দেখে মুখ টিপে টিপে হাসবে বিলু, বিলুর মা। সেই জন্যই নুনের পাত্রটা আনতে চায়নি।

বোবাঠাকুর ভাত আর তরকারি মাখলেন। এর পরই নুন দিলেন ছিটিয়ে। প্রথম গ্রাস খেয়েই মুখ কুঞ্চন করলেন। নুন বেশি হয়ে গেছে। সুতরাং আর একটু ভাত। ভাত দেওয়া হল। শুকনো শুকনো হয়ে গেছে। সুতরাং আর একটু তরকারি। তরকারির সঙ্গে আবার নুন। এঃ, নুন বেশি। বোবাঠাকুরের মুখ বিকৃত। আর একটু ভাত। এবার আর একটু তরকারি। অনঙ্গমোহন প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন।

ফাল্গুনে বালা আর ভগিনী গৃহে শালা একটু চঞ্চল তো হবেই। অঞ্জলি একসঙ্গে অনেকটা ভাত দিতে চায়। অঞ্জলি যখন হাতা দিয়ে হাঁড়ির থেকে ভাত তুলছিল তখন ঘর্ষণের তীব্র ধাতব শব্দ আসছিল। ঐ ধাতব শব্দের ভর্ৎসনায় বোবাঠাকুর দু'হাতের মুদ্রায় নিষেধ করল, না, আর নয়। অঞ্জলি তবু দিল।

অসীম গুছিয়ে নিয়েছে ওর জিনিসপত্র। লাট্টু, লেত্তি, মার্বেল, চুম্বক, স্প্রিং। অঞ্জলিকে প্রণাম করল। অনঙ্গমোহনকে প্রণাম করল, অনঙ্গমোহন তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না। অসীমকে জড়িয়ে ধরে বললেন, অসীম, তুই পড়াশোনা ছাড়িস না। সংস্কৃত না পড়িস-না পড়িস, ইংরাজি পড়িস, অঙ্ক করিস। অঙ্ক, অঙ্ক।

অসীম স্বপ্নার দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে, তারপর ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। অনেকক্ষণ কিছুই বলে না। তারপর বিলুকে বলে, খুব রাগ আর অভিমানে বলে—বিলুরে তুই শোন—সাহেবদের 'মোসিসো ওকে সা-দা' ভাল কথা নয়। গালাগালি। মা তোলা গালাগালি। 'পিচকোমা তে' খুব খারাপ গালাগালি। বুনুল সাহেব খুব বদ। স্বপ্নাকে খুব খারাপ কথা বলেছিল। বুনুল সাহেবকে ইট ছুঁড়েছি বেশ করেছি। স্বপ্নার দিকে তাকাল অসীম। স্বপ্না চোখ নামাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠোঙা বানাতে বানাতে অনঙ্গমোহন হঠাৎ পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠীর খাতাপত্রগুলি বার করলেন। অসীম চক্রবর্তী নামটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ঠিক করে উঠতে পারেন না, 'উ' লিখবেন, না 'অ' লিখবেন। 'উ' অর্থাৎ উপস্থিত, 'অ' অর্থাৎ অনুপস্থিত। সুমিতাকে উ লিখছেন। সুতরাং অসীমকেও উ রাখা যায়। সুমিতা হরি ঘোষ স্ট্রিটে আছে, আর অসীম অশোকনগরে। তফাত তো এই মাত্র। আছে। দুজনেই আছে এই অন্তরে। ঠোঙায় আঠা মারতে লাগেন আবার।

খেমকরণ প্যাটনের সমাধিভূমিতে আঠা লাগালেন। নাবালিকা ধর্ষণ-এ আঠা লাগালেন। পি বর্মণের অসাধারণ গোল কিপিং-এ। পি বর্মনের গায়ে আঠা মারলেন। হাওড়া পণ্ডিতসমাজ। রবিবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় সমাজভবনে মহাকবি কালিদাস স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সভাপতিত্ব করিবেন পশ্চিমবঙ্গের মহা কারা পরিদর্শক ড. অবনীভূষণ রুদ্র আইএএস মহাশয়, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিবেন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মাননীয় কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় এমএলসি...কাগজটা ভাঁজ করলেন। হায়রে, কতদিন এইসব সভায় যান না অনঙ্গমোহন। দরিদ্রের কাছে সভা বিষ। বিষং সভা দরিদ্রস্য।

সেদিন গিয়েছিলেন অনন্তনাথ জ্যোতির্ভূষণের পিতৃশ্রাদ্ধে। প্রথম পাতখুরিতে বসার জন্য আমন্ত্রণ পাননি অনঙ্গমোহন। তারাদাস গরম কাপড়ের ফতুয়ার উপরে সিল্কের চাদর জড়িয়ে এসেছিলেন। শুনলেন, বৌবাজারে এক সোনার দোকানে বসছেন। গ্রহাচার্য। তারাদাস, তুমি তো স্মৃতির পণ্ডিত, গ্রহের কী বুঝ? অনঙ্গমোহন রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তারাদাস রহস্যের হাসি হেসেছিলেন। তারাদাসও প্রথম পাতখুরিতে। অনঙ্গমোহনের ছেঁড়া নামাবলী। ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া হরেকৃষ্ণ হরে রাম। এক মাড়োয়ারি, ব্রাহ্মণ প্রণাম করতে এসেছিলেন সেখানে। অনঙ্গমোহনের কাছেই আসেননি তিনি।

আজ খাওয়া আধাপেটা। রেশনে চাল নেই। অনঙ্গমোহন ঠোঙায় মন দেন।

অঞ্জলি আর স্বপ্নাও রয়েছে ঘরে। অঞ্জলি হাই তুলল। তারই মধ্যে স্বগতোক্তি করল—শিখার মা আইজ নিচে নামল। নিজে নিজে বাথরুমেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল।

অনঙ্গমোহন আঠা লাগাচ্ছেন। কে হোড়ের মহাভৃঙ্গরাজ তেল—চালের অভাবে হাহাকার। শুভমুক্তি আরজু। শ্রেঃ রাজেন্দ্রকুমার, সাধনা। ডা. এ কে চৌধুরীর কৃমিনাশিনী। কবিরাজ এন এন সেনের অসাধারণ কেশ তৈল—কেশরঞ্জন...

বুঝলি স্বপ্না, শিখার মা এখন বেশ ভাল। অঞ্জলি আবার বলল।

একটি পরিবারের সকলের একযোগে আত্মহত্যা। দেনার দায়ে জর্জরিত পরিবারের কর্তা পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক বীরেন দে স্ত্রী মণিমালা ও শিশু পুত্র-কন্যাসহ বিষপান করিয়াছেন। বীরেন দে লিখিয়া গিয়াছেন, অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যেন বাড়িভাড়া মিটানো হয় এবং বাকিটা যেন প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হয়।

অঞ্জলি আবার বলল—শিখার মা এখন বোধহয় নিজেই রান্না করতে পারবে।

যাত্রায় এই সংলাপটা এভাবে উচ্চারিত হলে একটা প্রচণ্ড ঝং শব্দ হত। এখন মুহূর্তের জন্য থেমে গেল অনঙ্গমোহনের আঠা মাখা আঙুল। স্বপ্না কিছুক্ষণ নৈঃশব্দ্যের পর বলল, ঐ কাজ আর করতে হবে না। থাক গিয়ে। আমরা ভাল করে ঠোঙা বানাব। অঞ্জলি বলল, বিলু যে এইটে পড়ে। নাইনে উঠলে সাইন্স লইয়া পড়তে হইব না? অঙ্কে ভাল নম্বর না হইলে কি সাইন্স দিব? একটা অঙ্কের মাস্টার দরকার। চাল আড়াই টাকা। আমি অন্য কাজ নিমু। অনঙ্গমোহন চুপ। মিন মিন করে কি একটা বলতে চেষ্টা করছিলেন কিন্তু বলতে পারলেন না।

সেদিন শিখার মা-কে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হয়েছিল, অজিতবাবু স্টোভ জ্বালিয়ে দুধ বসালেন। শিখার মা বলেছিল, তুমি সর, আমি করে দিচ্ছি। অঞ্জলি ছিল সামনে। অঞ্জলি বলল—সে কী দিদি, তুমি একদম আগুনের ধারে আসবা না। আমি করি। রাত্রের ভাতও অঞ্জলি করে দিয়েছিল। শিখার বাবা পরদিন সকালে অনঙ্গমোহনকে বলেছিল—পণ্ডিতমশাই, আপনাকে আমি গার্জিয়ান মানি। আপনি যা বলেন, শুনি। আপনি গানের ইস্কুল তুলে দিতে বলেছিলেন, আমি তুলে দিয়েছি। এখন একটা কথা বলি, বলতে সংকোচ হচ্ছে। আমার সংসারে এখন রান্নার লোক দরকার, বাইরের লোক নিতে হলেও নিতুম। যদি বিলুর মা...যা লাগে, মানে টাকাকড়ির ব্যাপারে কোনো ইয়ে নেই...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনঙ্গমোহন বলেছিলেন—না না, সে কী কইরা সম্ভব?

অঞ্জলি তখন এগিয়ে এসেছিল। বলেছিল—এ তো নিজেদের ঘরের ব্যাপার। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না...

কোথায় অন্য কাজ নেবে মা?

নিমুই একখানে...

আমিও কাজ নিলে পারি। স্বপ্না বলল। স্বপ্না আজ শাড়ি পড়েছে। বেশ বড় বড় লাগছে স্বপ্নাকে।

এ সময় ন্যাড়া এল। স্বপ্না আঁচল টেনে নিল। ন্যাড়া এল এক বান্ডিল কাগজ নিয়ে। ন্যাড়ার চায়ের দোকানে রাখে। ন্যাড়ার গায়ের থেকে ঘামের গন্ধ বেরুচ্ছে। স্নান করেনি। এখন বেলা দেড়টা। ন্যাড়া বলল—জল খাব।

স্বপ্না জল নিয়ে আসে। গ্লাসের জলের রঙ ঈষৎ ঘোলাটে। অনঙ্গমোহন বুঝলেন, জলে লেবু দেওয়া হয়েছে। জলের গেলাসটি নেবার সময় আঙুলের সঙ্গে আঙুলের স্পর্শ, অনঙ্গমোহন দেখলেন। খবর কাগজগুলি বেশি দিনের পুরনো নয়। বহুদিন রেডিওতে ব্যাটারি নেই। খবর শোনা হয় না। খবরের কাগজগুলি দেখতে লাগলেন অনঙ্গমোহন।

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।

বসিরহাটের ছাত্র-মিছিলে পুলিশের গুলি। শতাধিক আহত। শহরে ১৪৪ ধারা। অজয় মুখার্জির প্রতিবাদপত্র পেশ।

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।

স্বরূপনগরে পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত।

রেশনে চাল আসে না। কালোবাজারে আড়াই টাকা কিলো। কেরোসিন নেই। ছাত্র-মিছিল দাবি তুলেছিল, ন্যায্য দরে কেরোসিন দাও। বিনিময়ে পেল গুলি। নিহত হল তেঁতুলিয়া স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র নুরুল ইসলাম। আহত পঞ্চম শ্রেণির মনীন্দ্র বিশ্বাস আর দশম শ্রেণির কার্তিক। এই দিন লাঠি চলেছে বনগ্রামে, নৈহাট্টিতে, বসিরহাটে, চাঁদপাড়া, গোবরডাঙা, অশোকনগর...

অশোকনগরেও লাঠি? অসীমের ঐ শ্লোকটা কি মনে আছে? ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ। মিছিলের আগে যাইতে নাই।

বিলুও চলে এসেছে। ছাত্র ধর্মঘট। বইটা রেখে রান্নাঘরে গেল বিলু। থালা ও হাঁড়ির ঝনঝনাত শুনল। বিলু এসে বলল, কিছু নেই?

অঞ্জলি বলল—বুঝিস না? বড় হয়েছিস? পরিবার কর্তা অনঙ্গমোহন মাথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচু করেন। ঠোঙায় আঠা মারেন। গতকাল একটা মিছিল গিয়েছিল—খাদ্য চাই-খাদ্য দাও। নইলে গদি ছেড়ে দাও...

ন্যাড়া বলল—কী রে বিলু, এখন একটু হয়ে যাক—এই তো, তুই, আমি আর ও—স্বপ্না আছে। তিনজন। একটু টোলের কাজ হয়ে যাক।

অঞ্জলি বলল—তুমি স্নান-খাওয়া করবে না? বাড়ি যাও।

সে হবে খনে। ন্যাড়া বসে পড়ে।

অনঙ্গমোহন হঠাৎ শুরু করেন—খাইদ্যহীন উপবাসী দুই দরিদ্র ব্যক্তি রাজার নিকট আইস্যা কইল, দ্বন্দোহং। দ্বিগুরাপি চাহম। মদগৃহে নিত্যম ব্যয়ীবঃ। তৎপুরুষ কর্মধারয় যেনাহং স্যাম বহুপ্রীহিঃ। অর্থাৎ আমরা দুইজন। আমাদের দুটি গরু। আমাদের গৃহে সর্বদা অভাব। অতএব হে পুরুষ, এমন কাজ করুন য্যান আমার ঘরে বহুধন হয়।

দেখ তোমরা, এই বাক্যটার মধ্যে কেমন সুন্দর সবগুলি সমাসের নাম আছে। দ্বন্দ্ব, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, বহুব্রীহি। কেমন? ভারি মজা না? কপাল কুঁচকে ওঠে অঞ্জলির।

ন্যাড়া একটা কাগজ বের করল। বলল—আর একবার বলুন পণ্ডিতমশাই, খুব ভাল জিনিস। টুকে নিই। ঈশ, ইস্কুলে পড়ার সময় যদি এটা পেতাম? দ্বিগুণ উৎসাহে অনঙ্গমোহন বলতে থাকেন, এ কূটবাক্য। ন্যাড়া লিখে নেয়। ন্যাড়া বলে, পৃথিবীতে কত রকমের ভাল লোক যে আছে। তাই এই পৃথিবীটা চলছে। গোপীমোহন দত্ত লেনে একজন আছেন, বিনে পয়সায় ওরিগমি শেখান। ওরিগমি কী জানো স্বপ্না? কাগজ ভাঁজ করে জিনিস তৈরি করা যায়। দেখাব?

বাড়ির টবে বেগুন চাষ লেখা কাগজটা মুড়ে মুড়ে একটা খরগোশ বানাল ন্যাড়া। স্বপ্নাকে দিল। আঙুলে আঙুল। ঠিক সেই সময়ে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। ন্যাড়া বলল—পেটো পড়ছে। ফটিকের দোকানের সামনে ধোঁয়া। গতকালই ফটিকের দোকানের সামনে একটা মিছিল এসে বলেছিল, মজুত করা চাল বিলি করে দাও। ফটিক বলেছিল, চাল নেই। বড়ই ঝামেলা শুরু হল। ন্যাড়া ওঠে। স্বপ্না বলে, বসুন। এই গণ্ডগোলে যেতে হবে না। ন্যাড়া বলল—খিদে পেয়েছে যে?

স্বপ্না কিছু বলতে পারে না তখন।

অনঙ্গমোহন ঠোঙায় ফিরে যান। এখন ঠোঙাই যেন আশ্রয়। বসন্তের টীকা নিন। উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশযাত্রা। সংস্কৃতজ্ঞা পাত্রী চাই। কাগজটা টেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিলেন অনঙ্গমোহন। পড়লেন। বার কয়েক পড়লেন। কাগজটা ভাঁজ করে তাঁর ছিটকাপড়ের থলেতে ভরলেন।

ফটিকের দোকানের সামনে কালো কালো দাগ। পুলিশ এসেছে। মানুষের জটলা। অনঙ্গমোহন পেরিয়ে গেলেন। বাগবাজার স্ট্রিটে লাল পতাকা। মিটিং। অনঙ্গমোহন পেরিয়ে গেলেন। একটা দমকল গাড়ি ছুটছে। পুলিশের কালো গাড়ি ছুটছে। অনঙ্গমোহন পৌঁছলেন বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিটে। ঠোঙাটা বার করলেন। পাত্র সম্ভ্রান্ত, মিত্রবংশীয়। ৪২। কলিকাতায় নিজস্ব বাটি। উচ্চ চাকুরিয়া। সুকণ্ঠী, সঙ্গীতজ্ঞা, সংস্কৃতজ্ঞা পাত্রী আবশ্যক। ঠিকানা ললিতমোহন মিত্র...

ললিত মিত্রের বাড়ি খুঁজে পেতে কোনোই অসুবিধা হল না। বেশ বনেদি বাড়ি। সামনে ছোটখাটো বাগান। বাগানে ফুল। জবা-টগর-করবী এ সকল নয়। অন্য ফুল। বিলাতি। দরজার সামনে ইংরাজিতে নাম লেখা। কড়া নাড়তেই একটি বামা কণ্ঠের আওয়াজ শুনলেন—বেলই তো রয়েছে।

এক ভদ্রলোক নেমে এলেন। শুভ্র কেশ। সৌম্যদর্শন। কোঁচানো ধুতি।

—আপনিই কি ললিত মিত্র?

—হ্যাঁ, কী ব্যাপার।

—আমি একটি পাত্রীর সন্ধান নিয়া আসছিলাম।

—আসুন ঘটকমশাই। ভেতরে আসুন। একটা বেশ বড় ঘর। শ্বেতপাথরের টেবিল বড় বড় কৌচ।

—পাত্রী আমার ছাত্রী।

—ছাত্রী মানে?

—আমি অধ্যাপক। আমার একটি চতুষ্পাঠী আছে। আমার নাম অনঙ্গমোহন ভট্টাচার্য, কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। নত হয়ে প্রণাম করলেন। সেই মুহূর্তে সহস্র পাখি কূজন করে উঠল, পুষ্পবৃষ্টি হল ফটিকের দোকান সমেত সমস্ত কলকাতায়, দেবতারা শঙ্খ নাদ করলেন। তুচ্ছ মনে হল আড়াই টাকা চালের কিলো।

সুমিতার বর্ণনা দিলেন। তাঁর উচ্ছ্বাস অপ্রকাশ থাকল না। এর পর পাত্রের বৃত্তান্ত চাইলেন অনঙ্গমোহন।

জানলেন, পাত্র ইঞ্জিনিয়ার। জাহাজের চাকরি। পৃথিবী ভ্রমণ করে। বছরে দু-একবার আসে। তখন দুই-তিন মাস থাকে।

অনঙ্গমোহন জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলের বিবাহ দিতে এত দেরি করলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন?

—আর বলবেন না, ছেলের আমার গোঁ—বোনেদের বিয়ে না হতে বিয়ে করবে না। তিন বোনের বিয়ে হল। তারপরও নানা অছিলা। শেষকালে বলে, অনেক বয়েস হয়ে গেছে আর বিয়ে করে কী হবে। বিয়াল্লিশ কি একটা বয়েস?

—আপনার কি একই পুত্র?

—ওঃ বলা হয়নি। বড় ছেলে অ্যাডভোকেট। এখানেই ছিল। এটা আমার পৈতৃক বাড়ি। ও এখন বালিগঞ্জে বাড়ি করেছে। প্রথম জামাতা বোম্বের ভাবা অ্যাটমিক সেন্টারে ইঞ্জিনিয়ার। দ্বিতীয়টি ইংরেজির অধ্যাপক। তৃতীয়টি আমেরিকা প্রবাসী।

—সংস্কৃতজ্ঞা পাত্রী পছন্দ কেন আপনার?

—আমি যদিও কায়স্থ সন্তান, তবু সংস্কৃতসেবী। বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলাম। তিন কন্যাকেই সংস্কৃত পড়িয়েছি। তিনটিই সংস্কৃতে এম এ। আমি সংস্কৃতে নাটক অভিনয় করি, পরিচালনা করি। আমার দলের নাম 'প্রাচ্যসুধা'। রেডিওতে আমার পরিচালনায় সংস্কৃত নাটক অভিনয় হয়। এই যে বেতারজগতের ছবি। বার্তাগৃহম্ নাটকের অভিনয়। রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকের সংস্কৃতানুবাদ। এই যে আমি। এই যে সুধার ভূমিকায় আমার কনিষ্ঠা কন্যা। এই যে দেখুন, দিল্লিতে অভিনয়—চাণক্যবিজয়ম্ নাটকের ছবি—দেয়ালে বাঁধানো। রাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণন স্বয়ং দেখছেন। আর এই দেখুন আমার লেখা বই। সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতি। ললিতমোহন বলতে লাগলেন—কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের পর এই প্রাচ্যসুধা আর চালাতে পারি না। এদিকে পুত্র তো জাহাজি। ভাবলাম এমন পুত্রবধূ ঘরে আনব, যার সঙ্গে সংস্কৃত চর্চাটাও হয়, আর আমার প্রাচ্যসুধাও থাকে।

সব থাকবে আপনার। আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ হবে। ঠিক এমন পাত্রীই আমার ছাত্রী।

আনন্দে প্রায় নাচতে নাচতে অনঙ্গমোহন চললেন হরি ঘোষ স্ট্রিটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগরতলা থেকে চিঠি লিখেছিল হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতায় তোমা ভিন্ন আমার আত্মীয় বলিতে আর কে আছে? চিকিৎসার প্রয়োজনে নিতান্ত দিনকয়েক কলিকাতায় থাকিতে হইবে...

হেরম্বর চিঠি পেলেন বহুদিন পর। জগদীশের মৃত্যুর খবর শুনে একটা লিখেছিল। আর এই।

হেরম্ব যে আসছে এই কথাটা এখনো অঞ্জলিকে জানাননি অনঙ্গমোহন।

হেরম্ব নীলকমলেরই ছাত্র। একইসঙ্গে পড়াশোনা করেছে। অনঙ্গমোহনের সঙ্গেই ব্যাকরণ পড়েছে, একইসঙ্গে সাঁতার কেটে শাপলা তুলেছে, নোনাফল পেড়েছে। ছ'বছর ছিল অনঙ্গমোহনের বাড়িতে, দেশের বাড়িতে।

ছটা বছর, কৈশোর আর প্রথম যৌবনের ছ-টা বছর তো সোনার বছর। ঐ সুবর্ণকাল, হেরম্বর সঙ্গেই কেটেছে। সেই হেরম্ব আসবে। নীলকমল গ্রীষ্মকালে বেলের শরবৎ পছন্দ করতেন। কণ্টকময় বিল্ববৃক্ষ থেকে কে বেল পেড়ে আনবে তার প্রতিযোগিতা চলত। বেলকাঁটায় শরীর বিদ্ধ হত। 'কে বেল পাড়ল আইজ'? নীলকমলের ঐ প্রশ্নে অধিকাংশ দিন হেরম্ব বলত—আঁই হাড়ছি আচাইয্যাদ্যাব। হেরম্ব আসবে। শেষ এসেছিল বছর দশেক আগে। শ্রীক্ষেত্র থেকে তীর্থ করে আসার পর তিন দিন ছিল একসঙ্গে। ভালই কেটেছিল তিনটে দিন। এখন ওর বড় বেশি পঞ্জিকা-সর্বস্বতা। দাড়ি কামানোটাও পঞ্জিকা মেনে করছিল হেরম্ব। বসনটাও গৈরিক।

দেশ ভাগ হবার পর বেশ কিছুদিন পূর্ব পাকিস্তানেই ছিল হেরম্ব। তারপর ত্রিপুরার আগরতলায় যায়। ত্রিপুরার একটি ইস্কুলে পণ্ডিতের চাকরিও জুটিয়েছিল হেরম্ব। হেরম্ব আসবে।

অঞ্জলিকে কী করে বলবেন এখন? রেশনে যা চাল দেয় দুই দিন মাত্র চলে। বাইরে চালের দাম দুই টাকা বারো আনা—তিন টাকা। ঘরে চাল নাই। গমের দামও বেড়েছে। যবের আটা কিঞ্চিৎ সস্তা। অতিথিকে তো আটা খাওয়ানো যায় না। অনেকটা শ্বাসগ্রহণ করলেন অনঙ্গমোহন। প্রাণায়ামে এর নাম পূরক। বেশ কিছুক্ষণ শ্বাসবায়ু আটকে রাখলেন। কী বলবেন, বুঝতে পারছেন না। কুম্ভক। হঠাৎ হড়হড় করে বলে দিলেন বৌমা, হেরম্ব আসবে হেরম্ব, আমার বাইল্যবন্ধু। কালই আসবে, থাকবে ক'দিন। বলেই সরসর করে সরীসৃপের মতো বারান্দা পেরিয়ে রাস্তায় নেমে গেলেন। চললেন হরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোষ স্ট্রিট।

বিলু ছিল ঘরে। অঞ্জলি হঠাৎ ছুটে এসে ওর বইপত্র বন্ধ করেছিল। ঠোঙাই বানা বিলু, রিকশা চালা, মোট ব' তুই। আর আমি রাস্তায় নাইম্যা যাই—তোর দাদুর শখ মিটাইতে গেলে এইসব ছাড়া উপায় নেই। অসীম গেছে, আবার হেরম্ব না কে যেন আসবে। আমার আর ভাল্লাগে না। আমি ঐ মাড়োয়ারি বাড়ি কাজ নেব। আজই যশবাবুর কাছে চললাম।

ক'দিন আগে অঞ্জলি বলেছিল বিলুকে, একটা অঙ্কের মাস্টার দ্যাখ। ক্লাস নাইনে উইঠ্যা, সাইনস্ পড়বি। সব ভাল ছেলেরা সাইনস্ পড়ে। সাইনস্ পইড়া চাকরি পায়। চাকরি কইরা তুই সোনা, আমারে সুখ দিবি। বিলু বলেছিল, তিরিশ টাকার কম তো প্রাইভেট হয় না মা। অঞ্জলি বলেছিল, সেই ভার আমার। আমি দিমু তোরে মাস্টারের ব্যাতন। তুই পড়। শিখাদের ঘরে অঞ্জলি যে ক'মাস রান্না করেছে তিরিশ টাকা করে পেত। এখন সে কাজটাও নেই। যশবাবু এসেছিলেন মাঝে দু'দিন। বলেছেন—ঐ টিন কারখানার মালিক অঞ্জলিকে একটা কাজ দেবেন। মালিকের বাড়িতে। অঞ্জলি যখন টিন কারখানায় কাজ করতো, বিলু দু'একদিন গিয়েছিল ওখানে। দেখেছে, ওর মা ওখানে টেবিলে টেবিলে জল দেয়, চা দেয়। চিঠিতে আঠা মারে। স্ট্যাম্প লাগায়।

এখন মালিকের বাড়িতে কী কাজ করবে মা? বিলু জিজ্ঞাসা করল। রান্নার?

—রান্নার ক্যান? মালিকের বাড়িতেই তো প্লাস্টিকের কারখানা হইছে শোনলাম। যশবাবু কইল। যশবাবু ঐখানে কাজ করে।

থাক। তোমায় যেতে হবে না মা। বিলু বলল। অঞ্জলি বলল যাইতে কি চাই আমি? সাধ কইরা যাই? তোর দাদু যা লাগাইছে। তোর মামার বাড়িই যাওন ভাল ছিল আমার। তোর বাপ মরার পর যখন চাকরি পাইলাম, তোর মামা কতবার কইছিল দিদি, বিলু-স্বপ্নারে লইয়া চইল্যা আয় আমার কাছে, শুধু ঐ বুড়ার মুখের দিকে চাইয়া আমি যাই নাই তখন।

বিলু কিছু বলে না, চুপ করে থাকে। বিলু শুনল ট্রাংক খোলার শব্দ। ট্রাংক বন্ধ করার ঝনাৎ। ন্যাপথলিনের গন্ধ। ছাপা শাড়িটা পড়ল মা।

—আমি মাড়োয়ারি বাড়ি যাই।

—তুমি যেও না মা।

—আমি ঠিক কইর‍্যা ফালাইছি।

www.amarboi.com ~

অঞ্জলি চলে যাবার পর আবার ট্রাংকটা খোলে বিলু। ট্রাংকের মধ্যে বাবার খাকি জামা, ধুতি, মায়ের কাপড়, কাঁসার থালা...। ডুবুরি হয়ে যায় বিলু। সারা গায়ে মাখে গঙ্গামাটির মতো স্মৃতি। তারপর ট্রাংকের গভীরে ডুব দিয়ে বার করে আনে ছোট্ট বাক্সটা।

আংটি।

আংটিতে খোদাই করা 'বিপ্লব'। বিক্রি করে দিয়ে পঁচাশি টাকা পায়। ঊনচল্লিশ টাকা দিয়ে পনের কিলো চাল কিনল বিলু। ঐ চাল নিয়ে যখন ফিরছিল, তখন বিলুর মনে হচ্ছিল—চাল নয়, গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছে ও।

সন্ধে হল। অঞ্জলি ফিরল না তখনো। স্বপ্না ঠাকুর প্রদীপ জ্বালিয়েছে, দুয়ারে জলের ছিটে দিচ্ছে। অনঙ্গমোহন ফিরলেন। বিলু ছুটে গিয়ে অনঙ্গমোহনের হাত ধরে। বলে দেখবে এসো...দেয়াল ঘেঁষে লাগানো চাল রাখার টিনের মুখটা কটাস্ করে খুলে দেয়। অনঙ্গমোহন দেখেন, টইটুম্বুর টিন। দেখেন বর্ষার বেত্রবতী নদী। কনককান্তিমদালস্য। পীনস্তনী। টিনের ভিতরে দু'হাত ঢুকিয়ে দেন সম্ভোগ। সম্ভোগের পর অনঙ্গমোহনের চোখ উৎসুক। কে আনল চাউল? বিলু বলল 'চুপ'। মাকে বোলো, তুমিই এনেছ।

—অর্থাৎ?

—মানে চালটা আমি এনেছি। কিন্তু মাকে বোলো তুমিই এনেছ।

—তুই কী কইরা আনলি?

—ধারে। তুমি ঐ সরকারি বৃত্তি পেলে শোধ দেবে।

—আমি মিথ্যা কমু?

—বিলু অনঙ্গমোহনের কাছে মুখ নিয়ে বলে, কও না একটু।

অনঙ্গমোহন বললেন, পারুম না।

বিলু বলল—প্লিজ-দাদু।

উঁহু।

তাহলে আমি যা বলার বলব। তুমি শুধু চুপ করে থেকো।

হে ঈশ্বর। কী বিচিত্র তোমার লীলা। তুমি রৌদ্রের দাবদাহ দাও, ছায়াও তোমার দান, ব্যাধি-রোগ সবই দিছ তুমি সঙ্গে সঙ্গে দিছ গুল্ম ও ওষধি। কী নরম তালশাঁস দিছ গরমের বিকালে। বিলুকে মনে মনে জড়িয়ে ধরেন অনঙ্গমোহন।

সেই রাতে বেশ গুমোট ছিল। দক্ষিণের ঐ জানালা ছিল হাওয়াহীন। অসীম চলে যাবার পর বিলু অনঙ্গমোহনের সঙ্গে শোয়। বিলুর বার বার ঘুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে যাচ্ছিল বাতাসের আরামে। কারণ, অনঙ্গমোহন হাওয়া করছিলেন তালপাতার পাখায়। বিলু বার বার বলছিল—থাক দাদু থাক। কিন্তু অনঙ্গমোহন বার বার হাওয়া করছিলেন। তখন বিলু ভাবছিল, পাখাটা কেড়ে নেবে। তারপর এক সময় পাখা থেমে গেলে বিলু চুপি চুপি পাখাটা সরিয়ে নিল। তারপর ঘুমোল। কিছুক্ষণ পর ঘুম ভেঙে গেলে বিলু পাখাটা হাতড়ে নেয়। অনঙ্গমোহনের দিকে পাখাটা হেলিয়ে বাতাস করতে গিয়ে টের পায়, বিছানা শূন্য। কলঘরে গেছে বোধহয়। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরেও যখন এল না, বিলু উঠল। দেখল, সিঁড়ির দরজা খোলা। সদর খোলা।

অনঙ্গমোহনের ঘুম হচ্ছিল না। ঘুম থেকে উঠে গিয়েছিলেন। শেষ রাত্রেই ওঠেন তিনি রোজ। গঙ্গায় যান। স্নান-আহ্নিক করেন। কিন্তু আজ অনেক আগেই উঠে চটের ব্যাগটা টেনে নিলেন। রাস্তায় বেরুলেন। চাঁদ তখন পশ্চিমে অনেকটা হেলেছে। অনঙ্গমোহন চটের ব্যাগটা নিয়ে এগোতে লাগলেন। ব্যাগের মধ্যে একটা লোহার শলাকা।

গতকাল বাইরে থেকে ফিরে অঞ্জলি বড় মনমরা ছিল। টিন ভর্তি চাল দেখেও উচ্ছ্বাস দেখায়নি। রাত্রে অঞ্জলি শুনল—চাল যেভাবে ধারে জোগাড় হয়েছে ঐভাবে কিছু কয়লা জোগাড় হয় না? আমি চাকরি নিয়েছি, শোধ করে দেব।

কয়লা? অনঙ্গমোহনের তখনই ঐ পোড়া কয়লার পাহাড়টার কথা মনে হয়। ভোরবেলা ভিড় হবার আগেই কিছু কয়লার টুকরো কি জোগাড় হয় না?

চিৎপুর ইয়ার্ডে যাবার সময় ব্যোমকালীতলা পড়ে। কালীমন্দিরের কোলাপসিব্‌ল্ গেট বন্ধ। ঐ বন্ধ দরজায় অনঙ্গমোহন মাথা ঠেকান, ঝং শব্দ হয়।

মা কালী। তুমি নাকি চোরদের সহায়, ডাকাতদের সহায়?...আমারও সহায় হও। তারপর ঐ বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন আরও কিছুক্ষণ। বলেন, হে ভগবন্—তুমি রূপ-বিবর্জিত, কিন্তু আমি তোমার রূপ কল্পনা করছি। তুমি বাক্যের অতীত, কিন্তু আমি স্তুতি দ্বারা তোমার অনির্বচনীয়তা নষ্ট করি। তুমি সর্বব্যাপী। তবু আমি মন্দিরের সামনে দাঁড়াই। আমার এই বিকলতা ক্ষমা কর। ক্ষন্তব্যো জগদীশ তদ্বিকলতা দোষম্। চললেন অনঙ্গমোহন পোড়া কয়লার পাহাড়ে। হাতে ব্যাগ, শিক, চৌর্যবৃত্তি? ক্ষন্তব্যো জগদীশ তদ্বিকলতা দোষম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেরম্ব এসে গেল। সঙ্গে ওর বড় ছেলে। হেরম্ব লাল রঙের বসন পরেছে, তান্ত্রিকদের মতো। মুখে দাড়ি। অনঙ্গমোহনকে জড়িয়ে ধরল। হেরম্বর গায়ে জ্বর।

হেরম্বকে অনেকদিন পর পেয়ে অনঙ্গমোহন খুশি। এরোপ্লেনে এসেছে হেরম্ব।

হেরম্ব তোমার কী অসুখ?

হেরম্ব ঠোঁট উল্টে হাতটা উপরে তুলে ধরে। ভীষণ ভগ্নগলায় বলেন—ঈশ্বর জানেন। ওর ছেলে বলল, বাবার কথা বলতে কষ্ট। অথচ কত গল্প করবেন ভেবেছিলেন অনঙ্গমোহন। পুরনো দিনের গল্প। সেই জল-ঝাঁপ? খেজুররস পাড়া, নতুন বৌকে ভূতের ভয় দেখানো...মনে আছে হেরম্ব ভাই, টোলের ছাত্ররা কিরকম খেলাইত তোরে? কলাপের ঐ সূত্রটা মিলাইয়া মিলাইয়া তোরে কী কইত?

হেড়ম্বের বৌ হিড়িম্বা।

পঞ্চমে পঞ্চমাংস্তৃতীয়ান্নবা।

অনঙ্গমোহন জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী কষ্ট হেরম্ব? কী অসুখ?

হেরম্ব গলায় হাত দিয়ে দেখালেন। দেখালেন—সাদা দাড়ির ভিতরে, গলা থেকে ঝুলে পড়েছে আতার মতো একটা মাংসপিণ্ড। ভাঙা, কর্কশ গলায় হেরম্ব বললেন—বাঁচুম না...

হেরম্বের ছেলে বলল—খায় না, জ্বর, বমি। ত্রিপুরায় সব কিছু হয়ে গেছে। তারপর অনঙ্গমোহনকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বলল—এবারে খুড়ামশয়, শেষ চেষ্টা। হাসপাতালে ভর্তি করামু। ক্যানসার হাসপাতালে।

হেরম্ব স্বপাকি। ওর জন্য আলাদা উনুন ধরাতে হল। আলাদা একটা হাঁড়ি।

হেরম্বর ছেলে বলল—আমি এখানে খামু না। আমি আমার মামাশ্বশুরের বাড়ি যাই। বাবা দুই দিন এখানেই থাক। এই সামান্য দুটা ভাত খায়। একসিদ্ধ ভাত। তবে আজ পটলটা বাদ। তৃতীয়া কিনা। দু'মুঠো ভাতও খেতে পারল না হেরম্ব। বমি বমি পাচ্ছিল। দুটো দিন কেটে গেল। হেরম্বের ছেলে একবার করে এসে খোঁজ নিয়ে যেত শুধু। সারাদিন বাইরে বাইরে—ওর বাবাকে ভর্তির চেষ্টায় ব্যস্ত।

হেরম্বর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তাও হল না অনঙ্গমোহনের। শুধু জানলেন—এখন তিন ছেলেই চাকরি করে। দুই ছেলে বিবাহিত। নিজের বাড়ি। বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটখাটো একটা কালীমন্দির রয়েছে। রেডিও আছে। গ্রামাফোনও। গ্রামাফোনে শ্যামাসঙ্গীত বাজে। তবে তো সুখের সংসার—অনঙ্গমোহন বলেছিল। কারণ 'সুখী গৃহকোণে শোভে গ্রামোফোন' ঠোঙার কাগজে প্রায়ই দেখেন তিনি।

হেরম্ব বলেছিল, হ। সুখেরই সংসার, সুখেরই দিন। সেইজন্যই তো আরও কটা দিন বাঁচতে ইচ্ছে করে অনঙ্গভাই।

একটু কথা বললেই হেরম্বর হাঁপ ধরে। শুয়েই থাকেন সারাদিন। জেগে থাকলে মালা জপ করেন। গায়ত্রী জপ করেন। গায়ত্রী জীবন বর্ধন করে। ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যান অনঙ্গমোহন। গরম জল, বাতাস করা, এটা ওটা রুগী সেবা তো কম নয়। স্বপ্নাও অনেক করে। মাঝে মাঝে বিলুও হাতের থেকে টেনে নেয় পাখা।

অঞ্জলি বেরুচ্ছে। অঞ্জলি কারুর দিকে না তাকিয়ে বলল—যাচ্ছি। চাকরি। আজ থিকা। অনঙ্গমোহন কারুর দিকে না তাকিয়ে মিনমিন করে বলল, দুর্গা দুর্গা।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করেছিল, কামদেবপুর কোথায়? ওখানে নাকি দৈব ওষুধ পাওয়া যায়। সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কি না। একবার বলল, হরিদ্বার যেতে পারলে হয়তো অসুখ ভাল হয়ে যেত। ওখানে নাকি একজন সাধু আছেন...

অনঙ্গমোহন কয়েকদিন সুমিতার সঙ্গে দেখা করেননি। দু'দিন রোগী-সঙ্গ করে একটু মুক্ত বায়ুর জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তিনি স্বপ্নাকে বললেন, তুই এই দাদুটাকে দেখ। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসছি।

ভীষণ সুখবর শুনলেন অনঙ্গমোহন। ললিত মিত্র কথা দিয়েছেন। দিনও প্রায় স্থির। পাকা কথাটা দেওয়া হয়নি শুধু অনঙ্গমোহনের অপেক্ষায়।

ললিত মিত্র যেদিন স-স্ত্রীক দেখতে এসেছিলেন, অনঙ্গমোহনও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন ললিতমোহন। যেমন মৃচ্ছকটিক কার রচনা কিংবা শিশুপাল বধ সিলেবাসে আছে কি না, বলেছিলেন অভিনয় পারবে তো? রেডিওতে সংস্কৃত নাটক করি আমরা।

ওঁর স্ত্রী বলেছিলেন, কী আর বলব। সদ্বংশের মেয়ে। ছেলেকে দেখো। ওটাই প্রায় কথা দিয়ে দেওয়া। তবু ললিতবাবু বলেছিলেন, ছেলে আসার কথা আছে। ও একবার দেখুক।

তা ঐ নাবিক ছেলেটি এসে পড়েছে। পাত্রী দেখতে আসেনি। বাবা-মা'র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পছন্দ, আর কিছু বলার নেই। সুতরাং বিবাহ স্থির। অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছিল অনঙ্গমোহনের। যেন একশো ছাত্র টোলে ভর্তি হল। অনঙ্গমোহন বাড়ির দিকে ছুটলেন। ট্রামের ঘণ্টায় ঝুমঝুমি বাজে, কলকাতার ভিড়ে করতালি, রিকশাওয়ালার ঘণ্টাধ্বনিতে আনন্দ সমারোহ, মোটর হর্নে শুভ শঙ্খধ্বনি। আনন্দ আনন্দোব্রহ্ম।

আনন্দদ্ধোব খল্বিমনি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দের জাতানি জীবন্তি... চু কিত কিত চু কিত। বাড়ি আসেন। শুভ সংবাদ।

ঘরের দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিতেই খুলে যায়। দরজা খুলতেই বজ্রাহত হন অনঙ্গমোহন। স্বপ্নাকে আঁকড়ে ধরে আছে হেরম্ব। স্বপ্না বিমূঢ়া-বালা। হেরম্বের গলায় রুদ্রাক্ষ মালা দোলে, মুখে লালা। হাতির তাবিজ-মাদুলি কাঁপে। স্বপ্নাকে লেপ্টে ধরে আছে হেরম্ব। স্বপ্নার একটা হাত খামছে ধরছে হাওয়া।

অনঙ্গমোহন নিজের গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারলেন।

হেরম্ব বলে ঐ সব কিছু নয়, শুন অনঙ্গ, ঐসব কিছু নয়, আমি শুধুমাত্র বাঁচার জন্য...

অনঙ্গমোহন বললেন, গর্ভস্রাব...

হেরম্ব মিন মিন করে—শুন অনঙ্গ, ষোড়শী সান্নিধ্যে দেহ নীরোগ হয়। তন্ত্রামৃত সুধায় আছে। চরক সংহিতায় আছে। অষ্টাবক্র সংহিতাতেও আছে, নবযৌবনা প্রাণকরাণি। চাণক্যশ্লোকে আছে, সদ্যোমাংস নবান্নঞ্চ বালা স্ত্রী ক্ষীর ভোজনম...

আবার সংস্কৃত মারাও, অনঙ্গমোহন জ্বলে ওঠেন।

হেরম্ব বলে, শুধু বাঁচার লাইগ্যা...আর কিছু নয়। শাস্ত্রে আছে...

—তোমার শাস্ত্রের পায়ুমেহন করি আমি...এই বলেই দেয়ালের পাশে বইয়ের তাকে লাথি মারলেন তিনি। ছিটকে পড়ল কাব্য চন্দ্রসুধা—নৈষধ চরিত—কাদম্বরী। তক্ষুণি আবার গিয়ে তুলে নিলেন। চাদরে মুছলেন। ছিঁড়ে যাওয়া পাতাটিকে শুশ্রূষা করলেন অনঙ্গমোহন। হাত বুলোলেন। বাছা, সংস্কৃত ভাষা। তোর দোষ কী। আমরাই অধম। ভাষার সঙ্গে আচার আমরাই যুক্ত করেছি। এটা আমাদেরই বিফলতা। সংস্কৃত বইগুলির গায়ে হাত বুলান অনঙ্গমোহন। আসলে স্বপ্নার গায়েই হাত বুলোচ্ছিলেন। স্বপ্না কাঁদছিল। যৌবন বড় অরক্ষিত এই সংসারে। শাস্ত্রও রেহাই দেয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ বহুদূর সামনে চড়াই তবুও মিছিল এগিয়ে যাও।
রাত কত হ'ল প্রশ্ন কোরো না শুধু বোবাদের ভরসা দাও
মৌন মিছিলে যদি জাগে আজ ভাঙা পাঁজরের যন্ত্রণা
তবু রোদে পোড়া হাসি মুখে দাও এগিয়ে চলার মন্ত্রণা।...
হৃদয় এখন প্রশ্ন করো না কী পেতে পারতে পেয়েছ কই
আজকে মিছিলে স্বপ্না তোমার বাসর পাতার সময় নাই
তার চেয়ে এসো মৌন মিছিলে বুকের আগুন ছড়িয়ে যাই।

১৪ মার্চের বসুমতী কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর লেখা ঐ কবিতাটি জোরে জোরে পড়ছিল বিলু। ১৩ মার্চ কলকাতায় মৌন মিছিল বেরিয়েছিল, বিশাল মিছিল। মিছিলে ছিলেন অনেক বিশিষ্ট লোক। বহু জায়গায় সৈন্য নেমেছে। বাদুড়িয়া, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর আরও বহু জায়গায় আগুন জ্বলছে। কলকাতায় ট্রাম পুড়ছে, বাস পুড়ছে, গুলি চলছে, মানুষ মরছে, চাল সাড়ে তিন টাকা কিলো। সমস্ত স্কুল বন্ধ। আজ এপ্রিলের ছয়। হরতাল। অঞ্জলিও কাজে যায়নি। আজ অনেক ঠোঙা হবে। বিলু বলে, এই কবিতাটা থাক। এটা কাটব না। এটা দিয়ে ঠোঙা বানাব না। বিলু আবার পড়ে কবিতাটি। যখন বিলু দ্বিতীয়বার পড়ে—আজকে মিছিলে স্বপ্না তোমার বাসর পাতার সময় নাই, তখন অনঙ্গমোহন আচমকা বলেন—স্বপ্নার বিবাহ স্থির করছি আমি...

প্রত্যেকের চোখ অনঙ্গমোহনের দিকে স্থির। অঞ্জলি ভীষণ অবাক গলায় বলে, কার সাথে।

—কেন? ন্যাড়া?

স্বপ্না মাথা নিচু করে দেয়।

অঞ্জলি বলে, সে তো ব্রাহ্মণই নয়।

অনঙ্গমোহন বলেন, আমিই পরিবারের কর্তা। আমার নামেই রেশন কার্ড। এই আমার সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত শব্দের মধ্যভাগে বড় বেশি জোর দেন অনঙ্গমোহন। ফলে থুথু ছিটোয়। এই অনঙ্গ-সিদ্ধান্ত। অনঙ্গমোহন নিজেই এর টীকাভাষ্য করেন। যেখানে জীবন অরক্ষিত, যৌবন আক্রান্ত, সেখানে প্রতিলোম বিবাহ অবৈধ নয়। ঋতুমতী কন্যার বিবাহ-প্রয়োজনে যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালাশৌচ সংক্ষিপ্ত করা যায়, কালপ্রয়োজনে এই বিবাহও অন্যায় নয়। আসুন মহর্ষি গৌতম, পরাশর, মনু, আসুন কল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন। আপনারা পূর্ব পক্ষ হন, আমি উত্তর পক্ষ। কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিতা ন কর্তব্যোঃ বিনির্ণয়ঃ। আমি ধর্ম নষ্ট করি নাই। ধর্ম কাষ্ঠ পুত্তলিকা নয়। ধর্ম চলচ্ছক্তি যুক্ত। সহায় হন বিদ্যাসাগর। নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ মনে আছে আমার। আমি বিবাহ দিমু। চরৈবতি।

ক'দিন আগেই ন্যাড়াকে একাকী পেয়ে অনঙ্গমোহন সোজা প্রশ্ন করেছিলেন—আমার নাতিনি স্বপ্নার প্রতি তোমার অনুরাগ কীরূপ?

ন্যাড়া ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলেছিল—না, আমি মানে...

—সত্য বল ন্যাড়া, তুমি যে সংস্কৃত শিখতে আমার কাছে আস সেইটা শুধুই কি সংস্কৃতের জন্য...

ন্যাড়া কোনো উত্তর দেয় না।

অনঙ্গমোহন আবার বলেন—আমি সংস্কৃত সাহিত্যপাঠ করছি। অনুরাগের যে অন্ন নাই...এবং যা বললেন না তা হল অন্নহীন যৌবন প্রাণহীন প্রাণী। চিল শকুন উড়ে আসে। কখনো-বা ধর্মের নামে। শাস্ত্রের নামে। অন্নই প্রাণ। মহর্ষি উদ্দালকও তার পুত্রকে বলেননি কি, বৎস শ্বেতকেতো...অন্নই প্রাণ? অন্নই মন?

ন্যাড়া থাকে ওর দাদার সংসারে। একটা ছোট কোম্পানির কেরানি ওর দাদা। অনঙ্গমোহন দেখা করলেন। ন্যাড়ার দাদা বলল—ওর কথা আমি কিচ্ছু বলতে পারব না, ন্যাড়া হল খামখেয়ালি। যতটা পেরেছি করেছি। কাউকে বুঝতে দিইনি যে ন্যাড়া আমার সৎ ভাই। করুক লাভ-ম্যারেজ, নিজেরটা নিজে খাবে, আমার কী?

এক অদ্ভুত প্রণালীতে বিবাহ দিলেন অনঙ্গমোহন। কোনো সংহিতায়, কোনো স্মৃতিশাস্ত্রে, কোনো পৌরোহিত্য বিধিতে এরকম বর্ণনা নেই। তিনি নিজে সম্প্রদান করলেন, শালগ্রামশিলা সামনে রাখলেন। ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নি থেকে এনাং কন্যাং প্রজাপতি দেবাতাকামহং সম্প্রদদে পর্যন্ত নিজের সম্প্রদানের মন্ত্র পুরো সংস্কৃতে মন্ত্র পাঠ করলেন। কিন্তু পুরোহিত দর্পণের যেখানে যেখানে সালঙ্কারাং কথাটা আছে, সেখানে বাদ দিলেন, কারণ স্বপ্নার গায়ে কোনো অলংকার ছিল না। সম্প্রদান শেষে যেখানে ন্যাড়া কিংবা স্বপ্নার মন্ত্রপড়ার ব্যাপার ছিল, সেখানে স্রেফ বাংলায় মন্ত্রপাঠ করানো হল। সম্প্রদানের পর যজ্ঞ হল। যজ্ঞের আগুনে লাজ অর্থাৎ খৈ দিতে বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, অনঙ্গমোহন বলছিলেন, স্বপ্না—মন্ত্র বল—আমার পতি দীর্ঘায়ু হইয়া শত বৎসর বাঁচুক। জ্ঞাতিরা আমাকে স্নেহ করুক। আমি য্যান সংসারে শ্রী আনতে পারি। স্বপ্না পাথরের শিলে দাঁড়াল, ন্যাড়া মন্ত্র বলল—তুমি এই শিলায় উঠো। পাথরের মতো সহিষ্ণু হও। এইবারে পাণিগ্রহণ। হাত ধর তোমরা। বল হে দেবতা সকল, যদি পারো আশীর্বাদ কর। কও ন্যাড়া, কও—আমরা যেন এক প্রাণ থাকি, একমন থাকি। কও ওঁ অন্নপাশেন মণিনাং প্রাণ সূত্রেন গ্রন্থিনা...আহা, বাংলায় কও—অন্নই বন্ধন। অন্নের বন্ধনে তোমারে বাঁধলাম আমি, আহারে দু'গাল অন্নের জন্য ভাতের জন্য, শেষের দিকে এমন হচ্ছিল, কোনটা যে মন্ত্র, কোনটা যে অনঙ্গমোহনের স্বগতোক্তি কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছিল না। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল, ললিতমোহনও সুমিতার কানে কানে বললেন—প্রলাপ বকছে যে...

এই বিয়েতে লোকজন বিশেষ নিমন্ত্রিত হয়নি। তারানাথ বা কামাখ্যাচরণকেও বলেননি অনঙ্গমোহন। ন্যাড়ার সঙ্গে বরযাত্রী এসেছিল ওর আটজন বন্ধু। ন্যাড়ার দাদা-বৌদিও আসেনি। অনঙ্গমোহনের টোলের কয়েকজন কৃতী প্রাক্তন ছাত্রকেও চিঠিতে জানিয়েছিলেন, একজন এসেছে, সে কলেজের অধ্যাপক। সুমিতাও এসেছে। সুমিতার স্বামী আসেনি। ললিতমোহনই নিয়ে এসেছেন সুমিতাকে।

সুমিতার বিয়ে হয়ে গেছে প্রায় এক মাস আগে। অনঙ্গমোহন গিয়েছিলেন। বিলুও ছিল। অনঙ্গমোহন সেদিন সারাদিন উপবাসী ছিলেন। বিবাহ সম্পন্ন হলে কিছু মিষ্টি খেয়েছিলেন শুধু। বিলু যখন খাচ্ছিল, অনঙ্গমোহন সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, বিলুর খাওয়া দেখছিলেন, ছোলার ডাল যখন রাধাবল্লভীর মধ্যে মিশে যাচ্ছিল, অনঙ্গমোহন তখন বিলুর মুখের খুশি প্রাণের মধ্যে জড়িয়ে নিচ্ছিলেন। অন্ন প্রাণময়। অন্ন আনন্দময়। আনন্দই ব্রহ্ম।

অনঙ্গমোহন পরদিনই গিয়েছিলেন। সুমিতার স্বামী গৌরবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গ, সুপুরুষ। মাথার সামনের দিকটা কিছুটা কেশহীন কিন্তু সহাস্য, সপ্রতিভ। সুমিতা পরিচয় করিয়ে দিল—আমার গুরুদেব। এঁর কাছে সংস্কৃত পড়ি। ছেলেটি দু'হাত তুলে নমস্কার করল। বলল—যাবেন মাঝে মাঝে। অনঙ্গমোহন সুমিতাকে বললেন—তোমার প্রস্থান সময় উপস্থিত হল। বলেই বাক্‌রোধ হল অনঙ্গমোহনের। ছিটের থলের থেকে বের করলেন কয়েকটা বই। জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত টীকা সংবলিত শ্রীহর্ষর নৈষধচরিত। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসবদত্তা। বললেন—কবে এইসব ফুটপাতে বিক্রি কইরা দিই ঠিক নাই, তোমার কাছেই থাক। তারপর দিলেন কাব্যচন্দ্রসুধা। দিলেন আরও চার-পাঁচটি বই। বললেন—আমি দরিদ্র, এর অধিক আর কি দিমু।

সুমিতা অনঙ্গমোহনকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করল। বলল—আমার শ্বশুরবাড়িতে আসবেন। অনঙ্গমোহন বললেন—তোমার শ্বশুরবাড়িতে আনন্দে থাকো। তোমার শ্বশুর বড় ভাল লোক—তাঁর সেবা-যত্ন কইরো...।

অনঙ্গমোহন যেন মহর্ষি কন্বদেব। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় বিদায় দিচ্ছেন।...সুমিতা তুমি সবার প্রিয়া হও, স্বামীর প্রিয়া হও...

সুমিতা সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে বড়ই দীর্ঘসূত্রী। যখনই পরীক্ষা হোক, পরীক্ষাটা দিও। ঘরে পড়াশোনা কইরো কিন্তু...সুমিতা বলল—আপনিও যাবেন, অ্যাঁ? সুমিতার স্বামীও বলল—আসবেন, আসবেন।

সুমিতা গাড়িতে ওঠার সময় সুমিতার মা অনঙ্গমোহনকে প্রণাম করে বলেছিলেন, আপনার এ ঋণ জীবনে শুধতে পারব না। আপনি ঠিক করে দিলেন বলেই যা হোক করে বিয়েটা হয়ে গেল। আমার সেজটাকেও আপনার টোলে পাঠিয়ে দেব। তারপর পাঁচ টাকার কয়েকটি নোট বার করে অনঙ্গমোহনের দিকে ধরেছিলেন। এটা ধরুন। আপনার দক্ষিণা। ঘটককে দিলেও তো দিতাম। অনঙ্গমোহন তখন কোনো কটুবাক্য বলেননি, ভ্রূ কুঞ্চনও করেননি। 'রজত' শব্দের অর্থ অশ্রুও হয়। এই ভেবে, সামান্য মৃদু হেসে চলে এসেছিলেন।

সুমিতার বৌ-ভাতের দিন ললিতবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল অনঙ্গমোহনের। বৌভাত ব্যাপারটা এধারে এসে দেখতে পাচ্ছেন অনঙ্গমোহন। এখন নববধূ চেয়ারে বসে থাকে, ফুলে ফুলে সাজানো, নিমন্ত্রিতরা এসে এসে উপহার দিয়ে যায়। আগে বিবাহের তৃতীয় দিনে হত পাকস্পর্শ। নববধূ সেদিন রান্নাঘরে ঢুকত। নিমন্ত্রিতদের পাতে সামান্য অন্ন পরিবেশন করত।

অনঙ্গমোহন গিয়েছিলেন। বাড়ির সামনে নহবত আলোর মালা। গাড়ির সারি। কলহাস্য। সুবেশা রমণীদল। যেন সুরলোক। অনঙ্গমোহন পূর্ণকলস ও কলাগাছ লাগানো দরজার সামনে ক্ষণকাল দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর ভিতরে না ঢুকেই পালিয়ে চলে আসছিলেন। এমন সময় হা হা করে ছুটে এলেন ললিতবাবু। আরে পণ্ডিতমশাই আসুন আসুন...

ললিতবাবু উপরে নিয়ে গেলেন। সিংহাসনে রাজরানীর মতো বসে আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুমিতা। অনঙ্গমোহন দূর থেকে দেখলেন, কারণ সামনে সুবেশা সমারোহ। অভ্যাগতরা উল্টে অনঙ্গমোহনকেই দেখতে লাগল। যেন কোনো লুপ্ত জীব। শিখা-সূত্র উত্তরীয়ধারী অনঙ্গমোহনের বেশ অস্বস্তি লাগে। ললিতবাবু অন্য ঘরে নিয়ে যান, ঐখানে ললিতবাবুর সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু-বান্ধবরা আছেন। ললিতবাবু পরিচয় করিয়ে দেন—ইনিই অনঙ্গমোহন কাব্যব্যাকরণতীর্থ। অনেকে উঠে দাঁড়ালেন। হাত জোড় করলেন। এঁরা সব অধ্যাপক। সংস্কৃতে এম এ ডক্টরেট। সিল্কের পাঞ্জাবি পরা। কেউ কেউ সিগারেটে ধূম্রপান করছেন। ওদের মাঝখানে সংকুচিত হয়ে বসেছিলেন অনঙ্গমোহন। ফিরিঙ্গিদের মতো ফুলপ্যান্ট ও শার্টপরা একজন অধ্যাপক বললেন, আপনারাই হলেন আসল সংস্কৃতজ্ঞ। দেশ আপনাদের দেখল না। অন্য একজন বললেন, আমিও টোলে ন্যায় পড়েছিলাম কিছুদিন। আপনারই মতো একজন আচার্য ছিলেন। বলা যায়, তিনি বিনা চিকিৎসায়...

ওরা তারপর অনঙ্গমোহনের সঙ্গে বর্তমান সিলেবাস, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিশুপাল বধ, মেঘদূতম্ আলোচনা করে আবার ডিএ আর ইনকাম ট্যাক্স আলোচনায় নিজেদের মধ্যে ফিরে গেলেন। অনঙ্গমোহন উঠলেন। ললিতবাবু মিষ্টিমুখ করালেন। আর আড়ালে ডেকে নিয়ে দিলেন পঞ্চাশটি টাকা।

অনঙ্গমোহন বললেন—টাকা কিসের, ঘটক বিদায় নাকি? ললিতমোহন জিভ কাটলেন। বললেন, সামান্য পণ্ডিতবিদায়। অনঙ্গমোহন বললেন, পণ্ডিতবিদায়? কোথায় পণ্ডিত? কোথায় বিতর্ক? পূর্ব পক্ষ নাই, উত্তর পক্ষ নাই, শুনলাম তো মহার্ঘ্যভাতা, পরনিন্দা, প্রফুল্ল সেন, জ্যোতি বসু। ললিতমোহন বললেন—এদের রীতিই এই। অনঙ্গমোহন বললেন—ওরা পণ্ডিত বিদায় কি প্রত্যেকরেই দিতেছেন? অ্যামে পাস রা? ললিতমোহন বললেন—না, না, ওরা নেবেন না। আমিও নিমু না ললিতবাবু। অনঙ্গমোহন আঙুলে চাদরের কোণাটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলেছিলেন। তখন ললিতমোহন বলেছিলেন, তবে একটা গাড়িভাড়া... অনঙ্গমোহন টাকাটা নিয়েছিলেন। বুঝেছিলেন—এটা পণ্ডিত বিদায় নয়। ভিক্ষা। অনুকম্পা অথবা ঘটক বিদায়। এই দান যে অনঙ্গমোহন গ্রহণ করতে পারেন এরূপ অনুমিতি ললিতমোহনের হয়েছিল কীভাবে? পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ। ধূম দেখে অগ্নির সম্ভাবনা প্রকাশ পায়, 'ধূম' হেতু পদ। অনঙ্গমোহনের কি কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল? যাকে হেতু পদ হিসাবে ভাবা যায়? নাকি এটা সহজ অন্বয়? যেখানে ধূম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানেই অগ্নির অস্তিত্ব যেমন, যেখানে দারিদ্র্য সেখানে দুর্বলতা। সরলীকৃত অনুমিতি। অনঙ্গমোহন টাকাটা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বললেন—মহাশয়, গাড়িভাড়াও দরকার নাই, আমি তো হাঁইট্যাই আইলাম।

আজ এখানে এই বিবাহবাসরে ললিতমোহন নিমন্ত্রিত। একটা দামী শাড়ি তুলে দিয়েছেন স্বপ্নার হাতে। অঞ্জলি ভেবেছিল, শাড়িটা আগে পাওয়া গেলে এটা পরিয়েই বিয়ে দেওয়া যেত।

ললিতমোহন আসাতে অনঙ্গমোহন এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে, বিবাহকার্যের ফাঁকে একবার উঠে এসে ললিতমোহনকে জড়িয়ে ধরার উপক্রম করেছিলেন। কিন্তু ললিতমোহনের গিলে করা পাঞ্জাবি, সুগন্ধি, চুনোট করা ধূতি আর সর্বোপরি তাঁর অর্থমহিমার প্রচ্ছন্ন প্রাচীর তাকে বিরত করেছিল।

স্নেহ অতি বিষম বস্তু, অনঙ্গমোহন বহু আগেই বুঝেছিলেন। স্বপ্নার বিয়ের পর দিন এটা বড় বেশি করে অনুভব করছিলেন। নতুন কেনা টিনের ট্রাঙ্কটা ভর্তি হল না। যৌতুক কিছুই প্রায় ছিল না। অনঙ্গমোহন ভাবলেন, ট্রাঙ্কে কয়েকটা কাব্যগ্রন্থ দিয়ে দেবেন, যদি কোনোদিন কাজে লাগে। কিন্তু স্নেহ অতি বিষমবস্তু। অনঙ্গমোহন ঠোঙার জন্য ছ'আনা কিলোয় কেনা শারদীয় উল্টোরথ ট্রাঙ্কের ভিতরে গোপনে ভরে দিলেন।

কম্ব কহিলেন, আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়, তখন শকুন্তলা কহিলেন, বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না। এই বলিয়া বনতোষিণীর নিকট গিয়া কহিলেন, বনতোষিণী শাখাবাহুদ্বারা আমাকে আলিঙ্গন কর। কালির কল রে কালির কল—তোর ঘটর ঘটর আর শুনতে পাব না। মাসিমা, শিখাকে চিঠি দিয়েছিলাম। এল না। আমি যাই। দাদু, ঠোঙাগুলো কাটা হয়নি। তোমার কষ্ট হবে। দাদু ঠিকমতো খেয়ো, নিজেই খইগুড় নিয়ে নিও দাদু। কম্ব কহিলেন, বৎসে শান্ত হও। অশ্রুবেগের সম্বরণ কর। সিঁড়ি দিয়া পইড়া যাইবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসীমকে দেখে সবাই বেশ খুশি। এক মাসে ওর বেশ গোঁফদাড়ি বেরিয়ে গেছে। ফুলপ্যান্ট পরা, একটা লাল রঙের গেঞ্জি, ভাদ্রের ঘামে গায়ে লেপ্টে রয়েছে। দু'কাঁধে দুটো ব্যাগ।

ব্যাগদুটো রাখল অসীম।

চাউল? অ্যাতডি? অনঙ্গমোহন প্রায় আঁতকে উঠেন। আমি চালের কাজ করি, অসীম বলল। অসীম চালের ব্যাগের গায়ে হাত বুলোল। ব্যাগ যেন আদর বোঝে। ব্যাগ যেন হরিণশাবক।

বিলু বেশ উত্তেজিত হল। চালের কারবার করিস অসীমকাকু? হেভি পুলিস না? কর্ডনিং না কী যেন বলে? ও সব নেই?

—পুলিসের সঙ্গে ফিটিং থাকে। যেদিন এস্‌পেশাল হয়, সেদিন পালাই।

—এস্‌পেশাল মানে?

—উল্টোপাল্টা পুলিস।

—ভাল লাভ থাকে, নারে? বিলু জিজ্ঞাসা করে।

—লাভাংশের হাফ তো জগাদা নিয়ে নেয়।

অনঙ্গমোহন বলল—লাভাংশ নয় অসীম, লভ্যাংশ।

অসীম বলল—লাভাং হোক লভ্যাং হোক, টাকায় আট আনা জগাদার।

—তবু কীরকম থাকে? বিলু জিজ্ঞাসা করল।

—ডেলি—দশ টাকার মতো কাজ করি। আমার পাঁচ টাকা থাকে।

মন্দ কী। অঞ্জলি মুহূর্তের জন্য বিলুর দিকে তাকায়। কিন্তু অসীম তোর ইস্কুল? বিলু বলে।

—যাই না।

—আর যাবি না?

—কে জানে।

—ই বর্ণো যমসবর্ণে ন চ পরলোপ্য মনে আছে অসীম্যা? অনঙ্গমোহন বলেন।

অসীম হাসে।

—দ্বিবচনমনৌ?

—অসীম হাসে।

—অসীম্যা, বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইবকিংশুকাঃ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—চাঁদপাড়া থেকে চাল এনে হাবড়া ফেলতে পারলেই কেজিতে পনের পয়সা লাভ।

—অবিদং জীবনং শূন্যং দিকশূন্যা চ অবান্ধবাঃ

—বিলু—এই দ্যাখ টেরিলিনের গেঞ্জি। আরও দুইটা জামা আছে।

—দূরতঃ শোভতে মুর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ

—বর্ডার থেকে আনতে পারলে আরও লাভ।

—তোর বাপ তোরে কিছু কয় না অসীম্যা?

—বাবায় পেট ভইরা খায়, জোরে জোরে ঢেকুর মারে।

অনঙ্গমোহন উঠে দাঁড়ান। অসীমের দিকে তীব্রদৃষ্টি হানেন। খড়মের খটাং খটাং শব্দে বাজে অভিমান। খাতাটা বের করেন। পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠী। কলমটা বাগিয়ে ধরেন যেন শাণিত ছুরিকা। অসীম চক্রবর্তীর নামের উপরে ঘসটাতে থাকেন। কলমের নিব বেঁকে যায়। অনঙ্গমোহনের চোখের কোনায় টলটল করতে থাকে জল। ফ্যাকাসে নামাবলী জল শুষে নেয়।

বিলু বলল, তুই আজ এদিকেই মাল নিয়ে এসেছিস?

অসীম বলল—হাবড়াতেই মহাজন ফিট আছে। কিন্তু আজ মহাজন বেলগাছিয়ায় মাল পাঠাচ্ছে, লরিতে বসে চলে এলাম। আমিও পারসোনাল কিছু মাল নিয়ে এলাম। শ্যামবাজারে ঝেড়ে দেব। হাবড়া থেকে শ্যামবাজারে কিলোয় পঁচিশ পয়সা পড়তো। দে, একটা বাসন দে বিলু, কিছুটা চাল দিয়ে যাই।

বিলু বলল—সে কী? এটা তোর বিজনেসের চাল না?

বিজনেসের বলেই তো দিচ্ছি। কত ভাত খেয়েছি এখানে।

অসীম তো জানেই চালের টিন কোথায় থাকে—অসীম চালের টিন খোলে। চাল ঢালে। ঝন ঝন করে তীব্র বেজে উঠল টিন। কারণ ঐ টিনে চাল ছিল না। ঐ ঝনঝন, ঐ শূন্যতার আর্তনাদে অনঙ্গমোহন বড় লজ্জা পান। অসীম সে সময় দেবদূতের মতো শূন্য পাত্রে চালই ভরে যায়। তারপর চালের ঢাকনা বন্ধ করে ঢাকনার উপর চাপড় মারার গর্বিত ঠং শব্দ।

অনঙ্গমোহনের তখন তীব্র বাসনা হয়েছিল বলার জন্য—এই চাউল তুই লইয়া যা অসীম। বলতে পারলেন না। বলতে পারতেন, যদি এই পরিমাণ চাল তিনি এক্ষুণি এনে দিতে পারতেন।

স্বপ্না ভালো আছে তো, ওর বিয়ের চিঠি পেয়েছিলাম—কিন্তু বিয়ের পরে পৌঁছেছিল চিঠি। ওর সঙ্গে একবার দেখা করে যাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিখারা উঠে গেছে, না? অসীম জিজ্ঞাসা করল। বিলু বলল, দিন দশ। ওরা বাড়ি করেছে। অসীম আস্তে আস্তে বলল, রাস্তা থেকেই বুঝেছিলেম। কাপড় ঝুলছে না। জানালা বন্ধ...

দুপুরবেলা খেয়ে যেতে বলেছিল অঞ্জলি, অসীম খেল না কিছুতেই।

অনঙ্গমোহন সেই দক্ষিণের জানালার সামনে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়েছিলেন। অসীম মাথা নিচু করে ওখানে গেল। খুব আস্তে পায়ে হাত দিল।

অনঙ্গমোহন পা-টা সামান্য সরিয়ে নিলেন। অসীম তবু স্পর্শ করল পা। কোনো কথা বলল না।

দুপুরে খেতে বসে অনঙ্গমোহন থালাভরা ভাত পেলেন। অনঙ্গমোহন বললেন, এই ভাত আমি খামু না। অনঙ্গমোহনের দিকে তাকিয়ে অঞ্জলি পরিপূর্ণ হাসল। অনঙ্গমোহন যেন শিশু। যেন শিশুর বায়না। অঞ্জলি বলল, থাক। এই থালাটা বিলু নে। আমার আগের ভাত আছে। অন্য থালায় ভাত বাড়ল অঞ্জলি। বলল অসীম আসার আগেই তো ভাত রান্না হয়েছিল। পোয়াটাক চাল ছিল না? অসীম না এলে ওটাই আপনাদের দু'জনকে দিতাম। আপনি ওটাই খান। ওটা আপনারই কেনা। অনঙ্গমোহন মৌন থাকেন। মৌনং সম্মতি লক্ষণং। ভাত পাল্টে দিল অঞ্জলি। মোটা মোটা ভাত।

অনঙ্গমোহন মাঝে মাঝে বিলুর খাওয়া দেখছিলেন। আর বিলু অনঙ্গমোহনের। গত দু'সপ্তাহ বড় কষ্টে যাচ্ছিল। অঞ্জলি চাকরি করতে যায় না। কেন যে আবার ছেড়ে দিল, কেউ জানে না। ছেড়ে দিয়েছে না চাকরি চলে গেছে, সেটাও রহস্য। অনঙ্গমোহন চেটেপুটে খেলেন। তারপর গণ্ডুষ নিলেন।

ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা। তারপর বললেন, বিলু অন্ন ভুক্ত হইয়া ত্রিধা বিভক্ত হয়। অন্নের স্থূলতম অংশ হয় পুরীষ। মধ্যম ভাগ মাংস আর সূক্ষ্ম অংশ মন। সুতরাং অন্ন না পাইলে মন ভাল থাকে না। এই মীমাংসা কার কও দেখি? মহর্ষি উদ্দালকের। উদ্দালক শ্বেতকেতুরে কইলেন, পঞ্চদশ দিন ভোজন কইরো না। কেবল জলপান কইরো, তারপর আমার কাছে আইসো, কথা আছে। শ্বেতকেতু তাই করল। পনের দিন পর শ্বেতকেতু পিতার নিকট গেল। উদ্দালক কইলেন হে সৌম্য, ঋক্ মন্ত্র কও। শ্বেতকেতু তো কিছুই মনে করতে পারে না। কেবল মাথা চুলকায়। উদ্দালক কইলেন, বৎস, ভোজন কর। ভোজন করার পর শ্বেতকেতু ঋক্‌মন্ত্র, সামমন্ত্র, যজুর্মন্ত্র ফড়ফড় কইরা কইয়া দিল। সুতরাং বিলু, আজ তো উত্তম ভোজন হইল, একটু ব্যাকরণটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পইড়ো...

একটা ছোটখাটো উদ্গার তুললেন অনঙ্গমোহন। স্বোপার্জিত অন্নের শেষ উদ্গার। সরকারি বৃত্তি, ওরফে ডিএ-র টাকা যা তুলেছিলেন স্বপ্নার বিবাহে শেষ। ললিতবাবুর দাক্ষিণ্যে একটা রেডিও অনুষ্ঠানে যা পেয়েছিলেন তা দিয়ে চাল কেনা হয়েছিল। এবার কী করবেন অনঙ্গমোহন। বলে তো দিয়েছিলেন, ঐ চালের ভাত খাবেন না তিনি। ন স্খলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ। অনঙ্গমোহন বইয়ের তাকের কাছে দাঁড়ালেন।

প্রথমে তুলে নিলেন বিবাদ ভঙ্গার্ণব। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের স্মৃতি সঙ্কলন। স্মৃতিশাস্ত্রের কোনো দরকার নেই। তারপর চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের স্মৃতি সন্দর্ভ। কোটালীপাড়ার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ স্বহস্তে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন নীলকমলকে—শঙ্কর সম্ভবম্ নাটক। তুলে নিলেন। কমলকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কারের টীকা সংবলিত ময়ূর ভট্টের সূর্যশতক তুলে নিলেন, ভরে নিলেন বাজারের থলিতে। চললেন কলেজ স্ট্রিটে। হাঁটতে লাগলেন ট্রামলাইন বরাবর।

আজ অনন্ত নাগের মাতার সম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধতিথি। অনঙ্গমোহন নিমন্ত্রিত হননি। সমাজচ্যুত হলেন বোধহয়। নিজের নাতনিকে স্বহস্তে অব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন। তারাদাস একটা প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন। অনঙ্গমোহন তার উত্তরও দিয়েছিলেন। মিছিল যাচ্ছে—নুরুল আনন্দ অমর রহে। বাংলা বন্ধ সফল করুন। দেয়ালে দেয়ালে লেখা, বিকল্প সরকারই একমাত্র সমাধান। ওরা এলে চাল-ডালের দাম কমবে। সংস্কৃতরও হয়তো কদর হবে। হোক ওরা নাস্তিক। ভারতের দর্শন শাস্ত্রগুলির মধ্যে নাস্তিক দর্শন তো কম নেই। জৈন, বৌদ্ধ, চার্বাক তো আছেই, সংখ্য যোগ ন্যায় বৈশেষিকও-বা কম কী। এই দর্শন শাস্ত্র নিয়ে কী ঝামেলায় ফেলে দিয়েছিলেন ললিতবাবু রেডিও স্টেশনে।

সুমিতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন অনঙ্গমোহন, ললিতবাবু তখন বেঁচেছিলেন। অনঙ্গমোহনকে দেখে ললিতবাবু বলেছিলেন, পণ্ডিতমশাই, চলুন আমার সঙ্গে, আমি রেডিও স্টেশনে যাচ্ছি রেকর্ডিং আছে। আপনাকে ওখানে আলাপ করিয়ে দিই, মাঝে মাঝে ওরা ডাকে। কিছু বলতে বলে, টাকা দেয়।

—রেডিও? ওখানে আমি বলব আর ধরাব্যাপী সেই কণ্ঠ...

—হ্যাঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ওখানে কি কোনো যন্ত্রের ভিতরে কথা বলতে হয়।

—যন্ত্র নয়, মাইক্রোফোন। ও কিছু নয়। চলুন না। সুমিতাও বলল—যান না পণ্ডিতমশাই, কোনো ব্যাপারই নয়। ললিতবাবু বললেন—আপনাদের মতো লোকেদেরকে বহু আগেই ডাকা উচিত ছিল ওদের। চলুন আজ আলাপ করিয়ে দিই। সংস্কৃতের যিনি অফিসার, বড় ভাল লোক।

খালি গা, হাঁটুর কাছে ধুতি, গায়ে চাদর, পায়ে টায়ারের চটি ঐ লোকটাকে দেখে দারোয়ান আটকে দিল। ললিতবাবু আমার লোক বলে উপরে নিয়ে গেলেন। সাদা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় অনঙ্গমোহন একবার ললিতবাবুর কানে কানে বলেছিলেন, বীরেন ভদ্রকে একবার দেখা যায়?

—আলাপ করবেন? আমার সঙ্গে তো বিলক্ষণ আড্ডা হয়। ললিত মিত্র বলেছিলেন।

না থাক। অনঙ্গমোহন বললেন।

আরে আসুন স্যার, আসুন, আসুন—ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। ললিতমোহন বললেন—এই যে ইনি একজন পণ্ডিতমশাই। অনঙ্গমোহন কাব্যব্যাকরণতীর্থ। আমার বন্ধু এবং আত্মীয়। এঁকে প্রোগ্রাম দিতে হবে। ভদ্রলোক বললেন, শিওর শিওর। আপনি বলছেন, যেন নিশ্চয়ই দেব। আজই একটা করে দিন না।

আজই?

আজ্ঞে। বড্ড বিপদে পড়েছি। এইমাত্র ফণিভূষণ মিশ্রমশাই ফোন করে জানালেন যে, তিনি আসতে পারছেন না। অথচ কালই ব্রডকাস্ট। ভাবছিলাম, কী করব? ভালই হল...

—কী? সাবজেক্ট কী? ললিতমোহন জিজ্ঞাসা করলেন।

—ভারতীয় দর্শনে আত্মা উপলব্ধি।

—আত্মা উপলব্ধি? না আত্মোপলব্ধি?

—আত্তা উপলব্ধি। এই তো কার্বন কপি। এটিটিএ, ইউপিএ, এলএবি...

—ভুল আছে।

—আপনারই সাজেশন এটা প্রফেসার মিত্র...

আরে, আমি তো আত্মোপলব্ধিই বলেছি...আপনারাই চিঠিতে ভুল লিখেছেন। ঐ জন্যই মিশ্রমশাই আসেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেই বলে ভাষার মারপ্যাঁচ। টাইপ করতে হয় ইংরিজিতে আবার বেতার জগতে ছাপা হয় বাংলায়। এই তো গত সপ্তাহে 'বাবলা কাঁটা'কে লেখা হল 'বাবলা কান্ত'। ইংরিজিতে ছিল কে এ এন টি এ। শাসন অধিকারীকে শ্মশান অধিকারী ছাপল ক'দিন আগে। ঐভাবেই এই স্যাংস্কৃট টকটা আত্মা উপলব্ধি ছাপা হয়ে গিয়েছে। ছাপা যখন হয়েই গেছে, এইটা ফাইনাল। এটাই করিয়ে দিন প্রফেসার মিত্র, নইলে ডেভিয়েশন হয়ে যাবে।

পোদ্দার সাহেব এবার অনঙ্গমোহনের দিকে তাকান। বললেন, আপনার নাম-ঠিকানা দিয়ে দিন। কার্ড করেনি। প্রফেসার মিত্র বলছেন যখন, আপনাকে মাঝে মাঝে প্রোগ্রাম দেব। আসলে আমি হলাম পলিটিক্যাল সায়েন্সের এম-এ, আমাকে স্যাংস্কৃট দেখতে হচ্ছে। আপনি বোধহয় পুজোটুজো করেন...

—ললিতমোহন তাড়াতাড়ি বলেছিলেন—না উনি পূজারী নন। উনিও অধ্যাপক। টোলের।

—ও আচ্ছা। আপনি তাহলে স্ক্রিপ্ট রেডি করুন, দশ মিনিটের চাংক। প্রফেসার মিত্র, ওঁকে বুঝিয়ে দিন, প্লিজ।

অনঙ্গমোহন বলেছিলেন, অন্য বিষয় হয় না? যেমন নিজন্ত, তিঙন্ত প্রকরণ, কিংবা কালিদাসস্য কাব্যে...।

—আরে হবে হবে, ললিতবাবু আছেন—সব হবে। এখন এটা করে দিন তো—ললিতবাবুর রেকর্ডিংটা করিয়ে নিচ্ছি, ততক্ষণে একটা স্ক্রিপ্ট করতে থাকুন। এই নিন কাগজ-কলম। ললিতমোহন চামড়ার ব্যাগ থেকে একটা গোটানো কাগজ বার করলেন। কাগজটা সমান করে ভদ্রলোকের কাছে দিলেন। তিনি সই করলেন। অনঙ্গমোহন দেখলেন—রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত ভাবনা।

একবার দেখবেন নাকি পণ্ডিতমশাই! ললিতবাবু বললেন।

রবীন্দ্রনাথের আমি কী বুঝি? অনঙ্গমোহন আস্তে আস্তে বললেন।

ওরা ভিতরে গেলে অনঙ্গমোহন আত্মা নিয়ে বড় ফাঁপরে পড়েন। আত্মা কী? ভারতীয় দর্শনে আত্মার স্বরূপ কী? বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, আত্মানং বিদ্ধি। আত্মাকে জান। কিন্তু অনঙ্গমোহন আত্মাকে জানেন না। আত্মা কি অন্নময়? না, প্রাণময় না—মনোময় না নাকি আনন্দময়? আত্মা কি দ্রব্য? না অদ্রব্য? না চৈতন্য? নাকি আত্মাই ব্রহ্ম? আত্মা কি জ্ঞাতা না জ্ঞান? আত্মাই কি পুরুষ? প্রকৃতির বিপরীতে সৃষ্টির উৎস? নাকি আত্মাই নাই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন স্বর্গো নাপবর্গো নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। আত্মাকে পোড়ানো যায় না, জলে ভিজানো যায় না, নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। আত্মার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, তবে কেন আত্মাকে পিণ্ড খাওয়াই? মৃতানাপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধংচেত্তৃপ্তি কারণম/ গচ্ছাতামিহ, জন্তুনাং ব্যর্থং পাথেয় কারণম। ভারতীয় দর্শন যে বড় জটিল। ন্যায়ের সঙ্গে বেদান্তের গণ্ডগোল। বৈশেষিক আছে, যোগ আছে, মীমাংসা আছে, আত্মা সম্পর্কে সবাই ভিন্নমত। এছাড়া বৌদ্ধ আছে, জৈন আছে, চার্বাক আছে। কোন দর্শনের কথা লিখবেন অনঙ্গমোহন? সব তো জানাও নেই, পড়াও নেই, বইপত্রও নেই সামনে। অনঙ্গমোহনের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা হয়।

তবু তিনি শুরু করেন—দর্শন কথাটি আসিয়াছে দৃশ ধাতু হইতে। দৃশ ধাতুর বিশেষ অর্থ দেখা, সাধারণ অর্থ জানা। দৃশ ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিয়া দর্শন শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে—অনট্ প্রত্যয় করণেও হয়, আবার ভাব বুঝাইতেও হয়। ব্যুৎপত্তি অনুসারে দর্শন কথাটির অন্য অর্থও হইতে পারে। অনট্ প্রত্যয়করণে না করিয়া যদি ভাবে করা হয়, তবে দৃশ ধাতুর অনট্পূর্বক যে দর্শন শব্দটি সিদ্ধ হইবে তাহার অর্থ দর্শনের ভাব। এইদিক হইতে দর্শন কথাটির অর্থ 'উপলব্ধি'।

ললিতবাবু রেকর্ডিং শেষ করে ফিরে এলেন। বললেন—বাঃ পণ্ডিতমশাই। এই তো আপনি আপনার লাইনে এনে ফেলেছেন। শুধু ক্রিয়াপদগুলি চলিত করে নিন। অনঙ্গমোহন মৃদু হাসলেন। বললেন, বালকগণের সেই গরু রচনা মুখস্থের মতন। সেই ব্যাকরণ। আমার দ্বারা এইসব অসম্ভব। আমি পারুম না ললিতবাবু। ললিতবাবু বললেন, আরে কিচ্ছু ব্যাপার নয়। ন মিনিট তো। এবার আত্মার চৈতন্যগুণ, জীবাত্মা-পরমাত্মা ভেদ, কর্মফল, পুনর্জন্ম এইসব একটু একটু দিয়ে কয়েকটা মশলা ছড়িয়ে দিন। এই মশলাগুলি সংস্কৃত নিয়ে যে কোনো বক্তৃতায় লাগে। যেমন সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, শূন্যস্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, তত্ত্বমসি, সোহম, তমোসা মা জ্যোতির্গময় সৎ চিদানন্দ এইসব।

শেষ অবধি একটা খাড়া করেছিলেন অনঙ্গমোহন। মরালগ্রীবার মতো একটা যন্ত্রের সামনে মুখ রেখে ওটা পড়লেন। ঠাণ্ডা ঘরেও ঘেমে যাচ্ছিলেন চাদর জড়ানো অনঙ্গমোহন। সামনে কাচের দেওয়াল। ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানব এরূপ স্ফটিক নির্মিত পুরী নির্মাণ করেছিলেন। অনঙ্গমোহন দেখেন, কাচের দেয়ালের বাইরে প্রথম একজন, তারপর দু'জন, অতঃপর তিনজন দাঁড়িয়ে আছে, দেখছে লুপ্ত জীব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে প্রথম চেক পেয়েছিলেন অনঙ্গমোহন। সেই চেক ভাঙানো কম ঝামেলা নয়। ললিতবাবুই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

রেডিওর ব্যাটারি ছিল না। নতুন ব্যাটারি কিনে এনেছিল বিলু। বিলু জেলেপাড়ার সবাইকে বলে রেখেছিল। বন্ধুদেরও বলেছিল। যেদিন বাজল—ঘরের মধ্যে বিলু ট্রানজিস্টারটার আওয়াজ ম্যাক্সিমাম করে দিল। অনঙ্গমোহনের ভীষণ লজ্জা করছিল। বিলু কি জানত, সেই মুহূর্তে বাংলার ঘরে ঘরে রেডিও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে?

রেডিও'র ভদ্রলোক বলেছিলেন, পরে যোগাযোগ করবেন। কিন্তু ললিতবাবুর অকস্মাৎ মৃত্যুর পর আর এইসব করা হয়নি।

গত সপ্তাহেই বৃন্দাবন বসাক লেনে গিয়েছিলেন অনঙ্গমোহন। সুমিতাই ছুটে এসে দরজা খুলে দিয়েছিল। ছুটে এসেছিল, অথচ উচ্ছ্বাস ছিল না। ওর মুখচ্ছবি কান্তিহীন আর পাংশু লাগছিল। খরাক্লিষ্ট লতা। বিরহজর্জরা বুঝি। দিন সাতেক হয় জাহাজ ছেড়েছে। ওর স্বামী চলে গেছে। সুমিতার ঐ পাংশু মুখ দেখে অনঙ্গমোহন বইপত্র খোলার কথাই বলেননি। আসলে ঐ মতলবেই গিয়েছিলেন অনঙ্গমোহন। ললিতবাবুর মৃত্যুর পর বইপত্র খোলাই হয়নি।

সুমিতা ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল। ভিতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন অনঙ্গমোহন। ভিতরে ছোট ছোট টেবিল। ছোট ছোট চেয়ার। ব্ল্যাকবোর্ড। কোথায় গেল সেই পুরোন আমলের বড় গদিওলা চেয়ার? কোথায় সেই শ্বেতপাথরের টেবিল?

সুমিতা বলল—বসুন।

অনঙ্গমোহন ছোট একটা চেয়ারে বসেছিলেন।

সুমিতা মাথা নিচু করে খুব আস্তে আস্তে বলল, আমি অলক্ষ্মী।

একথা কেন? অনঙ্গমোহন বললেন।

—শাশুড়ী সবসময় বলছেন। বিয়ে হতে না হতেই আমি শ্বশুরকে খেয়েছি।

অনঙ্গমোহন বললেন, উনি না শিক্ষিত?

—হ্যাঁ। বিএ পাস।

অনঙ্গমোহন মাথা চুলকোতে থাকলেন। তারপর চেয়ার-টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, এসব কী?

বাড়িতে ইস্কুল হচ্ছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। নাম টাইনি টট্স।

ইংরাজি ইস্কুল? বাড়িতে? অনঙ্গমোহন অবাক হলেন। সুমিতা বলল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার জামাই বলল, বাবাও চলে গেলেন, আমারও জাহাজ ছাড়বে। আবার ছ'মাস পর ফিরব। তুমি কী নিয়ে থাকবে? একটা ইস্কুল কর। বাচ্চাদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। পাশের বাড়ির জিজা আছে, লোরেটোর মেয়ে। বাড়িতেও স্পেস আছে। আমি বললাম, আমি যে ভাল ইংরিজি বলতে পারি না। তখন ও বলল, জিজার কাছ থেকে শিখে নিও। প্র্যাকটিস করলেই হবে। আপাতত বাংলা ক খ পড়াও, ছড়া শেখাও, জ্যাক অ্যান্ড জিল, হাম্পটি ডাম্পটি মুখস্থ করাও—। আমার শাশুড়িও বললেন, সেই ভাল। যাবার সময় টেবিল-চেয়ার অর্ডার দিয়ে গেল। আর বাইরের সাইনবোর্ড। জানুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু হবে। অনঙ্গমোহন বলেছিলেন—তা হলে এই তোমার ইচ্ছা? সুমিতা বলেছিল—শ্বশুরবাড়ির ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। অনঙ্গমোহন তখন ঐ ছোট চেয়ারটা থেকে উঠে দাঁড়ান। গুটি গুটি ব্ল্যাকবোর্ডটার কাছে হেঁটে যান। বোর্ডটার সামনে দাঁড়ান। কিছু যেন বলতে চান। ঠোঁট নড়ে। ঠোঁট কাঁপে। ঠিক সেই সময় চঞ্চলা হরিণ শাবকের মতোই একটি নবযৌবনা তন্বী, জুতোর খট খট শব্দ সহযোগে বৌদি-বৌদি হেঁকে ঘরে ঢোকে। বলে বৌদি, পোস্টার ছাপা হয়ে গেছে। ট্রাইকালার। ভে-এ-রি অ্যাট্রাকটিভ। অনঙ্গমোহন ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে থেকে সরে এসেছিলেন। যাবার সময় শুধু বলেছিলেন, অগ্রহায়ণে পরীক্ষা কিন্তু। তুমিই ভরসা আমার।

হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্ট্রিটে পৌঁছে গেলেন—অনঙ্গমোহন। গোলদিঘি। সংস্কৃত কলেজ।

গোলশ্রীদীর্ঘিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকাতা নগর্যাৎ নিঃসংখো বর্ততে সংস্কৃত পঠন গৃহাখ্য কুরংগ কৃশাংগ...

অনঙ্গমোহনের হাতে চটের থলে। তাতে বই। তাঁর প্রিয় বই।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনের রেলিঙে দাঁড়ালেন অনঙ্গমোহন। কলেজের সামনে জটলা। ছেলেমেয়েরা চিৎকার করছে আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে। অধ্যক্ষ দূর হটো। এ লড়াই, বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে। অনঙ্গমোহন রেলিঙের সামনে দাঁড়ান। কত বই। অনঙ্গমোহনের হাতে চটের ব্যাগ। ব্যাগে বই। বইগুলো নড়েচড়ে ওঠে। অনঙ্গমোহন এবার বই বিক্রি করবেন। অনঙ্গমোহন হাতটা চালান করে দিলেন ব্যাগের ভিতরে। এক বইকে চেপে ধরলেন। বইটা ছটফট করে উঠল। ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে। একটি কমবয়সী ছেলে বক্তৃতা দিচ্ছে, মুখটা একটু বঙ্কিম। ভিয়েতনামের লড়াই আর আজকের কলেজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্রিটের এই লড়াই, দুটো পৃথক ঘটনা নয়। আমাদের সমবেত শক্তি বুলেট রুখে দেবে। ফিরিয়ে দেবে কাঁদানে গ্যাসের শেল। চটের থলের ভিতর অনঙ্গমোহনের লজ্জামুঠি। একটা বই ছটফটাচ্ছে। রেলিঙের সামনে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে বই দেখছে। কথা বলছে। জীমূতবাহন, বেণীসংসার এইসব দু'একটা কথা কানে এল অনঙ্গমোহনের। ওরা সংস্কৃত বই দেখছে। দাম জিজ্ঞাসা করছে। মলয়পবন বয়ে গেল অনঙ্গমোহনের শরীরে। মেয়েটি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল—আই হরপ্রসাদ, ঐ দেখ জীবনানন্দ বিদ্যাসাগরের টীকা। একটা বাহুবল্লবী টেনে নিল বইটা। নৈষধ চরিত। অনঙ্গমোহনের মুঠি আলগা হয়ে যায় চটের ভিতরে। বইটা পড়ে যায়। অনঙ্গমোহন হুমড়ি খেয়ে পড়েন মেয়েটির পাশে। মেয়েটি বই খোলে। অনঙ্গমোহন দেখেন তাঁরই হস্তাক্ষর। সেই বই, যে বইটি সুমিতাকে দিয়েছিলেন অনঙ্গমোহন। নৈষধচরিত। একটা বোম পড়ল। দোকানদার বলল, আবার গণ্ডগোল শুরু হল। বইটা নেবেন তো নিয়ে নিন। সব বন্ধ করে দেব। ছেলেটি বলল, তুই নিয়ে নে নারে সুমিতা, আমি তোর থেকে নিয়ে পড়ব। এই মেয়েটিরও নাম সুমিতা? অনঙ্গমোহন মেয়েটিকে দেখতে লাগলেন। চশমা পরা। নিবিড় চুল কাঁধ পর্যন্তই। যবনকন্যাদের মতো কুর্তা ও পাঞ্জাবি পরনে।

মেয়েটি কুড়ি টাকা নগদ দিয়ে বইটি কিনে নিল। ছেলেটিকে আস্তে আস্তে বলল, বেশ চিপে পেলাম, নারে?

ছেলেটির কিন্তু মলিন ধুতি এবং জামা। ছেলেটি কিছু বলে না।

অনঙ্গমোহন ওদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বুকটা টনটন করতে থাকে। মেয়েটির ব্যাগে ঢুকে গেল নৈষধচরিত। এই মেয়েটির নামও সুমিতা। অনঙ্গমোহনের বুকটা কীরকম টনটন করছে, চোখ দিয়ে হঠাৎ দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। আনন্দে। সুমিতা শেষ হয়ে যায়নি। আরও অন্য সুমিতা আছে। সারস্বত সাধনা একটা প্রবাহ। সহজে মরে না। সংস্কৃত আছে। মরে নাই। মেয়েটি বলে, অলঙ্কার নিয়ে কাজ করতে গেলে নৈষধ পড়া উচিত। ছেলেটি কাল লাইব্রেরিতে আসিস বলে একটা বাসে উঠে যায়। মেয়েটি হাঁটতে থাকে। অনঙ্গমোহনের অনেক কথা বলার ছিল। মেয়েটিকে ডাকা দরকার। প্রথমেই নৈষধ সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা দরকার। তুমি অলঙ্কারশাস্ত্রে গবেষণা করবা। তোমার জাইন্যা রাখা উচিত, সংস্কৃত ভাষায় অনুপ্রাসের আধিক্য ভাষাকে কর্কশ করে। শ্রীহর্ষ অত্যন্ত অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন, অত্যুক্তিপরায়ণ ছিলেন। নৈয়ায়িক মহাশয়রা যে হেতু অত্যুক্তিপ্রিয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেহেতু তাঁরা সকল কাব্য অপেক্ষা প্রশংসা করেন। উদিতে কাব্যে কৃ মাঘঃ কৃচ ভারবিঃ, এই সব তাঁদেরই উক্তি। তৎসত্ত্বেও নৈষধচরিত একটি প্রধান কাব্য। নৈষধচরিত বিষয়ে এক কৌতুকাবহ প্রস্তাব আছে, শুন কই, শ্রীহর্ষ নৈষধচরিত রচনা কইরা তার মাতুলের কাছে গেলেন দেখাইতে। তাঁর নাম মম্মভট্ট, একজন প্রধান আলঙ্কারিক। মম্মভট্ট আদ্যোপান্ত পড়লেন, তারপর কইলেন, বাপুহে। যদি তুমি কিছুপূর্বে গ্রন্থখানি আইনতা, তবে আমার প্রভূত শ্রম লাঘব হইত। বহু গ্রন্থ পাঠ কইরা আমি আমার অলঙ্কার শাস্ত্রের 'দোষ পরিচ্ছদ' পর্বে আলঙ্কারিক দোষসমূহের উদাহরণ উদ্ধৃত করতে পারতাম।

মেয়েটি রাস্তা পার হচ্ছে। অনঙ্গমোহনও মেয়েটির পিছন পিছন যেতে লাগলেন। শুন বালিকা, অনেক কথা আছে, তোমাকে কইতে চাই। নৈষধচরিত এক অমূল্যগ্রন্থ, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তবে অলঙ্কার শাস্ত্র এক বিশাল ব্যাপার। আমার আহৃত জ্ঞান সব দিয়া যামু তোমারে। আমার একটি টোল আছে। পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠী। আসবা যদি তুমি, ও মাইয়া, শোনছ, যদি তুমি আমার টোলে আস, তোমারে আরও বই দিমু, আমার আরও বই আছে। শোনছ? যে বইখানা তোমার কালো ব্যাগের মধ্যে শুইয়া আছে, দেইখ্যো, পাশে পাশে আমার স্বহস্তের মন্তব্য লিখা আছে।

দূরে কোথাও শব্দ হল। মানুষজন চঞ্চল হয়ে উঠছে। মেয়েটি মানুষের আড়াল থেকে বেরিয়ে গাড়ির আড়ালে যায়, আবার গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে মানুষের আড়ালে।

ও মাইয়া, সংস্কৃত ভাষা হইল খনি। হীরার খনি। আবার জোরে শব্দ হল। মানুষেরা ছুটছে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাতাসে ঝাঁঝালো গন্ধ। মেয়েটি হারিয়ে গেল। অনঙ্গমোহন গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটিকে খুঁজতে লাগলেন। মেয়েটিকে আর পেলেন না। অথচ ওর সঙ্গে অনেক কথা ছিল।

একটা পুলিশের গাড়িতে বোমা পড়ল। কালো গাড়ি থেকে নেমে এল বন্দুক ওঁচানো পুলিশ। সমস্ত লোকজন ফাঁকা। অনঙ্গমোহন সামনে দাঁড়িয়ে, ওঁর দিকে তাক করা বন্দুক। একজন বলল, ভাগ হিঁয়াসে...

অনঙ্গমোহন একটা গলি পেয়ে যান সামনে। গলির ভিতরে ঢুকে যান। গলির ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে হাতিবাগানে আসেন। রাস্তায় হরিণঘাটার গুমটিঘর জ্বলছে। সমিধ। ওঁ অগ্নে তং শিখিনাবাসি। দমকলের ঘণ্টাধ্বনি। মানুষের চিৎকার। রাস্তায় রক্ত। অনঙ্গমোহন ছুটতে থাকেন। হাতে চটের ব্যাগ। ব্যাগে বই। ছুটতে থাকেন। একটি অঙ্গার প্রায় ট্রাম। বন্দুক ওঁচানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশ। ছুটতে থাকেন অনঙ্গমোহন। রাস্তায় লোকজন নেই। কালো গাড়ির গোঁ গোঁ শব্দ। দমকলের ঘণ্টা। বাড়ি ফিরলেন শেষ অব্দি। কান্নার আওয়াজ। স্বপ্নার, অঞ্জলির, বিলুর। ন্যাড়া মারা গেছে। পুলিশের গুলিতে। কারা যেন বাসে আগুন দিচ্ছিল। পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। চায়ের গ্লাসে চামচ নাড়াতে নাড়াতে ন্যাড়া পড়ে যায়। ন্যাড়া এখন পুলিশের কাছে। লাশ।

কুড়ি

আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জির। ধরণীর বহিরাকাশে অন্তর্হিত মেঘমালা। প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতিময়ীর আগমন বার্তা। আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি। বাজল...বাজল তোমার আলোর বেণী, মাতল যে ভুবন। বিলুর হাতে বালতি, ব্যাগে পোস্টার। পুজো আসছে।

ব্যাট করছেন চাঁদু বোরদে, বল করছেন গ্রিফিথ্। গুডলেংথ বল, সপাটে ঘুরিয়েছেন, ক্যাচ...না, ধরতে পারেনি সরদেশাই, বলটা ড্রপ খেয়ে নর্দমায় পড়েছে। আ-বে বোরদে খেলা ছোড়দে। আজ হরতাল। ওরা খেলছে, খেলুক। হরতাল ওদের।

লেড়কা লেড়কি, শ্রেঃ কিশোর মমতাজ। তার উপর সুন্দর করে ঋতুবন্ধের পোস্টার মারে বিলু। 'নারায়ণ দৈবশক্তি ঔষধালয়'-এর উপর সুন্দর করে ঋতুবন্ধের পোস্টার মারে। ন্যায্য দরে খাদ্য দাও নইলে গদি ছেড়ে দাও...এটা থাক, এটা থাক। একটা ল্যাম্পপোস্ট পোস্টারে ভরিয়ে দেয়। ঋতু বন্ধ? দুশ্চিন্তা কী? অনায়াসে আরোগ্য। দি আইডিয়াল ক্লিনিক। নারীমঙ্গল ক্লিনিকের উপর ভাল করে পোস্টার মারে বিলু।

ম্যানেজারবাবু বলে দিয়েছেন, যেখানেই নারীমঙ্গল ক্লিনিক দেখবে ভাই, সেটা মেরে দেবে। মেরে দেওয়ার মানে হল ঠিক তার উপর আইডিয়াল ক্লিনিকের পোস্টার সাঁটা। নারীমঙ্গল আর আইডিয়াল ক্লিনিক হল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। শত্রু। এরা একই কাজ করে। ঋতুবন্ধে উপশম। একই রাস্তায় দুটো। বিলু একটা মোটা থামের নারীমঙ্গল ঢেকে দিতে থাকে আইডিয়াল ক্লিনিক দিয়ে। ক্রিমিনাশিনী, গুপ্তরোগের চিকিৎসা, খাদ্য আন্দোলনের দ্বিতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যায় সফল করুন। পোস্টার...কত পোস্টার।

টাইনি টটস। দি আইডিয়াল কিন্ডারগার্টেন স্কুল ফর চিলড্রেন। অ্যাডমিশন গোয়িং অন। কনট্যাক্ট মিস জিজা রায়/মিসেস সুমিতা মিত্রা।

কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ায় বিলু। পোস্টারটাকে দেখে। তারপর দ্রুত ঢেকে দেয়। টাইনি টটস-এর গায়ে আইডিয়াল ক্লিনিক সেঁটে দিতে থাকে। ঠাস ঠাস শব্দ। ক্রমাগত ঋতু বন্ধ? ঋতু বন্ধ? ঋতু বন্ধ? ঋতু বন্ধ?...

বসন্তায় নমস্তুভ্যং গ্রীষ্মায়চ নমোনমঃ বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ ঋতবে চ নমঃ সদা, ইহা ঋতু বন্দনার মন্ত্র। ঋতু শব্দের অন্য অর্থ রজঃ।

অমরকোষ পড়াচ্ছিলেন অনঙ্গমোহন। অমরকোষ হল শব্দার্থতত্ত্বের বই। মাত্র এক বছর আগেও বিলু এত বোকা ছিল যে, জিজ্ঞাসা করেছিল রজ কী দাদু? অনঙ্গমোহন তখন আস্তে আস্তে বলে দিয়েছিলেন, ঐ গোপন কথা। বিলুর কান লাল হয়ে গিয়েছিল। মাথা ঝনঝন করছিল। বিলু তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছিল, ওর মা কেন মাঝে মাঝে অনঙ্গমোহনের জন্য ভাত রান্না করে না, তখন কেন স্বপ্না আলাদা করে দাদুর জন্য ভাত ফুটিয়ে রাখে। কেন মা-মেয়ে গোপনে কথা বলে মাঝে মাঝে। কেন সামান্য ছেঁড়া কাপড়ের জন্য ওদের গোপন যত্ন ও যন্ত্রণা?

ইশ, মায়েদের এত কষ্ট...বিলু ভেবেছিল। এখন এই এক-দেড় বছরে বিলু কত বড় হয়ে গেছে, কত বুড়ো হয়ে গেছে বিলু। এখন বিলু অনেক জানে, পৃথিবীর অনেক কিছু। এইসব আইডিয়াল ক্লিনিকের নারীমঙ্গল ক্লিনিকের সব কিছু জেনে গেছে বিলু।

এই হদিসটা ন্যাড়াদাই দিয়েছিল বিলুকে। বিলু একদিন বলেছিল, ন্যাড়াদা, মায়ের হোটেলে খেতে আর ভাল লাগে না, তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নাও না, যা হোক কিছু দিও। ন্যাড়াদা বলেছিল, সিরিয়াসলি? বিলু বলছিল, সত্যি সত্যি। ন্যাড়াদা তখন বলেছিল, ভেরি গুড। এই তো বড় হচ্ছিস তুই। গুড সাইন।

ন্যাড়াদা বলেছিল, দ্যাখ বিলু। পৃথিবীতে বাঁচাটা হল একটা স্ট্রাগল্। কিন্তু প্রশ্ন হল, কীভাবে বেঁচে থাকব। ভালভাবে, মানে সৎভাবে বেঁচে থাকার কোনো জবাব নেই। কিন্তু ঐ ভাল থাকতে পারাটাও কিন্তু কম স্ট্রাগল্ নয়। যেমন ধর, তুই কালির বড়ি ঝাড়তিস, আমিও ঝাড়া মাল কিনেছি, কিন্তু দ্যাখ, আমরা হাত ধুয়ে নিয়েছি। তুই তো এরপর আর মেশিন পার্টস ঝাড়তে যাসনি। আমিও তো চিৎপুর ইয়ার্ডের ওয়াগান ঝাড়া মাল কিনতে পারতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলিরাম যেমন কিনেছে। নেপালবাবুর গঙ্গামাটি গুঁড়ো কিনে সিমেন্টে পাইল করতে পারতাম, কমিশনে ঐ সিমেন্ট ঝাড়তে পারতাম, করিনি, চায়ের দোকান দিয়ে দিব্যি আছি। এখন তুই যদি সৎভাবে কিছু আর্নিং করতে চাস তো সিনেমার টিকিটের কাজ করতে পারিস। তবে ওতে অনেক হাঙ্গামা। বহুত হিস্যার ব্যাপার আছে। বরং তোকে এমন একটা কাজ দিই, যেখানে কোনো ঝুট-ঝামেলার ব্যাপার নেই। আমিও করেছি কিছুদিন। তোর প্রেস্টিজ-ফেস্টিজের ব্যাপার নেই তো? দ্যাখ কিন্তু।

তারপর একদিন আইডিয়াল ক্লিনিকে নিয়ে এসেছিল ন্যাড়াদা। বলেছিল, এদের কাজ যাই হোক, তোর কী? তুই তো কচ্ছিস না। কর্ম করে যাও, ফলের দিকে তাকিও না।

তা, বিলু মাঝে মাঝে এই কর্ম করছে। ছুটিছাটার দিন চলে আসে। শ হিসাবে কাজ। একটা দুপুর কাজ করলে দু'টাকা, আড়াই টাকা হয়ে যায়। ওরা যে কাজই করুক, ম্যানেজার বড় ভাল লোক। বিলু যেদিন আসে কাজ পায়। ম্যানেজারবাবু বলেছেন, ভদ্রলোকের ছেলেরা যে প্রেস্টিজ ফেস্টিজের ইয়ে না করে সবরকম কাজ করছে, তাতে মনে হয় বাঙালি আবার জাগবে। বলেছিল, বিলেত, আমেরিকায় নাকি কলেজি স্টুডেন্টরা পেলেট ধোয়। বিলু আজ হরতালের দিনে সকাল সকালই বেরিয়ে পড়েছে। বিলু নিজের পাড়ায় এটা করে না। বেপাড়ায় করে। বাড়ির কেউ জানে না। গোপন। আজ কিছু বেশি কাজ করতেই হবে বিলুকে। কাল মহালয়া। কাল থেকে চায়ের দোকান স্টার্ট।

ক'দিন আগে ওখানে একটা মিটিং হল। পটলার তেলেভাজা দোকানের সামনে। ওখানে ইট সাজিয়ে একটা বেদি করা হয়েছিল, বেদিতে চুন দিয়ে সাদা রঙ করা হয়েছিল। লেখা হয়েছিল, খাদ্য আন্দোলনের অমর শহিদ স্বপন সরকার লাল সেলাম। বক্তৃতা হল। স্বপ্নাকে যেতে বলেছিল বাবলুদা, ও যায়নি। বিলু গিয়েছিল। শহিদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না। শহিদের রক্তঋণ শোধ করবই। এই খুনী সরকারকে সরিয়ে একটা বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই এই হত্যাকাণ্ডের জবাব দিতে হবে। বিলু জুলজুল করে দেখছিল, তেলেভাজা দোকানটার পাশের ঐ ছোট লাল রোয়াক এবং দেয়ালটা। মিটিং শেষ হলে পটলা গুঁইকে বিলু বলেছিল, ওখানে চায়ের দোকান দেবে। পটলা বলেছিল, এমন জায়গা কি পড়ে থাকে। বুকড হয়ে গেছে। বিলু তখন সাদা রঙ করা ইটের বেদির দিকে তাকিয়ে বলেছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার জামাইবাবু, এখানে শহিদ হল আর অন্য লোক বুক করে নিলেই হল? এখানে আমি বসব। তখন অমর শহিদ স্বপন সরকার যুগ যুগ জিও হচ্ছিল। তারই মধ্যে পটলা বলল—তোমার আগে বলা উচিত ছিল। তুমি তো জানতেই, আমি ন্যাড়াকে বসিয়েছিলাম। জায়গাটা ফাঁকা হবার পর অন্য একটা ছেলে কথা কয়ে গেছে, সে তো বাবলুরই লোক। শহিদের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ শেষ করে বিলু বাবলুদাকে বলল, ন্যাড়াদার ঐ জায়গাটায় আমিই বসব। আপনি ব্যবস্থা করে দিন। বাবলুদা বলেছিল, সে কী রে, তুই পারবি? বিলু বলেছিল—কেন পারব না, কী এমন কঠিন কাজ, আমার থেকে ছোট ছোট ছেলেরাও তো করছে।

তোর পড়াশুনো?—ইস্কুল?

বিলু মাথা নিচু করেছিল।

এখন পড়াশুনো নিয়ে কিচ্ছু ভাবে না বিলু, ভাবতে পারে না, ট্রাপিজিয়াম, রম্বস, লম্ব, অতিভুজ, ক্ষেত্রফল, অশোক, বিক্রমাদিত্য, লোট, লুট, বিধিলিঙ—এই সবকিছু হারানো-পুরনো। সারা কাপড়ে গুঁড়ি গুঁড়ি কালির বিন্দু মাখা মলিন কাপড়ে মোড়া দুই বিধবা, মা ও মেয়ে, বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না বিলু, দুটো গাছ, লতা গাছ, সর্বাঙ্গ থেকে বেরিয়েছে আঁকশি, হিল হিল করছে, কিছু আঁকড়ে ধরবে বলে, নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর, অক্টোপাসের মতো। বিলু কিছুই বলতে পারছিল না তেমন, শুধু বলছিল, ওটা হলে খুব ভাল হত। আমাকেই দিন না ওটা বাবলুদা...

বাবলুদা বলেছিল—আমরা একটু কথা বলেনি, বাবলুদা তখন পটলা, আরও দু'চারজনের সঙ্গে গম্ভীর আলোচনা করল। তারপর বলল, ওখানে তুই-ই বোস বিলু, বেশি দেরি করিস না, জায়গা রাখা যাবে না।

বিলু একথা বলেছিল অঞ্জলিকে। অঞ্জলি শুনেই গলা চড়াল। কেন? তুই কেন? তোর ভবিষ্যৎ নাই। তুই সাইন্স পড়বি। আর কেউ না বসে আমিই বসুম। আমার প্রেস্টিজের দরকার নাই। প্রেস্টিজ ধুইয়া কি জল খামু?

একদিন রাত্রে কার স্পর্শে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বিলুর। বুঝল ওর মা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বিলুর গায়ে। বিলু বলল, এরকম কোর না মা। পরদিন অঞ্জলি ভীষণ গম্ভীর। কারুর সঙ্গেই কোনো কথা বলছিল না। একমনে ঠোঙা করছিল খালি। একবার বিলুকে ডাকল। বলল শোন, কথা আছে। কিন্তু কিছুই বলল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বলল, না থাক। কোনো কথা নাই। একটু পর আবার বলল—বিলু, যশকাকুরে একটু খবর দিবি? একটি চিঠি দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল—এইটা ওনার হাতে দিস।

যশকাকুকে একদম ভাল লাগে না বিলুর। ওর মা যে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, তা কি যশকাকুর জন্যই? মালিক যখন বাড়িতে প্লাস্টিকের কারখানা করল, তখন টিনের কোম্পানির অধিকাংশকেই রাখেনি। মাকে তো ডেকে নিয়েছিল। মা কেন ছেড়ে দিল তবু?

বিলু রাস্তায় গিয়ে চিঠিটা খুলেছিল। লেখা যশদা, আমি হতভাগিনী। শেষ অব্দি ক্রমশ আপনাদের দোরে আবার যেতে হবে। মালিক রাজি হবে কি? একটু খোঁজ করবেন।

বিলু কাগজটা দিয়েছিল। যশকাকু কাগজটা পড়ে ঠোঁট উল্টোল। বলল, তোমার মায়ের কোনো কথারই ঠিক নেই। বলে গেল, আর জীবনে এমুখো হব না।

যশবাবু এসেছিল সন্ধ্যার সময়। অঞ্জলি বলল—স্বপ্না, বিলু, তোরা একটু বাইরে যা। নিচু গলায় কথা হচ্ছিল। বিলু আর স্বপ্না জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছিল না। বিলু শুনল, মায়ের গলা ক্রমশ উঁচু হয়ে যাচ্ছে। বলছে, আমার জন্য আলাদা নিয়ম কেন?

যশকাকু কী বলল, শোনা গেল না।

মা বলল, আমার আলাদা খাতির কেন?

যশকাকু বলল—এটা মালিকের ইচ্ছে। নইলে মালিক কেন?

তাহলে আমার কী কাজ করতে হইব? যশবাবু কী বলল, শোনা গেল না।

আচমকা কান্নার আওয়াজ শুনল। মা কাঁদছে। আমি যাব না যশদা, আপনি চইলা যান। আমার সামনে থেকে চইলা যান অখনি।

যশবাবু নীরবে মোকাসিন গলিয়ে নিল পায়ে। অঞ্জলি সামনে এল। বলল, কিছু মনে করবেন না যশদা, আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন। আমারে ক্ষমা করবেন। মোকাসিনে শব্দ হয় না।

বিলু এরপর আস্তে আস্তে কেটলি, গেলাস, প্লেট, ছাঁকনি এইসব জোগাড় করেছে। কিচ্ছু বলেনি মা।

কাল মহালয়া। কাল থেকে দোকান স্টার্ট। কাল গঙ্গায় খুব ভিড় হবে। তর্পণ করতে আসবে শয়ে শয়ে লোক। ভাল বিক্রি হবে। কাল বাড়িতে চা করেছিল বিলু। অঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন হয়েছে মা? অঞ্জলি কিছুক্ষণ উদাস তাকিয়েছিল চায়ের কাপের দিকে।

বিলু পোস্টার মারা শেষ করে আইডিয়াল ক্লিনিকের দিকে যায়। দরজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ে একটা লাল যোগ চিহ্ন, ডাক্তারদের গাড়িতে যেমন থাকে। দরজা খুললেই একটা ঘর। ওখানে একটা বেঞ্চি পাতা থাকে, একটা নোংরা চাদর পাতা টেবিল, ওটা ম্যানেজারের, আরেকটা ঘর, সামনে সবুজ পর্দা ফেলা, ভিতরে জ্ঞান ডাক্তার। জ্ঞান ডাক্তার আসলে ডাক্তারই নয়, বিলু তা জানে। জ্ঞান ডাক্তার একটা নাম। জ্ঞান ডাক্তারের সঙ্গে বিলুর কোনো দিন কথা হয়নি, শুধু সবুজপর্দার ভিতর থেকে জ্ঞান ডাক্তারের ভাঙা ভাঙা গলার কথা শুনেছে বিলু, আগে আসেননি কেন, এখন তো খরচা বেশি পড়ে যাবে। কিংবা কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এইসব।

বিলু যোগ চিহ্ন লাগানো দরজাটা খুলল। ঠক করে আঠার বালতিটা রাখল মেঝের উপর। টেবিলে ম্যানেজার নেই। সবুজ পর্দার ওদিক থেকে ভেসে এল—কোনো অসুবিধা হবে না, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। এবার একটু চাপা গলা—তাহলে ঐ কথাই রইল অ্যাঁ। ছিটকে গেল ছাগমুণ্ড রক্তস্রোত, কাঁপছে ছিন্ন শরীর, সমস্ত বাস, লরি, ট্যাক্সি একসঙ্গে তীব্র হর্ন দিয়ে উঠল, বিদ্যুৎ চমকাল আকাশে, সাইরেন বাজল।

হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঐ কথাই রইল।

তাহলে আসি? অ্যাঁ?

সবুজ পর্দার ফাঁক দিয়ে বিলু দেখল, কালো ফিতের চটি। নীল বুটির শাড়ি।

বিলু ছুটল। ভীষণ ছুটল। শোভাবাজার পেরিয়ে, বি কে পাল পেরিয়ে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে চলে যেতে চায় বিলু।

রাস্তার কল থেকে ঢক ঢক জল খেল বিলু। একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও নৃসিংহ অবতার হল। মুখে সূচালো দাঁত, হাতে তীক্ষ্ণ নখ, যশবাবুর পেটে নখ বসিয়ে দিল বিলু।

আনমনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকে বিলু। রাস্তার আলো জ্বলে উঠল, ওর ভাল লাগল না। বারো ঘণ্টার হরতাল শেষে গাড়িঘোড়া চলতে শুরু করেছে, ওর ভাল লাগল না। একটা দুটো দোকানপাট খুলছে, ওর ভাল লাগল না। মা ওখানে গেল কেন, কেন গেল মা?

আজ সকাল থেকেই মা কেমন গম্ভীর ছিল। স্টোভ, কেটলি আর গেলাস গুছিয়ে রেখেছিল বিলু, মা বলেছিল ওগুলো ঢাকা দিয়ে রাখ, ওগুলোর দিকে তাকাতে পারছি না।

স্বপ্নাও কেঁদেছিল সকালে। মা ওকে ছাদে নিয়ে গিয়েছিল। মা আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওখানে কেন গেল? কেন গেল মা?

একটু বেশি রাতেই বাড়িতে গেল বিলু। অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, এত রাত করলি যে?

বিলু বলল, বেশ করেছি। বিলু ওর মায়ের মুখের দিকে তাকায় না।

অঞ্জলি খেতে দিল, কোনোরকমে খেয়ে নিল বিলু। বারান্দায় অনঙ্গমোহনের পাশে শুয়ে পড়ল। অনঙ্গমোহন বললেন, বিলু আইলি?

বিলু কথা বলল না।

অনঙ্গমোহন বললেন, কাইল হইতে চায়ের দোকান?

হ্যাঁ।

আমিও যামু। আমিও কাল ভোরবেলায় গঙ্গার পাড়ে গিয়া দাঁড়ামু। পথ বেশ্যারা যেমন যৌবনলক্ষণ প্রদর্শন করে, সেরকমভাবে আমি আমার শিখাসূত্র ও নামাবলী প্রদর্শন কইরা দাঁড়ামু। যে আত্মা আগুনে পোড়ে না, ছিঁড়া যায় না। নৈনং ছিন্দতি নৈনং দহতি, ক্ষুধা পিপাসার উর্ধ্বে যে আত্মা, তারে আমি জল খাবামু, ন জায়তে ম্রিয়তে বা যে আত্মা, তারে লইয়া খেলা কইরা পয়সা নিমু। দক্ষিণা। বিষ্ণুদৈবতং ব্রাহ্মণায় দক্ষিণামহং দদে। কাল হইতে আমি যাজক। বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃ নির্মিতা...

অনঙ্গমোহন বিড়বিড় করেই চলেছেন। বিলু চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে ওঠে। ঘরে যায়, শব্দহীন মায়ের একটা হাত স্বপ্নার মাথার কাছে, স্বপ্না আর মা পাশাপাশি শুয়ে আছে দু'জন দু'জনকে ছুঁয়ে, দুই সখী। মায়ের একটা হাত স্বপ্নার মাথার উপরে মমতা বুলিয়ে দিচ্ছিল, যেন এইমাত্র থেমেছে। বাইরের রাস্তার আলো ঘরের ভিতরে এসে কিছুটা পড়েছে, পরিকল্পনাহীন; বটপাতার ছায়াও কিছুটা আচ্ছন্ন। মশারির পাশে বসে বিলু একা জেগে থেকে দেখে, মায়ের শরীরে আলো ও ছায়ার ছলনা। বিলু খামচে ধরে নিজের চুল। চোখ জাহাজের সার্চলাইট হতে চায়। মায়ের শরীরে ঘোরে ঐ ভূতগ্রস্ত জাহাজি আলো। ওখানে কেন গিয়েছিলে, কেন গিয়েছিলে মা গো!

ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে বিলু। অনঙ্গমোহন কী সব বিড়বিড় করেই চলেছেন। বিলু একা একা রান্নাঘরে যায়। উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো টেনে নেয়। কলতলায় যায়, ছাই মাখে হাতে, প্রাণে বড় শান্তি হয়, বাসনে ছাই বুলোয়, প্রাণে বড় শান্তি হয়, বাসন ক'টা ধুয়ে রান্নাঘরে রেখে দেয় ফের।

অনঙ্গমোহন বকেই চলেছেন—কর্ণ বধ হইল, কর্ণ বধ। অর্জুন কয় হে কৃষ্ণ, কও দেখি, কর্ণের প্রকৃত হত্যাকারী কে? কৃষ্ণ কইলেন—ত্বয়া ময়া চ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুন্ত্যাচ—তুমি, আমি, কুন্তী, ইন্দ্র, ধরণী, পরশুরাম, ছয়জনই দায়ী। কর্ণবধ আগে হইল না কেন, আমি কেন আগেই যাজক হইলাম না, বৌমা, বৌমাগো কত কষ্ট করছ...এতদিন...

এমন সময় একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের কাতর শব্দ শোনে বিলু। যেন মরুভূমি থেকে আসা হালকা হাওয়া। উঃ মাগো...

উঃ শব্দের বিসর্গ বিন্দু দুটি দু'ফোঁটা জল। বিসর্জন।

স্বপ্নার গলা শোনে বিলু।

মাগো...

উ।

আমি পারব না মা। পারুম না।

এখন ঘুমা।

ঘুমাতে পারি না মা।

পারবি।

পারুম না আমি...স্বপ্না ডুকরে কেঁদে ওঠে। আমি ঐখানে যাব না মাগো, আমি যামু না। স্বপ্না গোঙায়।

অঞ্জলি চাপা স্বরে বলে—কোনো ভয় নাই তোর, কিচ্ছু হইব না।

স্বপ্না কাঁদে। বলে, ও থাক। ও থাক মা। ও আমার থাক। ও থাক, প্লিজ মাগো...

আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক-মঞ্জির। বিলু কাপ, কেটলি, প্লেট, স্টোভ ব্যাগের মধ্যে ভরে নিল। হিমাচল দিলেন সিংহবাহন, বিষ্ণু দিলেন চক্র, পিনাকপাণি শংকর দিলেন শূল, যম দিলেন তাঁর দণ্ড...মাকে প্রণাম করল বিলু। দুগ্‌গা-দুগ্‌গা। জাগো দুর্গা জাগো দশপ্রহরণধারিণী। বাবার ছবিকে নমস্কার করল বিলু। অনঙ্গমোহনের পায়ে হাত দেবার আগেই তিনি সরিয়ে নিলেন পা। অনঙ্গমোহন বললেন, আমিও তো যাইতেছি গঙ্গার ধারে, চল একসঙ্গে চল। যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা...। ওরা রাস্তায় নামে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত। মৃদুমন্দ সমীরণ। এসেছে শরৎ হিমেল পরশ...। আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরুদুরু, পেয়েছে খবর পাতা খসানোর...। হালকা বাতাস রাস্তার শালপাতা ছেঁচড়াচ্ছে।

পটলার দোকানে ধোঁয়া। আঁচ পড়েছে। পটলা বলল, বসছিস? ভাল দিন। মহালয়া। বেসন ফেটাচ্ছে পটলাদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলু স্টোভ বার করে। কাপ, কেটলি, গেলাশ, বয়াম, চামচ...লাল রকটা দোকান হয়ে যায় ক্রমশ। ন্যাড়াদার শহিদ বেদিতে এসে যায় কাক।

বিলু স্টোভে পাম্প দেয়। আগুন শোঁ শোঁ করে। কেটলিতে জল বসায়। জল গরম হয়। তাপ নিচ্ছে জল।

পাঁচশো সাঁইত্রিশ ক্যালোরি লীন তাপ প্রতি গ্রামে। জল স্ফুটনাংকে পৌঁছে যাচ্ছে ক্রমশ। জল ফোটে। জল টগবগ করে।

একটু পরেই বিলু দেখে, ঐ ফুটন্ত জলের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন অনঙ্গমোহন। নামাবলীর কোণা পাকাচ্ছেন হাতের আঙুলে।

বিলুরে বিলু, আমি পারলাম না। অনঙ্গমোহনের চোখে জল।

মন্ত্র পড়াইয়া দক্ষিণা চাওয়া আমার দ্বারা হইল না। আমি কুষ্মাণ্ড। আমি গর্ভস্রাব। আমি কিচ্ছু না। আমি বোঝা।

বিলু অনঙ্গমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নির্বাক। স্টোভে আগুনের শোঁ শোঁ শব্দ।

তুই ঘরে যা বিলু, ঘরে যা। বীজগণিত কর। বস্তুবিদ্যা পড়। বিদ্যার কোনো বিকল্প নাইরে বিলু, অবিদ্যঃ জীবনং শূন্য। আমি বরং চায়ের দোকান করি। পারুম। এই কাম আমি নিশ্চয় পারুম। এই তো পারতাছি, দেখ...দেখ...স্টোভে পাম্প দিতে থাকেন অনঙ্গমোহন। আগুন বেড়ে ওঠে। শোঁ শোঁ শব্দ। অগ্নে...। অগ্নে ত্বং শিখিনামাসি। দু'হাত বাড়িয়ে আগুনের দিকে চেয়ে অনঙ্গমোহন বললেন—অগ্নে, ক্ষমস্ব। ওঁ অগ্নয়ে প্রজাপতিঋষিঃ অগ্নিদেবতা অগ্নৌ সমিধদানে বিনিয়োগঃ। হে অগ্নি, আমি আমার পাণিনি, কলাপ, আমার কালিদাস, দণ্ডী, ভর্তৃহরি, আমার টীকাটিপ্পনী, অলঙ্কার, আমার অহংকার তোমাকে সমিধস্বরূপ দান করলাম।

রাস্তার লোকজন ঠিকঠাক গঙ্গার দিকেই যাচ্ছে, ব্যতিক্রমহীন। রিকশাওয়ালার নির্বিঘ্ন গতি, ঠুং ঠুং শব্দ। খবর কাগজওয়ালা, ভিখারি এবং প্রজাপতিঋষি কারুরই কোনো বিকার নেই। সর্বত্র অব্যয়ীভাব।

অগ্নে, হে অগ্নি, ওঁ ইদং চিত্তায় স্বাহা। আকুতঞ্চস্বাহা। ওঁ আহুতিশ্চ স্বাহা। ওঁ মনশ্চ স্বাহা। হে মাঘ, ভারবি, তোমরা দেখ। হে বাণভট্ট, তোমার চন্দ্রাপীড়ের আনন্দোচ্ছ্বাস দিয়া কিশমিশ শোভিত কেক মোড়াইয়া খরিদ্দার খুশি করুম তোমরা দেখ। হে দেবতাগণ, পুষ্পবৃষ্টি কর। মেঘদূতমের পৃষ্ঠায় প্যাকেট কইরা খরিদ্দাররে দিমু সুজি বিস্কুট।

আর আমার পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠীর খাতাগুলি ছিঁড়্যা ছিঁড়্যা আমি...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পটলাদা বলল, ভালই করেছিস বিলু, দাদুকে দিয়ে পুজোটা করিয়ে নিচ্ছিস।

অনঙ্গমোহন কেটলিতে চাপানো ফুটন্ত জলের দিকে তাকিয়ে বলতেই থাকেন—ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ হে জল, হে ফুটন্ত জল, হে চায়ের জল, আমাদের মঙ্গল কর। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব স্তা ন ঊর্ধ্বে দধাতন...হে জল, চায়ের জল হে, আমাদের অন্নভোগের অধিকারী কর। রমণীয় ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত কর। কারণ অন্নই ব্রহ্ম। আমারে বাঁচাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~